আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য

আমি কেন ইসলামগ্রহণ করলাম

আমি কেন ইসলামগ্রহণ করলাম

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য
(প্রাক্তন পুরোহিত)

জ্ঞান বিতরণী প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা-২০১০

প্রচ্ছদ
সুব্রত সাহা

প্রকাশক
মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম

জ্ঞান বিতরণী
৩৮/২-ক বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)
ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১৭৩৯৬৯

অক্ষরবিন্যাস
জন্মভূমি কালার স্পট

মুদ্রণ
ধলেশ্বরী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন
৩৮ আর. এম. দাস রোড ঢাকা-১১০০

পরিবেশক
আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা
৯১, মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা।

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

মূল্য
১৫০.০০ টাকা U.S.$-5.00

AAMI KENO ISLAMGROHON KORLAM (STORY OF MY CONVERSION TO ISLAM)
Written By **Abul Hossain Bhattacharja**
Published By Mohammad Shahidul Islam
Gyan Bitaroni, 38/-2ka Banglabazar
Dhaka-1100, Tel : 7173969

ISBN : 984-8747-68-0

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম

মরহুম আবুল হোসেন ভট্টাচার্য একটি ইতিহাস, একটি অনন্য উদ্যম ও অনুপ্রেরণার নাম। অদম্য অনুসন্ধিৎসার দীপ্ত উদাহরণ, সত্য ও কল্যাণের জন্যে আত্মনিবেদনের একটি মহৎ দৃষ্টান্ত।

সত্যের প্রতি সহৃদয় আকর্ষণ তাঁকে ঘরছাড়া করেছিল। ধর্মাধর্মের চিন্তা তাঁকে ব্যাকুল করেছিল। সত্যের মহিমান্বিত আহ্বানকে সবার কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে তিনি ছিলেন সদাসচেষ্ট।

মরহুম আবুল হোসেন ভট্টচার্য ১৯১৬ সালে বৃহত্তর ফরিদপুর (বর্তমানে শরীয়তপুর) জেলার গোসাইর হাট উপজেলা দাসের জংগল গ্রামে এক পুরোহিত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শশীকান্ত ভট্টাচার্য ; মাতা ক্ষিরদা সুন্দরী (রাঙাবউ)।

ইসলামগ্রহণের আগে তাঁর নাম ছিল সুদর্শন ভট্টাচার্য। গ্রামের পাঠশালাতেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। পরে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৩৭ সালে ২১ বছর বয়সে তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন। তাঁর মুসলিম নাম রাখা হয় আবুল হোসেন। কিন্তু পৈতৃক পদবী 'ভট্টাচার্য' যুক্ত করে তিনি নিজের নাম লিখতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, 'যাঁরা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলামগ্রহণ করে থাকেন তাঁদের সকলেই হিন্দু জাতির তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত বলে একশ্রেণীর হিন্দুলেখক ও বুদ্ধিজীবী অপপ্রচার চালিয়ে এসেছেন। তাঁদের প্রচারণা যে সর্বাংশে সত্য নয় তা প্রমাণ করার জন্যে আমি নিজ নামের শেষে 'ভট্টাচার্য' পদবী ব্যবহার করি একান্ত বাধ্য হয়েই; বংশীয় পদমর্যাদা বা বাহাদুরী প্রকাশের জন্যে নয়।'

বাল্যকাল থেকেই তাঁর মনে বিশ্বস্রষ্টার সংখ্যা সম্পর্কে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। তিনি যখন স্কুলে লেখা-পড়া করতেন তখন জনৈক মুসলমান শিক্ষকের প্রভাব তাঁর ওপর পড়ে। সেই শিক্ষক একদা শিশু সুদর্শনকে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "কর্তা অনেক হলে গোলমাল বাঁধে। সারা জাহানের কর্তা একজনই। আমরা মুসলমানরা সকল কিছুর মূল হিসেবে একজন কর্তাকেই মানি। তুমি একজনকেই খুঁজতে চেষ্টা করবে।"

সুদর্শন ভট্টাচার্য তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের একথা জীবনে কোনওদিন ভুলতে পারেননি। 'তুমি একজনকেই খুঁজতে চেষ্টা করবে' এ মহান উপদেশ তাঁর শিশুমনে শেকড় গেড়ে বসে এবং পরবর্তীতে বিরাটকায় মহীরুহে পরিণত হয়।

কালের চক্র আবর্তিত হয়। সুদর্শন ভট্টাচার্যের মনোজগতেও নানান জিজ্ঞাসা প্রবলতর হয়ে ওঠে। অনুসন্ধিৎসার ব্যাকুলতাই তাঁকে খৃস্টান ও মুসলিম পণ্ডিতদের সান্নিধ্যে টেনে আনে। অবশেষে ইসলামী জীবনাদর্শের মধ্যেই তিনি তাঁর সমস্ত জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পান।

এক পর্যায়ে তিনি মাওলানা আকরম খাঁ, খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ, মাওলানা মনিরুজ্জামান আনওয়ারী, মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফি আল-কোরায়শী প্রমুখের সান্নিধ্যে আসেন। তাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ও পরামর্শ সুদর্শন ভট্টাচার্যকে ইসলামগ্রহণে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। ইসলামগ্রহণের পর আবুল হোসেন ভট্টাচার্য রংপুরের মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসায় পড়াশোনা করেন।

গাইবান্ধায় অবস্থানকালে তিনি 'নও-মুসলিম তবলীগ জামায়াত' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। কিন্তু তৎকালীন বৃটিশ সরকার ও হিন্দু নেতৃবৃন্দের প্রবল বিরোধিতার মুখে সে সংগঠনের তৎপরতা অল্পকালের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তিনি কোলকাতা চলে যান।

১৯৪৬ সালে দেশ বিভাগের মাত্র এক বছর আগে তিনি মালদহ জেলায় মহকুমা প্রচার কর্মচারী (Sub-Divisional Publicity Officer) হিসেবে সরকারি চাকুরিতে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে ১৪ই আগস্টের পর তিনি তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানের রাজশাহীতে চলে আসেন।

বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক মহফিল হক সাহেবের পারিবারিক সূত্রে জানা যায় যে, আবুল হোসেন ভট্টাচার্য মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসায় কিছুদিন শিক্ষকতাও করেন।

সুদীর্ঘ ২৮ বছর যাবৎ অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে চাকুরি করার পর ১৯৭৪ সালে গণসংযোগ কর্মকর্তা (Public Relation Officer) হিসেবে বাংলাদেশ কৃষিতথ্য সংস্থা থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৬৮ সালে ঢাকায় 'ইসলাম প্রচার সমিতি' নামে তিনি একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আমরণ এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন।

নওমুসলিমদের মুসলমান সমাজে পুনর্বাসনকল্পে গঠিত হলেও আবুল হোসেন ভট্টাচার্য এ সমিতিকে চার দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যে সম্প্রসারিত করতে থাকেন। এ চার দফা কর্মসূচি ছিল : (১) নওমুসলিমদের পুনর্বাসন, (২) অমুসলমান সমাজে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো, (৩) খৃস্টান মিশনারিদের উদ্দেশ্যমূলক ভ্রান্ত প্রচারণার মোকাবিলা করে উপজাতীয়দের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা এবং (৪) সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

তিনি ১৯৭৮ সালে মক্কা কেন্দ্রিক রাবিতা-ই-আলম আল ইসলামীর তদানীন্তন সেক্রেটারি জেনারেল মরহুম শেখ মুহাম্মদ আলী আল হারাকানের আমন্ত্রণক্রমে পবিত্র হজ্ব সম্পন্ন করেন। এর আগে তিনি একই বছর Muslim World League আয়োজিত করাচিতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন। এরপর একই সংস্থা কর্তৃক কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়

এশীয় ইসলামী সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্যে তাঁকে দাওয়াত দেয়া হয়। কিন্তু অনিবার্য কারণে তদানীন্তন সরকার তাঁকে সে সম্মেলনে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়নি। সে বছর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান থেকে তাঁকে ইরান সফরের দাওয়াত দেওয়া হলে একই কারণে সে সফরও বাতিল হয়ে যায়। নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তিনি এদেশের লক্ষ লক্ষ অমুসলমানের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর মহৎ কর্মে সর্বান্তকরণে নিয়োজিত ছিলেন। প্রায় প্রতিদিনই দু-একজন অমুসলমান তাঁর পবিত্র হাতে বয়াত গ্রহণ করে ইসলামের সুশীতল পতাকা তলে সমবেত হতো। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার অমোঘ আহ্বানে তিনি এতো তাড়াতাড়ি আমাদের কাছ থেকে চলে যাবেন এতটা আশা আমরা কেউ করিনি।

১৯৮৩ সালের ২৬শে জানুয়ারি দিনাজপুরের রাণীর বন্দর থেকে ঢাকা ফেরার পথে পাবনার সমাসনারিতে তাঁর জীপটি দুর্ঘটনা কবলিত হলে অন্যান্য সহযাত্রীদের সঙ্গে তিনিও মারাত্মকভাবে আহত হন। সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে ঢাকার পিজি হাসপাতালে পরের দিন ভর্তি করা হয়। কয়েকদিন পিজিতে চিকিৎসাধীন থাকার পর কিছুটা সুস্থ মনে হলে তাঁকে কলাবাগানের বাসায় আনা হয়। কয়েকদিন পর আবার তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে তাঁকে ঢাকার মোহাম্মদপুরের রাবিতা মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাঁর জীবনসায়াহ্ন ঘনিয়ে আসে।

১৯৮৩ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এ মহান দীনী খাদেম ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন) তাঁর ইন্তেকালের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের হাজার হাজার নওমুসলিম বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। হারিয়ে ফেলে তাঁদের পিতৃতুল্য একজন প্রিয় অভিভাবককে।

পরের দিন ১৯শে ফেব্রুয়ারি প্রথমে কলাবাগান খেলার মাঠে ও পরে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমে তাঁর সালাত-ই-জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। একই দিন ছায়াঘেরা বনানী গোরস্থানে তাঁকে চিরনিদ্রায় শুইয়ে দেয়া হয়।

তিনি আর কখনও ছুটবেন না কোনও দুঃস্থ নওমুসলিমের মনের কথা শোনবার জন্যে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া। দেবেন না কাউকে সত্যিকার মুসলমান হয়ে গড়ে ওঠার উপদেশ। তবে তাঁর মূল্যবান রচনাসমূহে আমরা খুঁজে পাবো সত্য ও কল্যাণের পথে চলার দিকনির্দেশনা আর সত্যিকার অর্থে মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার সুপরামর্শ।

তাঁর দাওয়াতী কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ১৯৮৪ সালে ইফা পুরস্কার (মরণোত্তর) প্রদান করে সম্মানিত করেন।

তিনি যেমন সু-বক্তা ও বিদগ্ধ সমালোচক ছিলেন তেমনি ছিলেন একজন শক্তিমান লেখকও। তিনি ছোট-বড় প্রায় ২০ খানা পুস্তকের রচয়িতা। তাঁর এ

সমস্ত রচনার প্রায় সবগুলোই ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক। তাঁর এসমস্ত রচনার প্রায় সুচিন্তিত রচনা খুব সহজেই শুভানুধ্যায়ী পাঠকের মন কেড়ে নেয়।

তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাসমূহ হচ্ছে :

১। বিশ্বনবীর বিশ্বসংস্কার
২। রোযাতত্ত্ব (১৯৪৬)
৩। মরুর ফুল (কাব্য, ১৯৪৬)
৪। আমি কেন ইসলামগ্রহণ করলাম (১৯৭৬)
৫। আমি কেন খৃস্টধর্মগ্রহণ করলাম না (১৯৭৭)
৬। একটি সুগভীর চক্রান্ত ও মুসলমানসমাজ (১৯৭৭)
৭। কারবালার শিক্ষা (১৯৭৮)
৮। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে (১৯৮০)
৯। নবীদিবস (১৯৮১)
১০। ইতিহাস কথা কয় (১৯৮১)
১১। আর্তনাদের অন্তরালে (১৯৮০)
১২। শেষনিবেদন (১৯৭৯)
১৩। দীন-ধর্ম-রিলিজিয়ন (১৯৮২)
১৪। এপ্রিল্ ফুলের বেড়াজালে মুসলমানসমাজ (১৯৮৩)
১৫। কুরবানির মর্মবাণী (১৯৮১)
১৬। ঠাকুরমার স্বর্গযাত্রা (১৯৮১)
১৭। বিড়ালবিভ্রাট (১৯৮১)
১৮। মূর্তিপূজার গোড়ার কথা (১৯৮২) ইত্যাদি

এছাড়া তিনি কিছু কবিতাও রচনা করেন। তাঁর এসব কবিতার বেশ কিছু তৎকালীন লিটল ম্যাগাজিনগুলোতে ছড়িয়ে আছে।

মরহুম আবুল হোসেন ভট্টাচার্যের গদ্য, পদ্য, দাওয়াতকর্ম, সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড সবকিছুতেই একটি পরিচ্ছন্ন ও পরিশিলিত মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সত্য বলতে কি, আজকাল তাঁর মতো ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিত্বের বড়ই অভাব। ইবাদত-বন্দেগী, দৈনন্দিন কাজ-কর্ম, চাল-চলন, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি সবকিছুতেই তিনি শরীয়তের অনুবর্তী ছিলেন। বেশভূষায় ছিলেন সর্বদা সাধারণ মানুষ। অতি কথন, অতি ভোজন, অপব্যয়, অহমিকা ইত্যাদি ভীষণভাবে ঘৃণা করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে খুবই বন্ধুবৎসল ও সদালাপী ছিলেন। রাব্বুল আলামীন তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন।

ইসমাঈল হোসেন দিনাজী
বি, এ, অনার্স; এম, এ, (ঢাকা)

লেখকের আবেদন

সাধারণভাবে গোটা হিন্দুসমাজ এবং বিশেষভাবে উক্ত সমাজে বিদ্যমান আমার আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধববৃন্দ! সুদীর্ঘ চল্লিশটি বছর ধরে আমি অনেক বারই আপনাদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত আকুলভাবে এই আবেদনটি করেছি।

আজ জীবনের শেষপ্রান্তে পৌছে হয়তো শেষবারের মতো আমি আবার সে আবেদনটিই করে যেতে চাই; জানি না অতীতের মতো এবারও ঘৃণা ও অবজ্ঞার সাথে আমাকে প্রত্যাখ্যাত হতে হবে কি না।

তবে আমি সাধ্যানুযায়ী আমার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি এবং সারাটি জীবন আন্তরিকতার সাথে আপনাদের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করেছি এতদ্বারা অন্ততঃ সেই সান্ত্বনাটুকু নিয়ে আমি আমার জীবনের শেষনিঃশ্বাস ফেলতে পারবো। পরম করুণাময় বিশ্বপ্রভু আমার এই প্রচেষ্টাকে সফল করুন এবং দায়িত্ব পালনে ত্রুটি থেকে আমাকে অব্যাহতি দান করুন, কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি।

বাল্যকাল থেকেই আমি যে চরিত্রবান, মেধাবী এবং চিন্তাশীল ছিলাম সেকথা আপনাদের অজানা নয়। আমার কাছে লিখিত আপনাদের অনেক চিঠিপত্রেও আপনারা উচ্ছ্বসিতভাবে আমার চরিত্রের প্রশংসা করেছেন। খোঁজ করা হলে তেমন দু'চারখানা পত্র আজও আমার ঘরে পাওয়া যাবে।

চরিত্রবান হওয়া সত্ত্বেও প্রায় সারাটা জীবন আমি আপনাদের নিকট থেকে শুধু ঘৃণা, বিদ্বেষ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, ক্রোধ এবং অবজ্ঞা-অবহেলার দণ্ডই পেয়ে এসেছি।

আমি জানি আপনাদের এই ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রভৃতির একটি মাত্র কারণই রয়েছে। তাহলো আমার ইসলামগ্রহণ।

ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে আপনাদের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, বিরোধী শক্তিসমূহের মিথ্যা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণা এবং মুসলমান নামধারী কিছুসংখ্যক মানুষের আচার-ব্যবহারই যে আপনাদের মনে এ ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টির কারণ, সেকথা বেশ ভালোভাবেই আমার জানা রয়েছে। আর জানা রয়েছে বলেই আপনাদের নিষ্ঠুর ব্যবহারে আমি আপনাদের ওপর কণামাত্রও রুষ্ট বা বীতশ্রদ্ধ হইনি।

এ সময়ে আমিও যে আপনাদেরই মতো ওসবের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করতাম সেকথা অবশ্যই আপনাদের জানা রয়েছে। সৌভাগ্যবশত আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছিলাম। কিভাবে পেরেছিলাম অতঃপর সেকথাই বলছি :

আমরা জানি, ধর্ম একান্তরূপেই বিশ্বাসের বিষয়; আর বিশ্বাস করা বা না করাটা হলো একান্তরূপেই মনের কাজ। বাইরে থেকে জোর করে চাপিয়ে দেয়া বা সত্যোপলব্ধি ছাড়া গতানুগতিক অথবা বংশানুক্রমিকভাবে চলে আসা বিশ্বাস অর্থাৎ সাধারণত যাকে বিশ্বাস বলে দাবি করা হয়ে থাকে, তা যে প্রকৃত বিশ্বাস বলে গণ্য হতে পারে না সেকথাও আমাদের জানা রয়েছে।

কথাটিকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, যথাযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে কোনও বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনে যে বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় তাকেই ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে :

পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মের অনুসারী অর্থাৎ অনুসারী বলে পরিচিত ব্যক্তিগণ নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাসী বলে দাবি করে থাকে। অথচ এদের অধিকাংশই ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানেন না। অনেকে ধর্মীয়-নিষেধের ধারও ধারেন না। এমনকি অতি প্রকাশ্যে সাংঘাতিক ধরনের ধর্ম-বিরোধী কাজ চালিয়ে যান— এমন ব্যক্তিরাও নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাসী বলে দাবি করে থাকেন।

আশ্চর্যের বিষয়, সমাজের বাকি মানুষেরা তাদের ধর্ম-বিশ্বাসী বলে গ্রহণ করে। অবস্থা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, জন্ম-সূত্রকেই এরা ধর্মবিশ্বাসী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট বলে মনে করে। দুঃখের বিষয়, এদের এই মনে করার পশ্চাতে কোনও কোনও ধর্মগ্রন্থের সমর্থনও রয়েছে। অথচ ধর্ম হলো একটি আদর্শ; আর আদর্শকে বিশ্বাস করতে হয়, গ্রহণ করতে হয় এবং বাস্তবে রূপায়িত করতে হয়। অন্যথায় কেউ ধার্মিক বা ধর্ম বিশ্বাসী বলে গণ্য হতে পারে না। অতএব জন্ম-সূত্রের দাবিতে ধার্মিক বা ধর্ম-বিশ্বাসী হওয়ার দাবি যে গ্রহণযোগ্য নয় সেকথা সুস্পষ্টরূপেই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

তবে বুঝতে পারা গেলেও জন্ম-সূত্রকেই ধর্ম-বিশ্বাসী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়েই আসছে। এ ধরনের মানুষেরা যে, "অন্ধবিশ্বাসী" অথবা 'কপট-বিশ্বাসী' ব্যতীত নয়, ধর্ম সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে এমন ব্যক্তিরা অবশ্যই সেকথা জানেন। প্রচলিত ভাষায় এ দু'ধরনের মানুষদের যে যথাক্রমে 'আত্মপ্রবঞ্চক' এবং 'ভণ্ড' অর্থাৎ প্রতারক বলা হয়ে থাকে আশা করি সেকথাও তাঁদের অজানা নয়।

অতঃপর আমার নিজের প্রসঙ্গে আসা যাক। নিজে ব্রাহ্মণ ছিলাম। বাল্যকাল থেকেই ধর্ম সম্পর্কে আমার জানার সুযোগ হয়েছিল, বেশ কিছুকাল পূজার্চনার

কাজও চালিয়ে গিয়েছি। অথচ বহু চেষ্টা করেও হিন্দুধর্মের অনেক কিছুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আত্ম-প্রবঞ্চক, অন্ধবিশ্বাসী বা কপট-বিশ্বাসী অন্য কথায় ভণ্ড-প্রতারক হয়ে জীবন কাটানোর কথা ভাবতেই বিবেকের কষাঘাত অনুভব করছি। মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

অগত্যা গ্রহণযোগ্য ধর্মের সন্ধানে আমাকে ব্যাপৃত হতে হয়। শেষপর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার মনে এই বিশ্বাসই সৃষ্টি হয় যে, একমাত্র ইসলামই সত্য, অভ্রান্ত, সর্বজনীন ও সর্বকালীন; অতএব গ্রহণযোগ্য।

নির্দিষ্ট নিরপেক্ষ মন নিয়ে ভেবে দেখুন, আত্ম-প্রবঞ্চক ভণ্ড-প্রতারক হয়ে বেঁচে থাকা অথবা ইসলামগ্রহণ এ উভয়ের মধ্যে কোনটাকে বেছে নেয়া আমার জন্য সঙ্গত ও কল্যাণকর ছিল? কোনও বিবেকবান ব্যক্তির জন্যই আত্ম-প্রবঞ্চক, অন্ধবিশ্বাসী বা কপটবিশ্বাসী হয়ে বেঁচে থাকা কাম্য হতে পারে না।

অতঃপর একান্ত আকুলভাবে আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি যে আবেদনটি করতে চাই তাহলো, আপনারা দয়া করে নিজেদের পিতৃ-পৈতামহিক ধর্মের সাথে সাথে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কেও গভীরভাবে অবহিত হোন। জ্ঞানের আলোকে এবং বিবেকের কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই করুন। তারপরে আপনার মন যে-ধর্মের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আস্থাশীল হয়ে ওঠে তা গ্রহণ করুন। বিশ্বপ্রভু আপনাদের অন্ধবিশ্বাস এবং কপট-বিশ্বাসের কুম্ভীপাক থেকে উদ্ধার করে তাঁর মনোনীত পথে পরিচালিত করুন, কায়মনোবাক্যে এ প্রার্থনাই করি। আ-মীন।

ভূমিকা

বিগত ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বইখানার প্রথম প্রকাশ ঘটে এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই সবগুলো সংখ্যা নিঃশেষিত হয়ে যায়। ফলে সে থেকেই যাঁরা পত্র লিখে বা আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বইখানা পাবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে আসছেন তাঁদের সন্তুষ্ট করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না। অনেকে বইখানা পুনর্মুদ্রণের দাবিও জানিয়ে আসছেন।

সময়ের পরিবর্তনে অবস্থারও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং পুনর্মুদ্রণ অপেক্ষা পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত আকারে বইখানার দ্বিতীয় সংস্করণ বের করাই যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে আসছিল। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

এখানে বলা আবশ্যক যে, বইখানা লেখার সময় আমাদের পরম স্নেহভাজন কিশোর-তরুণ এবং যুব সম্প্রদায়ের কথাই আমার মনে বিশেষভাবে জাগরুক ছিল। এই জাগরুক থাকার অন্যতম প্রধান কারণ এই ছিল যে, শুধু দেশ এবং জাতির ভবিষ্যতই নয়; এদেশের ইসলামের ভবিষ্যতও তাদের ওপর একান্তরূপে নির্ভরশীল।

অথচ সেদিন আমি অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করেছিলাম যে, তাদের বেশ কিছুসংখ্যকের মধ্যে ইসলামবিরোধী মানসিকতা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। অবশ্য সেজন্য অন্য অনেকের মত আমি তাদের এককভাবে দায়ী বলে মনে করিনি; করতে পারিনি। কেননা, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এবং বিদেশী ব্রাহ্মণ্যবাদ উভয়ের মিলিত ষড়যন্ত্র কিভাবে হত্যা-লুণ্ঠন ও ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে এ ভারতবর্ষে এ সুদীর্ঘকাল রাজত্বকারী মুসলমানদের দীন-হীন কাঙ্গালে পরিণত করেও সন্তুষ্ট হতে পারছিল না। তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং সুনাম-সুযশকেও নির্মমভাবে পদদলিত করেছিল, বই-পুস্তকে পাঠ করা ছাড়া আমাদের মতো সে-অবস্থার নির্মম শিকারে পরিণত হয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের দুর্ভাগ্য তাদের হয়নি।

এমতাবস্থায় জন্মের পর থেকে যাদেরকে তারা মুসলমান বলে জেনে আসছেন আসলে সেই মুসলমানরা সুদীর্ঘ দু'শ বছরব্যাপী জঘন্য ষড়যন্ত্রের

যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট, নিপীড়িত এবং সর্বস্বহারা মনুষ্যাকৃতি জীব মাত্র। সুতরাং অতি নগণ্যসংখ্যক সম্মানজনক ব্যতিক্রম বাদে এসব মুসলমানকে দেখে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকে অন্যায় বা অস্বাভাবিক বলা এবং এই বিভ্রান্তির দায়িত্বকে এককভাবে আমাদের পরম স্নেহভাজন তরুণ ও যুবসমাজের ওপর চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না।

অনুরূপভাবে, জন্মসূত্রে যে ইসলামের সাথে তাঁরা পরিচিত হয়ে আসছেন সে ইসলামও সে একই ষড়যন্ত্র, ত্রিত্ববাদ, বহুত্ববাদ, এলাহীধর্ম প্রভৃতির জঘন্য আক্রমণ এবং একদিকে সুদীর্ঘকাল যাবত প্রয়োজনীয় যত্ন অনুশীলনের প্রচণ্ড অভাব আর অন্য দিকে নানা ধরনের কিম্ভুতকিমাকার এক নবতর সংস্করণ।

এখানে বিশেষভাবে বলা আবশ্যক যে, সত্যের নিজস্ব মহিমা এবং ইসলামের সত্যিকার পরিচয় জানেন এমন ব্যক্তিদের অনবদ্য ত্যাগ ও সাধনার বলেই ইসলাম আজও গোটা পৃথিবীতে একটি জীবন্ত জীবন-ব্যবস্থারূপে বিরাজমান। অন্যথায় পৃথিবীর অন্যান্য অনেক ধর্মাবলম্বীদের মত ধর্মের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মুসলমানদেরও 'ধর্ম নিরপেক্ষতার' রক্ষা কবচ ধারণ করতে হতো। ফলে ইসলামকেও অন্যান্য অনেক ধর্মের মতই একটি প্রাণহীন অনুষ্ঠান সর্বস্বে পরিণত হয়ে উপাসনালয়ের চার দেয়ালের মধ্যে আত্মগোপন করতে হতো। সুতরাং ইসলাম, মুসলমান এবং বিভাগ-পূর্ব ভারতে এ উভয়ের অবস্থা, এই তিনের সম্পর্কে আমাদের স্নেহ-প্রতীম কিশোর-তরুণ এবং যুব-সম্প্রদায়ের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়াকে কোনওক্রমেই অস্বাভাবিক বলা যেতে পারে না।

এমতাবস্থায় বিশেষ করে ইসলাম এবং মুসলমান সম্পর্কেই যাদের মনে বিভ্রান্তি বিদ্যমান, স্বাভাবিক কারণেই কারো মুসলমান থাকা বা কোনও ব্যক্তি কর্তৃক ইসলামগ্রহণ এ উভয়ের কোনওটার তাৎপর্যই অন্তত গুরুত্বসহকারে অনুধাবন করা তাদের পক্ষে সম্ভবই হতে পারে না।

অনুরূপভাবে বিভাগ-পূর্ব ভারতের ইসলাম এবং মুসলমানরা কি নিদারুণ অবস্থায় নিপতিত হয়েছিল অন্তত মোটামুটিভাবে সেকথা না জানা পর্যন্ত এই উপমহাদেশের ইসলাম এবং মুসলমানদের বর্তমান দুরবস্থার আসল কারণ সম্যকভাবে অনুধাবন করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে না।

সে কারণেই আমার জীবনে ঘটে যাওয়া কতিপয় ঘটনাকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে লিখিত 'স্মৃতির পাতা থেকে' শীর্ষক নিবন্ধটি এই সংস্করণের প্রথমেই সন্নিবেশিত করা হলো।

অনেক পরবর্তী সময়ে লিখিত বলে আমার উদ্দিষ্ট কিশোর-তরুণ এবং যুব-সম্প্রদায়ের অনেকের কাছে এই সন্নিবেশ কিছুটা বেখাপ্পা বোধ হতে পারে। তবু

ইসলামগ্রহণের কারণে বিভাগ-পূর্ব কালে আমাকে কিভাবে লাঞ্ছিত এবং বিপদগ্রস্ত করা হয়েছিল তার কিছুটা বর্ণনা রয়েছে বলেই নিবন্ধটি এখানে জুড়ে দেয়া হলো। আশা করি, এ থেকে তদানীন্তন কালে অর্থাৎ বিভাগ-পূর্ব ভারতে ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থা কত অসহায় এবং কত বিপজ্জনক ছিল তার কিছুটা আভাস তারা পাবেন।

তথাপি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যেহেতু পুস্তকটির নাম দেয়া হয়েছে 'আমি কেন ইসলামগ্রহণ করলাম' অতএব এর শুরু থেকেই ইসলামগ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ একে একে তুলে ধরাই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক ছিল। আর সেই কারণসমূহ জানার আগ্রহ নিয়েই সেকথা বুঝতে পারাও মোটেই কঠিন ছিল না। তাছাড়া এই কারণসমূহ যে ইসলামগ্রহণের পূর্বে ঘটেছিল সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় সেই কারণসমূহ ঝুলিয়ে রেখে 'ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়ার মতো' ইসলামগ্রহণের পরবর্তী ঘটনা বা দুর্ঘটনা দিয়ে পুস্তক শুরু করার কি তাৎপর্য থাকতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ আমাকে বলতে হচ্ছে যে, 'ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়ার মতো' এ কাণ্ডটা আমাকে কেন করতে হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত আভাস ইতোপূর্বে আমি তুলে ধরেছি। এ সম্পর্কে আরো কিছুটা বিস্তৃতভাবে আভাস দিতে হলে বলতে হয় যে, প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোনওরূপ চেষ্টা বা উদ্যোগগ্রহণ ব্যতিরেকে একমাত্র ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ ইসলামগ্রহণ করেছে এবং করে চলেছে।

সুতরাং কারো ইসলামগ্রহণ মুসলমানদের কাছে মোটেই অভিনব বা কোনরূপ বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। বরং ইসলামের সত্যিকারের পরিচয় যাঁদের জানা রয়েছে তাঁদের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো : বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে পৃথিবীর মানুষেরা সকলে ইসলামগ্রহণ করছে না কেন?

উল্লেখ্য, ইসলামগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন যাঁরা জ্ঞানে-গুণে এবং ধনে-মানে বিশেষভাবে প্রখ্যাত ও প্রসিদ্ধ? এমতাবস্থায় আমার মতো এমন এক অতি নগণ্য ব্যক্তির ইসলামগ্রহণ যে মুসলমানদের কাছে সামান্যতম গুরুত্বও বহন করবে না সে-সম্পর্কে আমার মনে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল এবং আজও রয়েছে।

অতএব এই গুরুত্বহীন ঘটনাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে বরং ইসলামগ্রহণের পরবর্তী সময়ে এই ইসলামগ্রহণের জন্যে আমাকে যেসব প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিত দুঃখ, যাতনা, লাঞ্ছনা, অপমানের সম্মুখীন হতে হয়েছে আমি সেগুলোকেই প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছি।

এর আগে 'অপ্রত্যাশিত' দুঃখ, যাতনা, লাঞ্ছনা, অপমানের কথা বলা হয়েছে, এর কিছুটা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

আমার ইসলামগ্রহণের কারণে হিন্দুসমাজ যে আমার ওপর রুষ্ট এবং বিরূপ হবেন এবং তাদের মধ্যে যারা উগ্রপন্থী, পশ্চাৎপদ এবং অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িক, তারা যে আমার ওপর অত্যাচার, নির্যাতন, লাঞ্ছনা, অপমানের কাজ চালিয়ে যাবেন সেটা আমার কাছে মোটেও অপ্রত্যাশিত ছিল না, বরং সেটাকে আমি স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছিলাম।

কিন্তু কোনও মুসলমানের পক্ষ থেকে তেমন কিছু ঘটা আমার কাছে ছিল একান্তরূপেই অপ্রত্যাশিত। অপ্রত্যাশিত থাকলেও তেমনটি ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে। আরও একটু খুলে বললে বলতে হয় যে, আমার ইসলামগ্রহণের জন্যে শুধু হিন্দুদের দ্বারাই নয় একশ্রেণীর মুসলমানের দ্বারাও আমাকে লাঞ্ছিত অপমানিত হতে হয়েছে, এমনকি এক শ্রেণীর মুসলমানের কার্যকলাপ আমার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে দিয়েছে। আমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং শুভ প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ অথবা ভীষণভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং করে চলেছে।

এসব কারণেই আমি আমার সেই অবুঝ মুসলমান ভাইদের কাছে আমার ইসলামগ্রহণের পরবর্তী অবস্থা তুলে ধরার মাধ্যমে তাঁদের মনে একটা পরিবর্তন আনার আগ্রহ অনুভব করেছি। আশা করি "ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়ার" মতো এই কাজটি আমি কেন করছি সহৃদয় পাঠকবর্গের সেকথা বুঝতে আর কোনও অসুবিধা হবে না।

আমার এই দীর্ঘ জীবনে দুঃখ, যাতনা, লাঞ্ছনা, অপমান এবং বাধা-বিপত্তির যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর সংখ্যা অনেক। সবগুলো এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাছাড়া পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতির আশংকা রয়েছে। তাই ওসব ঘটনার কয়েকটি মাত্র পরবর্তী 'হরিষে বিষাদ' শীর্ষক নিবন্ধে অতি সংক্ষেপে তুলে ধরবো।

হয়তো ভীষণভাবে বেদনাহত আমার এই মনটা এ থেকে কিছুটা স্বস্তি লাভে সক্ষম হবে। অন্তত আমার এই মনটার দিকে চেয়ে সাধারণভাবে সকল পাঠক এবং বিশেষভাবে আমার সেই অবুঝ মুসলমান ভাইরা কিছুটা কষ্ট করে হলেও ধৈর্যসহকারে নিবন্ধটি পাঠ করবেন এবং নিজের অন্তর দিয়ে আমার অন্তরের এ নিদারুণ জ্বালা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করবেন, সকলের কাছে সকাতরে এই অনুরোধটুকু জানিয়ে রাখছি।

বিষয়বস্তু তুলে ধরতে গিয়ে কারও কারও কাছে প্রিয় নয় এমন কতিপয় সত্য তুলে ধরা হয়েছে। কারও মনে আঘাত দেয়া বা কারও অনুভূতি খাটো করে দেখানোর উদ্দেশ্যে এটা করা হয়নি, সত্যকে সত্য বলে প্রকাশ করার সদিচ্ছা

ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্যই যে এর পেছনে নেই, বইখানা একটু মনোযোগ দিয়ে পাঠ করা হলে সেকথা বুঝতে পারা যাবে বলে আশা করি। তথাপি অজ্ঞাতসারে অথবা ভাষাজ্ঞানের অভাবের কারণে যদি কারও মনে সামান্যতম আঘাত লাগার মতও কিছু লিখে থাকি সেজন্যে গভীরভাবে দুঃখিত। আশা করি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিয়ে সেগুলো উপেক্ষা করা হবে।

প্রয়োজনবোধে বইখানার আমূল পরিবর্তন ছাড়াও কয়েকটি নতুন বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটাতে গিয়ে অনবরত লেখার কাজ চালিয়ে যেতে হয়েছে। অন্য দিকে মুদ্রণাপ্রমাদ সংশোধন এবং মুদ্রণব্যয়ের সংস্থান করতেও কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি; তাছাড়া বার্ধক্যের নানা যন্ত্রণা তো রয়েছেই। এমতাবস্থায় বহু চেষ্টা করেও লেখার কাজে যথাযোগ্য মনোযোগ দিতে পারিনি। ফলে অপ্রত্যাশিত হলেও বইখানাতে নানা ধরনের ভুলত্রুটি রয়ে গেছে। আশা করি আমার মনের দিকে লক্ষ্য করে সেগুলোকেও ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখা হবে।

পরিশেষে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমি বলতে চাই যে, ইসলামকে সত্য, শাশ্বত এবং আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দীন বলে জানার পর সকল বাঁধন এবং সকল আকর্ষণ ছিন্ন করে যেদিন ইসলামগ্রহণ করেছি সেদিন থেকেই আন্তরিকতার সাথে কামনা করে এসেছি যে, সকলে এ সত্য জানুক এবং গ্রহণ করুক। অন্তত মুসলমানেরা খাঁটি মুসলমান হয়ে গড়ে উঠুক, এটা আমার প্রতিমুহূর্তের কামনা।

জানি, কর্ম-বিহীন কামনা সফল হয় না, শুধু যাতনাই বৃদ্ধি করে। তাই সাথে সাথে নিজের অতি নগণ্য শক্তিসামর্থটুকু দিয়ে যতটুকু সম্ভব আমি কর্ম প্রচেষ্টাও চালিয়ে আসছি। অবশ্য সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। কেন হয়নি পরবর্তী নিবন্ধে তার আভাস দেয়া হয়েছে। আজ জীবনের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে এটাই হয়তো আমার শেষ প্রচেষ্টা।

অন্তত বিদায়ের পূর্বে যদি জানতে পারি যে, আমার প্রচেষ্টা দ্বারা কারও সামান্য মাত্রও উপকার সাধিত হয়েছে, তাহলে স্বস্তির সাথে শেষনিঃশ্বাস ফেলতে পারবো। সর্বপ্রদাতা করুণাময় সে সৌভাগ্য আমাকে দান করুন, কায়মনোবাক্যে এ প্রার্থনাই করি।

খাকছার
আবুল হোসেন ভট্টাচার্য

সূচিপত্র

স্মৃতির পাতা থেকে

নগণ্য হলেও উপেক্ষণীয় নয়

স্বাভাবিকতার পথ ধরেই বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে। বাংলাদেশী মানুষদের গড়-পড়তায় যতদিন বেঁচে থাকার কথা, বেশ কিছুকাল পূর্বেই আমার সে বয়স অতিক্রান্ত হয়েছে। অতএব যে কোনও মুহূর্তে বাড়তি সময়টুকুর অবসান ঘটিয়ে সেই চরম দিনটির আগমন মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অথচ ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, এই চরম দিনটির আগমন যে অবশ্যম্ভাবী এবং নিকটবর্তী সেকথা জানার পরও তা সাগ্রহে বরণ করার মত কোনও প্রস্তুতি আজও আমি গ্রহণ করতে পারিনি।

দীর্ঘ জীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাত এবং চড়াই-উৎরাই-মোকাবিলা আমাকে করতে হয়েছে; আর তা থেকে যে অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি অপরের তুলনায় তার পরিমাণ সামান্য, এমনকি নগণ্যও হতে পারে। কিন্তু নগণ্য হলেও উপেক্ষণীয় নয় এবং উপেক্ষণীয় নয় বলেই তাকে যক্ষের ধনের মত আঁকড়ে থাকা বা কবরে নিয়ে গিয়ে পচিয়ে ফেলার কোনও অধিকার আমার নেই।

তাছাড়া শৈশব থেকে শুরু করে যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত আমার চোখের সামনে ঘটে যাওয়া যেসব ঘটনা আমাকে সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল করে তুলেছিল এবং যেসব কারণে ইসলামগ্রহণ আমার কাছে অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়েছিল, অন্তত সত্যানুসন্ধিৎসু মানুষেরা যাতে সেই ঘটনাবলী এবং কারণসমূহ থেকে কিছুটা সাহায্য পেতে পারেন তেমন কোনও ব্যবস্থা না করে যাওয়াকে আমি অন্তত আমার পক্ষে চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক বলেই মনে করি।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, দায়িত্বজ্ঞান সম্পর্কে এরূপ সচেতন থাকার পরও দীর্ঘকাল এ সম্পর্কে কোন উদ্যোগ কেন গ্রহণ করা হয়নি?

এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, উদ্যোগ অবশ্যই গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তাতে আন্তরিকতারও কোনও অভাব ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নানা কারণে সেই উদ্যোগ যথাযথভাবে চালিয়ে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

কি উদ্যোগ আমি গ্রহণ করেছিলাম আর কেনইবা তা চালিয়ে নেয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি সে সম্পর্কে এখানে দু'কথা বলা প্রয়োজন। অথচ অতীতের তুলনায় কিছুটা কম হলেও এ কাজে আজও যথেষ্ট বাধা-বিঘ্ন রয়েছে। তদুপরি রয়েছে আত্ম-প্রচারণার পাপে সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা।

একথা আমার বেশ ভালভাবেই জানা রয়েছে যে, সেদিনের আমার গৃহীত উদ্যোগ প্রয়োজনের তুলনায় ছিল একান্তরূপেই অকিঞ্চিৎকর, সুতরাং উল্লেখের অযোগ্য। আর তা করাও হয়েছিল কর্তব্যের তাকিদে; এমতাবস্থায় আত্মপ্রচারণার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

কিন্তু আজ লিখতে বসে একান্ত বাধ্য হয়েই সেই অকিঞ্চিৎকর এবং উল্লেখের অযোগ্য বিষয় জন-সমক্ষে তুলে ধরতে হচ্ছে। অতএব যিনি অন্তরের সব খবর জানেন, প্রথমেই সেই অন্তর্যামী প্রভুর উদ্দেশ্যে আকুল প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আত্মপ্রচারণার জঘন্য পাপ থেকে এ নগণ্যকে রক্ষা করেন।

অতঃপর আমার সেদিনের গৃহীত উদ্যোগ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, আমার ইসলামগ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে "বিশ্বনবী (সা)-এর বিশ্ব-সংস্কার" এবং "রোজাতত্ত্ব" নামে দু'খানা বই আমি লিখেছিলাম। এর অব্যবহিত পর "মরুর ফুল" নামে একখানা কবিতার বইও লিখা হয়েছিল। আর্থিক অনটন এবং অন্যান্য প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কোনওক্রমে বই তিনখানা মুদ্রিত আকারে জনসাধারণের হাতে তুলেও দিয়েছিলাম।

এ ছাড়া বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তৃতার মাধ্যমে আমার ইসলামগ্রহণের কারণসমূহ তুলে ধরার চেষ্টাও আমি করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত একান্ত বাধ্য হয়েই আমাকে নিরস্ত হতে হয়েছিল। অথবা বলা যেতে পারে যে, আমাকে নির্মমভাবে নিরস্ত করা হয়েছিল। কেন নিরস্ত হতে হয়েছিল অতঃপর সে কথাই বলা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, প্রথম থেকে লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে, আমার এই কার্যকলাপের জন্য একটি বিশেষ মহল আমার ওপর অতিমাত্রায় রুষ্ট হয়ে উঠছে। অবশ্য তার কিছুটা কারণও ঘটে গিয়েছিল। আর তাও ঘটেছিল ধর্মসভায় আমার জীবনের প্রথম বক্তৃতা থেকেই। সহৃদয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে ঘটনাটা খুলে বলতে চাই।

বৃহত্তর রংপুর জেলার মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসার ছাত্র থাকাকালে কোচাশহর ও প্রমুখ গ্রামদ্বয়ের মধ্যবর্তী এক মাঠে (যতদূর মনে পড়ে শোলগাড়ি ঈদগাহ্ মাঠ) আয়োজিত একটি ধর্মসভায় দু'কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। আর সেটাই ছিল ধর্মসভায় আমার জীবনের প্রথম বক্তৃতা।

উল্লেখ্য, উক্ত সভায় দু'জন হিন্দুযুবক ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলামগ্রহণ করে; এর অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে উক্ত যুবকদ্বয়ের একজনের (যার মুসলিম নাম গোলাম কাদের রাখা হয়েছিল) পিশিমাতাও ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

বলা আবশ্যক যে, এই পিশিমাতা কিশোরী অবস্থায় বিধবা হন এবং পৌঢ়াবস্থায় যখন ইসলামগ্রহণ করেন তার তখন বিয়ের বয়স অতিক্রান্ত হয়েছে। ইসলামগ্রহণের কয়েক বছর পর তিনি ইন্তেকাল করেন। সুতরাং সারাটা জীবনই তাকে বৈধব্যর অভিশাপ বহন করতে হয়েছে।

একথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না, ইসলামগ্রহণের কারণে আমি যাদের বিরাগভাজন হয়েছিলাম বোধগম্য কারণেই তারা নানাভাবে আমাকে নাজেহাল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তবু এটাকে একান্তরূপে ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে করে তারা একেবারে অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন না।

কিন্তু সেই আমি যখন ইসলাম প্রচারের কাজও শুরু করলাম এবং ধর্মসভায় আমার জীবনের প্রথম বক্তৃতা শুনে তাঁদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত তিনজন মানুষ ইসলামগ্রহণ করলো তখন ধৈর্য রক্ষা করা তাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব হয়ে পড়লো।

এর পরবর্তী তিন বছরে বিভিন্ন ধর্মসভায় আমার বক্তৃতা শুনে অন্যান্য ধর্মের অন্তত ষাট জন নর-নারীকে ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে এবং আল্লাহর রহমতে ইসলামগ্রহণ করতে দেখে শুধু তাদের ধৈর্যের বাঁধই ভেঙ্গে পড়ে ছিল না, নিদারুণ ক্ষোভ এবং দুর্দমনীয় প্রতিশোধ স্পৃহাও তাদের অন্তরে জেগে উঠেছিল। ঠিক এই সময়েই 'বিশ্বনবী (দঃ)-র বিশ্ব-সংস্কার' নামীয় আমার লিখিত প্রথম বইখানা কোনওক্রমে ছাপা হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বেশ কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় এই বিশেষ মহলটির মানসিক উত্তেজনা যে কোন পর্যায়ে উপনীত হতে পারে অনুমান করা কঠিন নয়।

এই অবস্থায় অর্থাৎ ক্ষোভ এবং প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থকরণের জন্য যে সব উপায় তাঁরা অবলম্বন করেছিলেন তার অন্যতম প্রধান উপায়টি ছিল তদানীন্তন সরকারের কাছে আমার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো এবং উত্তেজনা-সৃষ্টির মিথ্যা ও স্বকপোলকল্পিত অভিযোগ আনয়ন।

উল্লেখ্য, একেতো কূটনীতিতে তাদের পারদর্শিতা সর্বজনবিদিত, উপরন্তু সংখ্যা-শক্তিতেও তাঁরা ছিলেন অতীব প্রবল। সুতরাং অভিযোগ যত মিথ্যা এবং স্বকপোলকল্পিতই হোক সুফল পেতে তাদের মোটেই বিলম্ব হয়নি।

ফলে প্রথমে নোয়াখালী জিলা-কর্তৃপক্ষ বক্তৃতা প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্যে আমার প্রতি এক কঠোর নির্দেশনামা জারি করে; পরে ময়মনসিংহ জিলার কর্তৃপক্ষ কর্তৃকও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ওদিকে রংপুর জিলার উলিপুর থানার তদানীন্তন দারোগা সাহেব সেই বিশেষ মহলটির প্ররোচনায় কর্তৃপক্ষের নিকট আমার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ সম্বলিত এক গোপন রিপোর্ট প্রেরণ করেন। উচ্চ মহল কর্তৃক উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে গোপনে গোপনে তদন্তের প্রহসনও চালানো হয়, আর এক্ষেত্রে তদন্তের ফল কি হতে পারে সেকথাও সহজেই অনুমেয়।

আল্লাহর অপার অনুগ্রহে ঠিক এই পর্যায়ে যেকোনওভাবে হোক বিষয়টি কুড়িগ্রামের প্রখ্যাত আইনজীবী এবং তদানীন্তন এম. এল. এ. নজির হোসেন খন্দকার সাহেবের গোচরীভূত হয়; অভিযোগটি যে মিথ্যা এবং বিদ্বেষ-প্রসূত, কর্তৃপক্ষকে সেকথা বোঝানোর জন্যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টাও করেন, কিন্তু তাঁকে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হতে হয়। শুধু তা-ই নয়, যেকোনও মুহূর্তে আমাকে গ্রেফতার করা হতে পারে এমন আশঙ্কা নিয়েই তিনি ফিরে আসেন।

অগত্যা সাময়িকভাবে হলেও গ্রেফতার এড়ানোর জন্যে বিলম্বে কলকাতা যাওয়ার জন্যে তিনি আমাকে পরামর্শ দেন এবং শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে বিষয়টির প্রতি শ্রদ্ধেয় মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (তদানীন্তন সরকারের সিভিল সাপ্লাই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী) সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতে বলেন।

তাঁর পরামর্শানুযায়ী সেদিনই আমি কলকাতা রওয়ানা হই এবং সুযোগমত একদিন শ্রদ্ধেয় সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি। এখানে উল্লেখ্য যে, শ্রদ্ধেয় সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে পূর্ব থেকেই আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল এবং ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করা ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোনওরূপ বিদ্বেষ ছড়ানো বা উত্তেজনা সৃষ্টিকে আমি যে অন্তরের সাথে ঘৃণা করি সেকথাও তিনি জানতেন।

তাছাড়া, ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজ পবিত্র ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়া সম্পর্কেও যে আমি অনবহিত নই সে কথাও তার অজানা ছিল না। আর অন্য ধর্মের কোনও ব্যক্তি কর্তৃক ইসলামের সৌন্দর্য প্রচারকে তারা যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো ছাড়া অন্য আখ্যা দিতে পারেন না এ সাধারণ কথাটা বুঝবার মত জ্ঞান সোহরাওয়ার্দী সাহেবের অবশ্যই ছিল।

আর ছিল বলেই তিনি আগ্রহে আমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। তবে এ ব্যাপারে তিনি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন সেকথা আমি জানি না। শুধু এটুকুই জানি যে, অতঃপর সেই বিশেষ মহলটির কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তি বহু

ছুটাছুটি করেও উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে আমাকে জড়ানোর কাজে সফল হতে পারেননি এবং দারোগা সাহেবকেও পদাবনতিসহ অনতিবিলম্বে বহু দূরবর্তী স্থানে বদলি হতে হয়েছিল।

এভাবে ব্যর্থতা বরণের পরও তাঁরা নিরস্ত হননি, বরং গুণ্ডা-পাণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে আমাকে অপমান অপদস্থ করার কাজ দীর্ঘদিন যাবৎ চালিয়ে গিয়েছিলেন; কয়েক ব্যক্তির ইসলামগ্রহণকে কেন্দ্র করে তাদের আত্মীয় অভিভাবক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা মোকদ্দমায় প্রধান অথবা অন্যতম আসামি হিসেবে আমাকে জড়ানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর একটি নাম করা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পাণ্ডা কর্তৃক উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রতিমা ভাঙ্গা, মন্দির অপবিত্রকরণ, বিগ্রহ অপসারণ প্রভৃতি জঘন্য কাজগুলোকে অন্যায়ভাবে আমার ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। এসময় বন্ধু-বান্ধব এবং হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের অনেকে আমার প্রাণনাশের আশঙ্কা করতে থাকেন এবং তাঁদের এ আশঙ্কা যে অমূলক নয় তেমন কতিপয় প্রমাণের উল্লেখ তাঁরা করেন।

এহেন অবস্থায় সাময়িকভাবে হলেও আমাকে যে কতখানি হতবুদ্ধি হতে হয়েছিল সেকথা সহজেই অনুমেয়। আর এসব ঘটনার পর প্রচারকার্য তথা আমার ইসলামগ্রহণের কারণসমূহ জনসাধারণ্যে তুলে ধরা কতখানি সম্ভব ছিল সেকথা বুঝতে পারাও খুব কঠিন নয়।

তিক্ত অভিজ্ঞতা

এ থেকে আমি যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সকলের অবগতির জন্যে এখানে তা তুলে ধরা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই মনে করি এবং আশা করি যে, ইসলাম-দরদী সুধী ব্যক্তিরা গভীরভাবে বিষয়টি ভেবে দেখবেন এবং কার্যকর ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসবেন।

আমাদের যুবসমাজ অর্থাৎ ভারত বিভক্ত হওয়ার পরে যাদের জন্ম হয়েছে বা সে সময় যারা ছোট ছিলেন, বিষয়টি সম্যকভাবে উপলব্ধি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না বিধায় প্রথমে পটভূমিকাস্বরূপ বলতে হচ্ছে—

সেদিন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনও ব্যক্তির ইসলামগ্রহণের সাথে সাথে ওপরোক্ত মহলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চঞ্চল হয়ে ছুটে এসেছে এবং নবদীক্ষিতের আত্মীয় অভিভাবক প্রভৃতিকে উস্কানি, অর্থ লোভ ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে এই দীক্ষাগ্রহণের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করতে বাধ্য করেছে।

মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে মামলার যাবতীয় খরচপত্র এবং অন্যান্য দায়িত্ব বহন করেছে এই সব প্রতিষ্ঠানই। ফলে অভিভাবকদের

মামলা চালাতে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন তো হতে হয়ই নি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক দিক দিয়ে তারা বেশ লাভবানও হয়েছে।

আর তাদের এই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে অনেক নবদীক্ষিতকেই যে নতুন করে গোবর-চোনা খেয়ে শুদ্ধ হতে হয়েছে সেকথাও প্রবীণদের অজানা নয়।

সে সময়ে এমন ঘটনাও মোটেই বিরল ছিল না যে, আট দশ বছর পূর্বে ইসলামগ্রহণ করেছে এমন অনেক মহিলার বেলাও ফুসলানি, ছিনতাই বা বল প্রয়োগে মুসলমান করার মিথ্যা অভিযোগ এনে কোর্টের সহায়তায় তাদের স্বামী, সন্তান প্রভৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্বতন অভিভাবক অথবা ক্ষেত্র বিশেষে মহিলাদের আবেদনক্রমে কোন 'নিরপেক্ষ হোম'-এ দীর্ঘদিন আটক রেখে মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ ব্যবস্থার ফলে দু'চারটি ছাড়া বাকি সকল ক্ষেত্রেই ধোলাইয়ের কাজে বেশ সুফলও তারা পেয়েছেন। ফলে ঐসব ধোলাইকৃত মহিলাদের হতভাগ্য স্বামীদের শুধু এমন জঘন্য ধরনের মিথ্যা মামলার আসামি হয়ে ভীষণভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং সর্বস্বান্তই হতে হয়নি, দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর কারাদণ্ডও ভোগ করতে হয়েছে।

যেখানে এ ধরনের মামলা মোকদ্দমার সুযোগ নেয়া সম্ভব হয়নি, সেখানে এসব সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো সমবেত হয়ে অথবা পৃথক পৃথকভাবে নওমুসলিমদের ওপর দিনের পর দিন নানা ধরনের নির্যাতন চালিয়ে গিয়েছে।

অতীব মর্মান্তিক এবং ভীষণভাবে লজ্জাজনক যে-বিষয়টি তুলে ধরার জন্যে এখানে এসব ঘটনার কিছুটা আভাস দেয়া হলো, সে-বিষয়টি এই যে, যখন এসব শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্যপুষ্ট হয়ে ওপরোক্ত বিশেষ মহলটি অত্যাচারের স্টিম-রোলার চালিয়ে যাচ্ছিল, তখন ব্যক্তিগতভাবে দু'একজন ইসলাম-দরদী ব্যক্তি ছাড়া এই সর্বত্যাগী এবং চরমভাবে লাঞ্ছনা-পিড়িত নওমুসলিমদের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্যে তেমন কোনও ইসলামী প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় নি।

অথচ তেমন কোনও প্রতিষ্ঠান থাকলে সেদিন আমাকে বা অন্য কোনও নওমুসলিমকে এমনভাবে বিপন্ন হতে হতো না; হয়তো এই বিশেষ মহলটি এমনভাবে আদা-জল খেয়ে নওমুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর সাহসই পেতো না।

এমন একটি সত্য, শাশ্বত এবং প্রচারমূলক ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও তার জন্যে কোনও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাধীনে সুযোগ এবং সুসমন্বিত প্রচার-সংঘ না থাকা শুধু ইসলাম প্রচার এবং নওমুসলিমদের জন্যেই ক্ষতিকর হয়নি, সামগ্রিকভাবে গোটা মুসলমানসমাজের জন্যে ডেকে এনেছে নিদারুণ অবক্ষয়।

এমনি ধরনের শক্তিশালী কোনও প্রতিষ্ঠান না গড়ার ফলে মুসলমানসমাজকে যে নির্মম পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে এবং আজও হচ্ছে এই পুস্তকের 'ভুলের মাশুল' শীর্ষক নিবন্ধে সে-সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হয়েছে। অতএব এ নিয়ে আর আলোচনা না বাড়িয়ে আসুন আমাদের পূর্বকথায় ফিরে যাই।

নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সাহস করে 'বিশ্বনবী (স)-র বিশ্বসংস্কার' নামক পাণ্ডুলিপিটি প্রেসে দিয়েছি। ছাপার কাজ চলছে, এমন সময় কিছু অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় আমি গাইবান্ধার তদানীন্তন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব কলিম উদ্দিন সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি। বই ছাপানো থেকে শুরু করে ইসলাম-প্রচার, নওমুসলিমদের নানা সমস্যা, ইসলাম প্রচারের জন্যে অন্তত একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা থাকার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা হয়।

কথা-প্রসঙ্গে কলিম উদ্দিন সাহেব বলেন যে, 'গাইবান্ধা মহকুমায় অন্তত সাত হাজার মসজিদ রয়েছে; ফেৎরা এবং কুরবানির বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা দান করা হয়, অথচ এ দ্বারা কোনও গঠনমূলক কাজ হয় না। এই টাকার মধ্যে নওমুসলিমদের একটি অংশ রয়েছে। যদি প্রতিটি ঈদে প্রতিটি মসজিদের এলাকা থেকে মাত্র দু'টি করে টাকাও নওমুসলিমদের জন্যে সংগৃহীত হয়, তবে এক গাইবান্ধা মহকুমা থেকেই বছরে চৌদ্দ হাজার টাকা সংগৃহীত হতে পারে। আর প্রতি বছর অন্তত এই পরিমাণ টাকাও যদি পাওয়া সম্ভব হয় তবে আপনাদের সমস্যারও বেশ কিছুটা সমাধান হয়ে যেতে পারে।'

তাঁর কথায় আমি এমনভাবেই উৎসাহিত হই যে, পর দিনই স্থানীয় খানকাহ্ শরীফে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করে বিষয়টির প্রতি উপস্থিত সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সুখের বিষয়, সকলেই এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হন এবং সর্বসম্মতিক্রমে 'নওমুসলিম তাবলীগ জামাত' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করা হয়। মাওলানা এ. কে. মনসুর আলী খান; প্রখ্যাত আইনজীবী সিরাজউদ্দিন বি. এল. সাহেব; চৌধুরী ইমদাদ আলী সাহেব, মাওলানা মাছির উদ্দিন সাহেব প্রমুখকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সদস্য এবং আমাকে সম্পাদক মনোনীত করা হয়। উল্লেখ্য, দিল্লীতে অবস্থানকালে আগ্রার 'নওমুসলিম তাবলীগ জামাত' নামীয় প্রতিষ্ঠানটির সাথে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পাওয়ার আশায় আমাদের নবগঠিত এই প্রতিষ্ঠানটিরও একই নামকরণ করা হয়।

কিন্তু শেষপর্যন্ত আমি অনুভব করি যে, এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে যোগ্যতার বহু অভাবই রয়েছে। তাছাড়া সমাজের

অজ্ঞতা এবং একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থপরতার জন্য আমাকে নিদারুণভাবে হতাশও হতে হয়।

জীবিকার সন্ধানে

অগত্যা চাকুরি নিয়ে একদিকে আত্মগোপন এবং অন্যদিকে টিকে থাকার মত অর্থ-সংস্থান করাকেই সমীচীন বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু ইসলাম প্রচারের কাজ বন্ধ করতে হবে বলে আমার মন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলায় দুলতে থাকে।

সরকারি প্রচার বিভাগে চাকুরি পেলে হয়তো কোনও না কোনও প্রকারে ইসলাম প্রচারের কাজও চালিয়ে নেয়া সম্ভব হবে, এই আশায় শেষপর্যন্ত উক্ত বিভাগে চাকুরি লাভের চেষ্টা করতে থাকি। রাহমানুর রাহীমের অনুগ্রহ পেয়েও যাই এবং ১৯৪৬ সালের শেষদিকে অন্যতম মহকুমা প্রচার কর্মকর্তা হিসেবে মালদহ জিলায় চাকুরীতে যোগদান করি। নানারূপ প্রতিবন্ধকতা এবং চাকুরি হারানোর ঝুঁকি নিয়েও সুযোগ পেলেই পাকিস্তান-পূর্ব সময়টাতে গোপনে গোপনে ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে থাকি। উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে মালদহের ধর্মভীরু মুসলমানদের যথেষ্ট সহযোগিতা আমি পেয়েছি। অন্যথায় শিখ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কশারী এস. ডি. ও., গাঙ্গুলী এস. পি. প্রভৃতির চোট সামলানো কোনওক্রমেই আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠতো না।

পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পরে বাধা-প্রতিবন্ধকতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পেলেও চাকুরির দায়িত্ব বেড়ে যাওয়ায় আশানুরূপভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তবে রাজশাহীর মুসলমানরা স্বভাবতই ধর্মপ্রাণ বিধায় বহু ধর্মসভার অনুষ্ঠান তাঁরা করে থাকেন; আর নওমুসলিম হিসেবে আমার প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণও তাঁদের ছিল তাই, প্রায় প্রতিটি ধর্মসভার পক্ষ থেকেই আমার ডাক পড়তো এবং আমি সাধ্যানুসারে তাঁদের ডাকে সাড়া দিতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু এতে মন আমার তৃপ্ত হতো না। কেননা, এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধামত মাঝে মধ্যে মাত্র দু'চারটি ধর্মসভায় উপস্থিত হওয়াই সম্ভব হতো, আর তাও আবার চাকুরির সুনির্দিষ্ট এলাকাটুকুর মধ্যে। অথচ দেশের সর্বত্র আমার কথাগুলোকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য মন আমার ব্যাকুল হয়ে থাকতো।

সৌভাগ্যবশত ইতোমধ্যে কিছুটা সুযোগ এসেও গেল। 'গ্রাম্য কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (V-AID Organisation)" কর্তৃক আঞ্চলিক ভিত্তিতে "সামাজিক শিক্ষা ও জনসংযোগ কর্মকর্তা" (Social Education-Cum-Public Relation Officer) পদে লোক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেখে যথা-নিয়মে আবেদন

করি এবং যোগ্যতা বিচারে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৬০ সালে উক্ত সংস্থার ঢাকা আঞ্চলিক দফতরে যোগদান করি। ফলে মহকুমার পরিবর্তে কয়েকটি জেলায় ফাঁকে ফাঁকে ইসলাম প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

কিছুদিন পরে উক্ত সংস্থাকে গুটিয়ে নেয়া হলে "প্রদর্শনী বিশেষজ্ঞ (Exhibit Specialist) হিসেবে "কৃষিতথ্য সংস্থায়" যোগদান করি। ফলে আমার কর্মক্ষেত্র সারা বাংলাদেশে (তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান) সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু কাজের চাপ এতই বৃদ্ধি পায় যে, ইসলাম প্রচারের সুযোগ পাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে।

অতএব ছিটে-ফোঁটার মত যা-ও একটু ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম তা-ও এমনভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় আমি বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ি। অন্যদিকে আমার দেহেও বার্ধক্যের লক্ষণগুলো একে একে প্রকট হয়ে উঠতে দেখে এটা বিলক্ষণ বুঝতে পারি যে, চাকুরির দিক দিয়ে সুযোগ করে নেয়া সম্ভব হলেও আর বেশি দিন আমার পক্ষে ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়ে নেয়া সম্ভব হবে না। আমার মৃত্যুর সাথে সাথে আমার কথাগুলো শেষ হয়ে যাবে দেশবাসী, বিশেষ করে দেশের ভবিষ্যত নাগরিকেরা আমার কথাগুলো শুনতে বা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে না। একথা চিন্তা করতেই আমার সারাটা মন দারুণ এক অস্বস্তিতে ভরে উঠতো।

তাছাড়া বেশ কিছুকাল ধরে এটা লক্ষ্য করে আসছিলাম যে, নানা কারণে কিছুসংখ্যক মুসলমান, বিশেষ করে নবীন সম্প্রদায়ের কিছুসংখ্যকের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত-ধারণা সৃষ্টি হয়ে চলেছে এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে শুধু তাদের সংখ্যাই বেড়ে চলছে না এই ভ্রান্ত-ধারণা থেকে নিদারুণ ঘৃণা-বিদ্বেষও সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

ঠিক এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাআন্দোলন তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে। সাথে সাথে একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে ইসলামবিরোধী মানসিকতাও প্রবল হয়ে উঠতে দেখা যায়। অবস্থা দৃষ্টে এটাই প্রতীয়মান হতে থাকে যে, ইসলামই যেন সবকিছুর জন্যে দায়ী এবং ইসলামকে তাড়াতে না পারলে স্বাধিকার অর্জনই যেন সম্ভব হয়ে উঠবে না।

এই বিশেষ শ্রেণীটির মধ্যে ইসলামবিদ্বেষ এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেখা যায় যে, ইসলামের প্রথা-পদ্ধতি, চিরাচরিত আচারাচরণ, পরিচয়-চিহ্ন, এমনকি ইসলামপন্থী বলে পরিচিত মানুষমাত্রই তাদের কাছে ঘৃণা-বিদ্বেষের পাত্র বলে বিবেচিত হতে থাকে। এই অবস্থায় দিনরাত খেটে কয়েকখানা বই লিখি।

কিন্তু সেগুলোকে মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করার সাধ্য আমার ছিল না। পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে বহু স্থানে বহুজনের কাছে ছুটাছুটি করেও কোনও সুফল লাভ করতে পারিনি। কেউবা বিদ্যমান পরিস্থিতির কথা বলে, আর কেউবা 'ধর্মীয় গোঁড়ামি' পরিহার করার উপদেশ দিয়ে আমাকে বিদায় দিয়েছেন। এই অবস্থায় হতাশ হয়ে বিষয়টির প্রতি সহকর্মী শ্রদ্ধেয় মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী এবং দেওয়ান আবদুল হামিদ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাঁরা উভয়েই আমাকে 'জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা (Bureau of National Reconstruction)-এর তদানীন্তন পরিচালক শ্রদ্ধেয় ড. হাসান জামান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করার পরামর্শ দেন এবং এ আশ্বাসও দেন যে গরীব লেখকদের উৎসাহিত করার জন্যে উক্ত সংস্থা বিশেষ উদারভাবে তাদের লিখিত বই-পুস্তকগুলো প্রকাশনার ব্যবস্থা করে চলেছে। সুতরাং সুফল পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁদের পরামর্শানুযায়ী সেদিনই শ্রদ্ধেয় ড. হাসান জামান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি; সুখের বিষয় 'বেদে-পুরাণে গোমাংস' নামক পাণ্ডুলিপিটি ছাড়া অন্য পাঁচখানাই তিনি দয়া করে গ্রহণ করেন।

পরম পরিতৃপ্তিসহকারে বাসায় ফিরে আসি এবং 'বেদে-পুরাণে গোমাংস' নামক বইখানা নিজের উদ্যোগেই ছাপানোর ব্যবস্থা করি। ছাপানোর কাজ কিছুটা এগিয়েছে এমস সময় স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।

তদানীন্তন পরিস্থিতিতে এধরনের বই প্রকাশ মোটেও অনুকূল ছিল না; অগত্যা অত্যন্ত বেদনার সাথে ছাপার কাজ বন্ধ করে দিতে হয়।

এদিকে বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার অব্যবহিত পরেই জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থাকে ভেঙ্গে দেয়া হয়। ফলে একমাত্র 'আমি কেন ইসলামগ্রহণ করলাম' (অর্থাৎ এই বইখানা) ছাড়া আমার প্রদত্ত বাকি কয়খানা বই উক্ত সংস্থা কর্তৃক প্রকাশ করা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই আমাকে চাকুরি থেকে অবসরগ্রহণ করতে হয়। সামর্থ্য এবং প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্য কোনও চাকুরিগ্রহণ বা উপার্জনের অন্য কোনও উপায় অবলম্বনের পরিবর্তে বাকি দিন ক'টা ইসলামপ্রচারের কাজে কাটিয়ে দেব বলে আমি সংকল্পগ্রহণ করি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমার কথাগুলো সাথে করে কবরে নিয়ে যাওয়াকে আমি শুধু দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার পরিচায়কই নয়— অপরাধজনক বলেও মনে করি। দেশবাসী বিশেষ করে আগামীদিনের নাগরিকদের জন্যে আমার কথাগুলো আমি রেখে যেতে চাই।

উল্লেখ্য, সেই কারণে অবসরগ্রহণের পরদিন থেকেই দিন-রাত খেটে লেখার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। দিনে দিনে পাপ-দুর্নীতির প্রসার সীমাহীন হয়ে চলেছে।

এমতাবস্থায় চুপ করে থাকার অর্থই হলো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া বা অবাধে চলতে সাহায্য করা। কোনও বিবেকবান মানুষের পক্ষেই তা করা সম্ভব নয়।

তাই, পাপ-দুর্নীতি প্রসারের কারণ এবং পাপ-দুর্নীতি সম্পর্কে ইসলাম যে সংজ্ঞা দিয়েছে আর তাকে সুনিয়ন্ত্রিতকরণের জন্যে যে পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলেছে, প্রথমেই তা জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করি এবং দিনরাত পরিশ্রম করার ফলে 'ইতিহাস কথা কয়' নামক বইখানা লেখা সম্ভব হয়। 'বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে, হয়তো ছাপানোর সুযোগ হবে না।' একথা চিন্তা করে বহু টাকা ঋণগ্রস্ত হয়েও বইখানা দ্রুততার সাথে ছাপানোর ব্যবস্থা করি। বর্তমানে তা বাজারে চালু রয়েছে।

অতঃপর 'ফারুক-চরিত', 'কুরআন ও বিজ্ঞান', 'নামাযের দার্শনিক তত্ত্ব', 'বিশ্বধর্ম-গ্রন্থে 'কৃষি ও কৃষক', 'বাদ-এর ফাঁদে বাংলার চাষী' নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচখানা বই লেখার কাজও ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু অর্থাভাবের দরুন ছাপানো সম্ভব হচ্ছে না। কোনও দিনই হবে কি না সেকথা আমি জানি না। আমি শুধু এটুকুই জানি যে, ছাপানো হোক আর না হোক মৃত্যুর পূর্বে আমার কথাগুলোকে লিখে রেখে যেতে হবে।

একাজে কৃষিতথ্য কেন্দ্রের প্রধান তথ্য-কর্মকর্তা শ্রদ্ধেয় মোস্তফা আলী সাহেব, উপ-প্রধান কলিমুদ্দিন সাহেব, বনসম্পর্কীয় তথ্য-কর্মকর্তা দেওয়ান আবদুল হামিদ সাহেব প্রমুখ কতিপয় সহকর্মী আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। অন্যথায় বইগুলো লেখা হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব হতো না, সে জন্যে তাঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

তাছাড়া আমার অবসরগ্রহণ উপলক্ষ্যে কৃষিতথ্য কেন্দ্রের সহকর্মিবৃন্দ বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করে প্রীতি-উপহারস্বরূপ অনেক কিছুর সাথে একটি মূল্যবান কলম আমার হাতে তুলে দিয়ে তার সদ্ব্যবহার করতে বলেছিলেন।

এতদ্বারা তাঁরা শুধু আমার প্রতি তাঁদের অন্তরের প্রীতি এবং শুভেচ্ছাই জ্ঞাপন করেননি, লেখার কাজে যথেষ্ট উৎসাহও যুগিয়েছেন; আর সাথে সাথে কঠিন এক দায়িত্বের বোঝাও আমার ওপরে চাপিয়ে দিয়েছেন। অতএব বইগুলো লেখার কাজে তাঁদের অবদান কোনও অংশেই কম বা অনুল্লেখযোগ্য নয়।

কথায় কথায় আলোচনা দীর্ঘায়িত করে হয়তো ইতোমধ্যেই অনেকের ধৈর্যচ্যুতির কারণ ঘটিয়েছি। কিন্তু এখনও একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। অতএব একটু ধৈর্য ধারণের জন্যে সহৃদয় পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে বিনীত অনুরোধ জানিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করছি।

অনুসন্ধিৎসা যে মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহের অন্যতম সেকথা প্রায় সকলেরই জানা রয়েছে। আর এই বৃত্তিই যে অজানাকে জানার জন্যে মানব-মনে প্রেরণা এবং উৎসাহ সৃষ্টি করে সেকথা কারো অজানা নয়।

অজানাকে জানার এই স্বাভাবিক প্রেরণা থেকেই প্রায় প্রতিটি মানুষ আমাকে প্রশ্ন করে থাকেন যে, 'আপনি কেন ইসলামগ্রহণ করেছেন?'

উল্লেখ্য, শুধু মুসলমানগণই নন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষদেরও অনেকে এই প্রশ্নটি করে থাকেন। খুব সম্ভব আমার নামের শেষে 'ভট্টাচার্য' পদবীটি থাকাই প্রশ্নকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। তাছাড়া আজও আমি এই পদবীটি ব্যবহার করে চলেছি বলে অনেক সময় আমাকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়।

অতএব পৈত্রিক-সূত্রে পাওয়া ভট্টাচার্য পদবীটি এখনও কেন ব্যবহার করে চলেছি সে সম্পর্কে প্রথমে আভাস দিতে চাই।

একথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না যে, পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, আত্মীয়-স্বজন, সহায়-সম্পদ প্রভৃতির চেয়ে পদবী বড় নয়। যারা এসব কিছু বা এসব কিছুর মায়া-মোহ অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করে ধর্মান্তরগ্রহণ করে, পদবীর মোহ তাদের থাকে না, থাকা উচিৎ নয়। সম্ভবও নয়।

এমতাবস্থায় নামের শেষে পৈত্রিক পদবী জুড়ে দিয়ে বাহাদুরী প্রকাশ বা নিজেদের পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার কোন প্রশ্নই তাদের মনে জাগতে পারে না। জাগাও উচিৎ নয় অথবা তারা দয়াপরবশ হয়ে ইসলামগ্রহণ করে ইসলামকে ধন্য করেছে এমন উদ্ভট খেয়ালও তাদের হতে পারে না। যদি কারো হয় তবে বুঝতে হবে যে, সে ভণ্ড এবং তার ইসলামগ্রহণ ষোল আনাই ব্যর্থ হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে 'তবে এ পদবী রাখা হলো কেন?'

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে অনিবার্য কারণেই অতীতের প্রসঙ্গ টেনে আনতে হয়।

মুসলমানদের সৌভাগ্যের দিনে যারা তাদের কাছে নিজেদের কন্যা, ভগ্নী, ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রভৃতিকে বিয়ে দিয়ে গর্ববোধ করতো, 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো' বা অর্থাৎ "দিল্লীর ঈশ্বর (বাদশাহ-সম্রাট) ইহ-জগতের ঈশ্বর" একথা বলে তোষামোদ করতে দ্বিধাবোধ করতো না, তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে যারা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতো, এক কথায় মুসলমানদের অনুগ্রহ পেলে যারা জীবনকে ধন্য ও সার্থক বোধ করতো, সেই তারা-ই সুযোগ বুঝে জঘন্য ষড়যন্ত্র, হত্যা, লুন্ঠন প্রভৃতি চালিয়ে মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের করুণ শিকার, অন্য কথায় বাদশাহী থেকে কড়ার কাঙ্গালে পরিণত করেও তৃপ্ত হতে পারল না।

এই দেশের লাঞ্ছনা-পীড়িত এবং দারিদ্র্য-জর্জরিত 'ছোট জাত'-এর মানুষেরাই যে মুসলমান হয়েছে অর্থাৎ মুসলমানেরা যে আসলেই দরিদ্র এবং ছোটজাতের মানুষ, কোনও শিক্ষিত বা ভদ্রসন্তান যে মুসলমান হতে পারে না, সেকথা প্রমাণ করার জন্যে তারা আদা-জল খেয়ে লেগে গেল। তাদের শিক্ষিত, ভদ্র এবং সুধীসজ্জনদের অনেকে 'এক হাতে কুরআন এবং অন্য হাতে তরবারি' নিয়ে ইসলামপ্রচার করা হয়েছে, এমন জঘন্য মিথ্যা এবং অবাস্তর কথা ছাড়াও মুসলমানদের সম্পর্কে জঘন্য কল্প-কাহিনী রচনা ও ইতিহাস, সাহিত্য, উপন্যাস, নাটক-নাটিকা প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাপক এবং কার্যকরিভাবে সেগুলোর রটনায় লেগে গেলেন। প্রচারমাহাত্ম্যে দিনে দিনে সেই জঘন্য মিথ্যা এবং অবাস্তব কল্প-কাহিনীগুলোই সত্যের রূপ ধারণ করে পরবর্তী বংশধরদের মন-মগজে স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে বসলো।

"লাঞ্ছনা-পীড়িত, দারিদ্র্য-জর্জরিত এবং অজ্ঞ-অশিক্ষিত ছোটজাতের মানুষেরাই ইসলামগ্রহণ করেছে" এ কথার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপনের অর্থাৎ ইসলামের সত্যতা যাচাই করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন ধর্মের উচ্চশিক্ষিত, উচ্চবংশোদ্ভূত, মান-সম্মান ও বিত্ত-বৈভবের অধিকারী মানুষেরাও যে ব্যাপক হারে ইসলামগ্রহণ করেছে এবং করে চলেছে সেকথা জাজ্বল্যমানরূপে প্রমাণ করার জন্যে শুধু আমিই নই, আরো অনেকে নামের শেষে পিতৃ-পৈতামহিক পদবী ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

এ প্রসঙ্গে আবদুস সোবহান ভট্টাচার্য, দীন মুহম্মদ গাঙ্গুলী, ইসমাইল খাঁ মুখার্জি, আবদুস সামাদ গোস্বামী, আবদুল্লাহ ব্যানার্জি, নূরুল ইসলাম অধিকারী, আবদুর রহমান ব্যানার্জি, আমিনুল ইসলাম রায়, আবদুর রহমান গোপ, স্বামী আনন্দ প্রকাশ গোলাম মুহাম্মদ, লর্ডহেডলি আল-ফারুক, আবদুল্লাহ ফ্রানসিস, মি. রশিদ শাপ, মি. এন্টনি আবুল ফয়েজ, মি. আহমদ জে মাইকেল, মি. ওসমান ওয়াট কিনস্, মি. আবদুল্লাহ কার্ডেল রায়ান, মি. মাইকেল মোবারক আহমদ, মিস হেদায়েত বাড প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, অনেকের নাম আমার জানা নেই, আর যারা নামের সাথে অতীতের পদবী বা পরিচয়-জ্ঞাপক কোনও শব্দ ব্যবহার করেননি তাদের নাম এখানে তুলে ধরা হয়নি। উল্লেখ্য, আমার নামের শেষে ভট্টাচার্য পদবীটি থাকার কারণেই আমি যে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ থেকে ইসলামগ্রহণ করেছি, অন্য ধর্মের মানুষেরা সহজেই যেন সেকথা বুঝতে সমর্থ হয় এবং একজন ব্রাহ্মণ হয়েও আমি কেন একাজ করেছি, সেকথা জানার জন্যে তাদের মনে আগ্রহ জাগে। আমার উত্তর শুনে তাদের অনেকেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং কেউ কেউ ইসলামগ্রহণও করে। আশা করি, বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষভাবে ভেবে দেখা হবে এবং অতঃপর

ভট্টাচার্য পদবী রাখার জন্যে আর আমাকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে না।

পূর্বেই বলেছি যে, যেখানেই যাই আমি যে একজন নবদীক্ষিত মুসলমান সেকথা জানার সাথে সাথে উপস্থিত প্রায় সকলেই আমার ইসলামগ্রহণের কারণ জানার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। তাঁদের এ আগ্রহ মিটানো আমার একটি নৈতিক দায়িত্ব। আর সে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই "আমি কেন ইসলামগ্রহণ করলাম" লিখিত হয়েছে। অর্থাভাববশত পুস্তকের কলেবর ইচ্ছা এবং প্রয়োজনানুযায়ী বাড়ানো সম্ভব না হওয়ায় সকল কারণগুলো তুলে ধরা গেল না। আল্লাহর কৃপা হলে পরে এ সম্পর্কে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে, আমি কবি, সাহিত্যিক বা লেখক প্রভৃতির কোনওটাই নই। তাছাড়া মাতৃভাষার পরিবর্তনীয় বা পরিবর্তনযোগ্য কোনও শব্দ নির্বাচনেও আমি সক্ষম নই। বাংলাভাষার বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষা বা বিশুদ্ধিকরণের জন্যে সে ভাষার সাথে সুদীর্ঘকাল যাবৎ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং সকল মহলে সহজ ও সাবলীলভাবে প্রচারিত আরবী, ফারসি, ইংরেজি ভাষার শব্দগুলোকে বাদ দিয়ে দুর্বোধ্য, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষার শব্দ টেনে এনে জুড়ে দেয়ার তাৎপর্য উপলব্ধি করার মত জ্ঞান বুদ্ধিও আমার নেই।

অতএব ভাষার লালিত্য, ছন্দের মাধুর্য, শব্দের গুরুত্ব প্রভৃতি কোনও দিকে লক্ষ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বিশেষ করে এ বয়সে বই লিখে নাম ক্রয় করার বা প্রশংসা অর্জনের লোভ এবং আশা এর কোনওটাই আমার নেই বলে ওসব দিকে নজর দেয়ার প্রয়োজন আমি বোধ করিনি।

আমি শুধু একটি বিষয়ের প্রতিই আমার লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত রেখেছি। আর তা হলো, "আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, অতএব যে কোনওভাবে অন্তত আমার মৃত্যুর পূর্বে আমার এ কথাগুলোকে সর্বসাধারণ ভ্রাতা-ভগ্নীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।" অতএব আমার মনের দিকে চেয়ে সকল প্রকারের ভুল-ক্রটি ক্ষমা করা হলে আমি কৃতার্থ বোধ করবো এবং যে উদ্দেশ্যে আমার এ প্রয়াস ও পরিশ্রম, তার একটি ক্ষুদ্র অংশকেও সফল এবং সার্থক করে তোলা হলে আমার জীবন ধন্য হয়েছে বলে মনে করবো।

এ প্রসঙ্গের উপসংহারে বলতে হচ্ছে যে, একুশ বছর বয়সে ইসলামগ্রহণ করি; বর্তমানে একষট্টি চলছে। ইসলামী জীবনের এই দীর্ঘ চল্লিশটি বছরে স্মৃতির পাতার পরতে পরতে কত কথা, কত ঘটনার ইতিহাস এবং কত মানুষের পরিচয় যে জমে উঠেছে তার ইয়ত্তা করা সম্ভব নয়।

ইসলামগ্রহণের পূর্বে মুসলমানদের সাথে মেলামেশার সুযোগ খুব কমই হয়েছিল। সুতরাং পূর্ব-সঞ্জাত ঘৃণা এবং অনভ্যাসের জন্যে ইসলামগ্রহণের পরে

বেশ কিছুদিন মুসলমানদের রান্না করা কোনও কিছু খেতে পারিনি একই কারণে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যেতেও পারিনি।

এই অবস্থায় যখন জানতে পারলাম যে, আমার স্বজন পরিজনেরা আমার কুশপুত্তলিকাদাহ ও শ্রাদ্ধ-পিণ্ডদান প্রভৃতি অর্থাৎ মৃতের প্রতি তাঁদের করণীয় সবকিছুই সমাধা করেছেন। এক কথায়, তাঁদের দৃষ্টিতে আমি যে মৃত, সেকথা প্রমাণ করার কোনও কিছুই তারা বাকি রাখেননি। অন্য কথায়, বলা যেতে পারে যে, তাঁদের এবং তাঁদের বিষয় সম্পদের সাথে আমার যে আর কোনও সম্পর্ক রইলো না, সেকথা শুধু আমাকেই নয় সাধারণভাবে সকল মানুষকে জানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা তাঁরা করেছেন, তখন নিজকে বড় অসহায় বলে মনে হয়েছিল।

তবে সে অবস্থা ছিল খুবই স্বল্পস্থায়ী। কেননা, কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, মুসলমানদের সম্পর্কে শুধু অজ্ঞতাই নয়, আবাল্যপোষিত ভ্রান্ত বিশ্বাসও আমার এই অসহায় বোধের জন্যে বিশেষভাবে দায়ী।

সেই বিশেষ শ্রেণীটি বাদে ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং নর-নারী নির্বিশেষে যিনি আমাকে নওমুসলিম বলে জানতে পেরেছেন, আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি যে, তিনিই অন্তর দিয়ে আমার এই অসহায়ত্বের কথা উপলব্ধি করেছেন এবং কেউবা স্নেহ-মমতা, কেউবা সৌহার্দ-বাৎসল্য, আর কেউবা প্রীতি ও ভালোবাসা দিয়ে আমার স্বজন হারানোর সকল অভাব, সকল বেদনা এবং সকল দুঃখ মিটিয়ে দিতে চেয়েছেন।

পরে একথাও বুঝতে পেরেছিলাম যে, যেকোনও লোক ইসলামগ্রহণ করুক, আর অতীত জীবনে আর সামাজিক মর্যাদা যাই থাক, ইসলামগ্রহণের পর তাকে নিগ্রোনেটিভ বা অচ্ছ্যুত বলে ঘৃণাভরে দূরে সরিয়ে রাখা হয় না। কেননা, এতে সত্যকে ঘৃণা করা হয়; মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার অস্বীকার করা হয়; তা ইসলাম এ কাজ সমর্থন করে না। ফলে মুসলমানরাও সকল নওমুসলিমকে বুকে জড়িয়ে একাকার করে নেন।

যাদের অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসায় আমি স্বজন হারানোর ব্যথা ভুলতে পেরেছি, তাদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। বিভিন্ন জেলায় যেসব ধর্মপ্রাণ মুসলমান আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশার্থে সভা-সমিতির আয়োজন করে আমাকে ইসলাম সম্পর্কে দু'কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন তাঁদের কাছে আমার ঋণের পরিমাণ মোটেই কম নয়। এমনিভাবে সারাজীবন ঋণ করেছি এবং দিনে দিনে সে ঋণ বেড়েই চলছে।

অবসর মুহূর্তে যখনই স্মৃতির পাতা চোখের সম্মুখে মেলে ধরি, তখনই রূপালী পর্দার মত অসংখ্য অগণিত ছবি সেখানে আমি দেখতে পাই; আর সবার কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যে বিশ্বপতির উদ্দেশ্যে জানাই অন্তরের আকুল প্রার্থনা।

হরিষে বিষাদ

ইসলামগ্রহণের সাথে সাথে স্বজনহারা, নিঃস্ব এবং নিরাশ্রয় হতে হয়েছিল। এ সময় মনের অবস্থা কী হতে পারে সেকথা সহজেই অনুমেয়।

আমার ইসলামগ্রহণের কারণে যাঁরা ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড আঘাতও এসেছিল ঠিক এই সময়েই।

চারদিকে বিপদের এ ঘন-ঘটার মধ্যেও একটি কারণে আমি সম্পূর্ণ শান্ত ও অবিচল থাকতে পেরেছিলাম। আর সে কারণটি হলো ইসলামগ্রহণ। সর্বশক্তিমান আল্লাহকে একমাত্র প্রভু, একমাত্র সহায় ও একমাত্র রক্ষক হিসেবে আঁকড়ে ধরার ফলে কোনও বিপদই সেদিন আমার কাছে বিপদ বলে অনুভূত হয়নি। এত বিপদের মধ্যে যখনই মনে হয়েছে যে, আমি আল্লাহর মনোনীত দীনগ্রহণ করেছি তখনই এক অনির্বচনীয় আনন্দে আমার মন ভরে উঠেছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এক শ্রেণীর হিন্দু কর্তৃক আমার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ বর্ষণ, নিন্দা-কুৎসা প্রচার, এমনকি দৈহিক নির্যাতন চালিয়ে যাওয়াকেও আমি স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছিলাম এবং বলতে গেলে সে জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়েই ইসলামগ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু কোনও মুসলমানের পক্ষ থেকে তেমন কিছু ঘটতে পারে এটা ছিল আমার কল্পনারও বাইরে। অথচ দুর্ভাগ্যবশত আমার জীবনে তা ঘটেছে এবং আজও ঘটে চলছে।

ভেবেছিলাম এ সম্পর্কে কিছু লেখবো না। কেননা, এতদ্দ্বারা এক দিকে যেমন গোটা মুসলমানসমাজের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা হবে অন্যদিকে এই ঘটনাসমূহের কথা জেনে কোটি কোটি ঈমানদার মুসলমানের মনও বেদনা-ক্লিষ্ট হয়ে উঠবে। এমনকি ইসলামকে সামান্যতম ভালবাসেন এমন ব্যক্তিও দুঃখ অনুভব না করে পারবেন না।

কতিপয় ব্যক্তির আচরণের কথা তুলে গোটা মুসলমানসমাজের মর্যাদা হানি করা ও কোটি কোটি মুসলমানের মন বেদনা-ক্লিষ্ট করার ইচ্ছা আমার ছিল না। তাই মূল পুস্তকেই এই প্রসঙ্গটি তুলে ধরা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলাম।

কিন্তু জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়ে আজ মনে হচ্ছে যে, অন্তত মুসলমানদের চৈতন্য ফিরিয়ে আনার জন্যে এ সম্পর্কে কিছু লেখা প্রয়োজন। অন্যথায় আল্লাহর কাছে আমাকেও দায়ী হতে হবে।

স্থানাভাব এবং পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতির ভয়ে সবকথা এখানে তুলে ধরা সম্ভব হলো না। ভিন্ন ভিন্ন উপ-শিরোনাম দিয়ে কয়েকটি মাত্র ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো। যদি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকি এবং আল্লাহ তওফিক দান করেন তবে 'অশ্রু দিয়ে লিখে যাই' নাম দিয়ে একখানা বই লিখবো এবং তার মধ্যে যতটা সম্ভব বিস্তারিতভাবে ঘটনাগুলো তুলে ধরবো।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকার এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টা কেন?

যেসব কারণে আমি পৈত্রিক ধর্মের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলাম তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল— সে ধর্মের 'জাতিভেদ প্রথা'।

এ প্রথার মাধ্যমে অন্ত্যজ, অচ্ছুৎ, শঙ্কর বর্ণ, প্রতিলোম, হরিজন প্রভৃতি এক কথায় 'দাসজাতি' আখ্যা প্রদান করে হাজার হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানুষকে কিভাবে বংশপরম্পরায় দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে সেকথা কারো অবিদিত নয়।

সে অন্ধকার যুগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিদ্যমান দাস-প্রথার কথা স্মরণ করে আজও অনেককে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করতে এবং সমালোচনায় পঞ্চমুখ হতে দেখা যায়। কিন্তু সেই থেকে হাজার হাজার বছর ধরে আজও ভারতের বুকে যে অতি জঘন্য ধরনের দাস-প্রথা প্রচলিত রয়েছে সে সম্পর্কে উক্ত মহলকে টু শব্দটিও করতে দেখা যায় না।

এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিই এ মৌনতার অন্যতম প্রধান কারণ বলে আমি মনে করি।

কেননা, ভারতের এই দাসত্ব হলো— ধর্মীয় দাসত্ব। অর্থাৎ ধর্মীয় বিধান কর্তৃক এই দাসত্ব-প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে, ধর্মীয় বিধান কর্তৃক একে চালু রাখা হয়েছে এবং ধর্মীয় বিধান কর্তৃক এটিকে অলঙ্ঘ্য-অপরিবর্তনীয় বলে ঘোষণার মাধ্যমে চিরস্থায়ী করে তোলা হয়েছে।

অতএব ন্যায়ের বিচারে এ প্রথা যত ক্ষতিকর এবং দূষণীয়ই হোক, যাঁরা এ ধর্মীয় বিধানের সমর্থক এবং অনুসারী বোধগম্য কারণেই তাঁদের মুখ থেকে এ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তো দূরের কথা সামান্যতম বিরূপ মন্তব্যও আশা করা যেতে পারে না।

তাছাড়া বিপদের ভয়ও রয়েছে। কেননা, এ প্রথার সামান্যতম বিরুদ্ধাচরণকেও ধর্মীয় বিধান কর্তৃক নিষিদ্ধ এবং ভীষণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইহকালে সমাজচ্যুতি এবং পরকালে স্বর্গচ্যুতি এ উভয়-বিধ বিপদের কথা স্মৃতিতে জাগরুক থাকায় প্রথাটিকে অন্যায় এবং মানবতাবিরোধী জেনেও কেউ মুখ খুলতে পারছেন না।

এ তো হলো সাধারণভাবে সকল মানুষের অবস্থা। আর বিশেষভাবে যারা অবস্থার শিকার অর্থাৎ অন্ত্যজ, অশুচি, ছোটজাত প্রভৃতি আখ্যাপ্রাপ্ত দাসশ্রেণীর কোটি কোটি মানুষ; তাদের অবস্থা হলো— ঠাকুর পুরোহিতদের কাছে হাজার হাজার বছর ধরে বংশানুক্রমিকভাবে তারা জেনে আসছে যে, এই দাসত্ব এবং নির্যাতন ভোগ তাদের নিজেদেরই কর্মফল।

পূর্বজন্মে যেসব পাপ ও অন্যায় তারা করেছে তারই প্রায়শ্চিত্ত ভোগের জন্যে এ জন্মে তারা ছোটজাত হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। এটা দয়াময় বিধিরই অলঙ্ঘ্য বিধান এবং অদৃষ্ট বা কপালের লিখন। সুতরাং এ জন্যে শাস্ত্রকর্তা, ভগবান এবং নির্যাতনকারী মানুষেরা মোটেই দায়ী নয়।

এই হীনমন্যতার অভিশাপ হাজার হাজার বছরে ওদের মন-মস্তিষ্ককে এমনভাবেই আচ্ছন্ন অভিভূত করে ফেলেছে যে, ওরা যে মানুষ এবং ওদেরও যে মানুষের মতো মর্যাদা ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার রয়েছে সেকথা কল্পনা করতেও আজ আর ওরা সক্ষম নয়।

অবস্থা এমন পর্যায়েই নেমে এসেছে যে, আজ কেউ যদি ওদের এ অধিকারের থাকার কথা বলে তবে ওরা ভীষণভাবে বিস্মিত হয় এবং এমন কথা চিন্তা করাকেও ওরা অতি জঘন্য ধরনের পাপ এবং ভীষণভাবে ধর্ম-বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করে।

মোটকথা, হাজার হাজার বছর ধরে এই প্রথা চালু থাকার ফলে এটা সমাজ কর্তৃক সঙ্গত ও স্বাভাবিক বলে গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটা যে অতি জঘন্য এবং মানবতাবিরোধী কাজ— অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত এ উভয়ের মন থেকেই সে অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়ে গিয়েছে।

সুদূর অতীতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রচলিত দাস-প্রথার কথা স্মরণ করে যারা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন এবং সমালোচনার ঝড় তোলেন তাঁদের অবগতির জন্যে বলা প্রয়োজন যে, অমানবিকতার দিক দিয়ে ভারতের এ দাস-প্রথার সাথে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের দাস-প্রথার কোনও তুলনাই হতে পারে না।

কারণ—

(ক) পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দাসদের ব্যক্তিগতভাবে দাস বলে বিবেচনা করা হতো। দয়াপরবশ হয়ে অথবা মুক্তপণ্যের বিনিময়ে প্রভু কর্তৃক মুক্ত হলে সে-ব্যক্তি আর দাস বলে বিবেচিত হতো না— স্বাধীন মানুষের মর্যাদায় ফিরে যেতো।

তাছাড়া যেহেতু ওটা ছিল ব্যক্তিগত দাসত্ব। অতএব সংশ্লিষ্ট দাসের পিতা-মাতা বা বংশের ওপর এই দাসত্বের কোনও প্রভাব পড়তো না অর্থাৎ দাসদের

পিতা-মাতা এবং বংশীয় মানুষেরা সমাজের অন্য স্বাধীন মানুষদের সাথে সম-মর্যাদা ভোগ করতো।

(খ) পক্ষান্তরে ভারতীয় দাসেরা কোনও কারণে প্রভু কর্তৃক মুক্তি পেলেও তাদের দাসত্ব মোচন হয় না। কেননা, ধর্মীয় বিধান এবং সামাজিক ব্যবস্থানুযায়ী তারা বংশানুক্রমিকভাবে চিরকালের দাস; আর এই দাসত্ব করার জন্যেই তাঁদের জন্ম হয়েছে।

(গ) পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দাস-প্রথার সাথে ধর্মের বা পরকালের কোনও সম্পর্ক ছিল না। তা ছিল একান্তরূপেই পার্থিব ও ব্যক্তিগত ব্যাপার। পক্ষান্তরে ভারতীয় দাস-প্রথা সম্পূর্ণরূপে ধর্মানুমোদিত এবং কোনও পক্ষ থেকে এই প্রথার সামান্যতম লংঘনের জন্যেও ইহলোকে তো বটেই এমনকি পারলৌকিক জীবনেও অনন্তকালব্যাপী শাস্তি অবধারিত থাকার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

এ নিয়ে আর কিছু বলতে চাই না। যারা হিন্দুধর্মের দাস-প্রথা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাঁদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, তাঁরা যেন আমার লিখিত 'আর্তনাদের অন্তরালে' নামক বইখানা অন্তত একবার পাঠ করেন।

মানুষে মানুষে এই ভেদ-বৈষম্য এবং এক বা একাধিক শ্রেণী কর্তৃক কোটি কোটি মানুষকে পশু অপেক্ষাও হীন ও জঘন্য মনে করা এবং তাদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার ও শোষণ-নির্যাতন চালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে আমি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছি। বিবেক এটাকে অতি জঘন্য কাজ বলে রায় দিয়েছে। মনে প্রশ্ন জেগেছে—

এটা কি করে ধর্মের কাজ এবং ধর্মানুমোদিত হতে পারে? ধর্ম হলো বিশ্বপ্রভুর এক অমর অতুলনীয় অবদান। মানুষকে মর্যাদাশালী তথা মহীয়ান গরীয়ান বা সৃষ্টির সেরা করে গড়ে তোলাই হলো ধর্মের কাজ, অন্তত তা-ই হওয়া উচিত।

এমতাবস্থায় কোনও ধর্ম যদি মানুষকে মর্যাদাশীল তথা মহীয়ান-গরীয়ান করে গড়ে তোলার পরিবর্তে এক মানুষের দ্বারা অন্য মানুষের মর্যাদা ধূলায় লুটিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয় তবে তাকে কি করে ধর্ম বলা যেতে পারে? এমনিভাবে কোটি কোটি মানুষের মর্যাদা যে ধর্ম চিরতরে ধূলায় লুটিয়ে দিলো তাকে আর যা-ই হোক কোনওক্রমেই 'মানবধর্ম' বলা যেতে পারে না।

বিবেকের তাড়নায় ছুটে গিয়েছে এবং পৃথিবীর কোথাও 'মানবধর্ম' অর্থাৎ যে ধর্মে সকল মানুষের সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা রয়েছে এমন কোনও ধর্ম আছে কি না তা জানতে চেয়েছি।

দুঃখের বিষয়, সাধ্যানুযায়ী যেসব ধর্মের সাথে আমি পরিচিত হতে পেরেছি তার সবগুলোই আমাকে নিদারুণভাবে হতাশ করেছে। কেননা, তাদের প্রায় সব

ক'টিই গুরু-পুরোহিত, ধর্মাধ্যক্ষ, ঈশ্বরের অংশ, অবতার, সদাপ্রভুর ঔরস-জাত একমাত্র সন্তান, অতি-মানব, মহা-মানব প্রভৃতি কোনও না কোনও আখ্যা প্রদান করে ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী বিশেষকে সাধারণ মানুষদের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চাপিয়ে দিয়েছে। কালক্রমে এ সকল ব্যক্তি বা সে সকল শ্রেণীর মানুষেরা সাধারণ মানুষদের উপাস্য বা নমস্যরূপে পরিগণিত হয়েছেন।

কোনও কোনও ধর্ম, গাত্র-বর্ণ, বংশ, গোত্র, ধন-সম্পদ, দৈহিক শক্তি, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বিশেষ সুবিধাভোগী এক বা একাধিক 'বড়জাত' সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষদের মর্যাদা অস্বীকার করেছে।

এসব দেখে শুনে যখন হতাশ হয়ে পড়েছি তখন ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই আমাকে হতাশামুক্ত করেছে। শুধু তাই নয় মানবধর্মের প্রকৃত চেহারা কি হওয়া উচিত সে-সম্পর্কেও আমার সম্মুখে এক অনবদ্য রূপরেখা এঁকে দিয়েছে।

এমনিতেই আলোচনা দীর্ঘায়িত করে পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতির যথেষ্ট কারণ ঘটিয়েছি। অতএব ইসলাম মানুষের গড়া ভেদ-বৈষম্যর চিরঅবসান ঘটিয়ে কিভাবে মানবতাকে চিরভাস্বর ও চিরসমুন্নত করে তুলেছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আর সঙ্গত হতে পারে না। তাই সে-সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে কিছুটা আলোকপাত করে আমার আসল বক্তব্য তুলে ধরছি।

ইসলাম সম্পর্কে জানতে গিয়ে আমি বিশেষভাব লক্ষ্য করেছি যে, পবিত্র কুরআন এবং হাদিসের গ্রন্থসমূহ দু'টি বিষয়ের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। তার একটি হলো : বিশ্বপতি আল্লাহর একত্ব এবং সার্বভৌমত্ব। দ্বিতীয়টি হলো : এ সৃষ্টজগতে মানুষের মর্যাদা, অধিকার এবং কর্তব্য।

মানুষের মর্যাদার কথা বলতে গিয়ে ইসলাম সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে, "মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব এবং আল্লাহর প্রতিনিধি।"

আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, পৃথিবীর অন্য কোনও ধর্ম মাটির মানুষকে সৃষ্টির সেরা এবং অসীম অনন্ত আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার মতো এত বড় সম্মান ও মর্যাদা দেয়নি, দিতে পারেনি।

এমনকি এই বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তেও যেসব ইজম, যেসব মতবাদ ও যেসব সংস্থা-সংগঠন মানুষের মর্যাদা ও অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করতে গিয়ে সারা বিশ্বে ভীষণ আলোড়নের সৃষ্টি করেছে, খোঁজ-খবর নিলে দেখা যাবে যে, মানুষের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণা আজও অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়েই রয়ে গেছে। অর্থাৎ মানুষ যে আল্লাহর প্রতিনিধি, মানুষ সম্পর্কে এত

বড় একটা ধারণায় উপনীত হওয়ার মতো মন-মানসই আজ তাদের মধ্যে গড়ে উঠতে পারেনি।

কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, হিন্দুধর্মের কোনও কোনও গ্রন্থ মানুষ অর্থাৎ নরকে 'নারায়ণ' এবং জীবকে 'শিব' বলে আখ্যায়িত করেছে। মানুষ-বিশেষকে উক্ত ধর্ম ভগবান, ঈশ্বরের অংশ, অবতার প্রভৃতি বলতেও ত্রুটি করেনি। এমতাবস্থায় 'প্রতিনিধি' হওয়া অপেক্ষা ভগবান বা ঈশ্বর বলে আখ্যা লাভই তো অধিক সম্মানজনক।

তাঁদের কথার উত্তরে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমি বলতে চাই যে, নরকে 'নারায়ণ' এবং জীবকে 'শিব' বলে আখ্যায়িত করলেই নর নারায়ণ হয়ে যায় না, জীবও শিব হয় না। অনুরূপভাবে নর বা জীবের পক্ষে ভগবান, ঈশ্বর প্রভৃতি হওয়াও সম্ভব নয়।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে-ব্যক্তি যা নয় তাকে তা বলে আখ্যায়িত করা দ্বারা কোনও ব্যক্তির সম্মান বাড়ানো যায় না বরং কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ অতিশয়োক্তি শুধু অন্যায়, অসংগত এবং অপমানজনকই নয়— ধৃষ্টতারও পরিচায়ক।

আমি মনে করি যে, মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব এবং আল্লাহর প্রতিনিধি বলে ইসলাম মানুষের প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মানকে যথার্থ ও নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছে এবং অন্য কোনও কথায় এত সুন্দর ও সঠিকভাবে মানুষের আসল মর্যাদা ও পরিচয়কে তুলে ধরা সম্ভবই হতো না। স্থিরপ্রাজ্ঞ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই অন্তত এক্ষেত্রে আমার সাথে ঐকমত্যে উপনীত না হয়ে পারবেন না বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

বিভ্রান্তি, মিথ্যাচার এবং স্বার্থের কলুষ আবহমানকাল ধরে মানুষে-মানুষে ভেদ-বৈষম্যের যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছিল তার চিরঅবসান ঘটাতে ইসলাম সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যে-কথা ঘোষণা করেছে তার সারমর্ম হলো :

এক জোড়া মানুষ থেকে বিশ্বের সকল মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সকল মানুষের সৃষ্টির মূলেও রয়েছে একই উপাদান এবং মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যও মাত্র একটিই। সুতরাং জন্মগতভাবে বিশ্বের সকল মানুষ সমান এবং পরস্পর ভ্রাতৃসদৃশ। —আল-কুরআন।

এক মানুষের ওপর অন্য মানুষের এবং এক সম্প্রদায়ের ওপর অন্য সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব-প্রাধান্য চুরমার করে দিয়ে ইসলাম দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন :

অনারবদের ওপর আরবদের অথবা আরবদের ওপর অনারবদের কোনও প্রাধান্য নেই। কেননা সকল মানুষ একই পিতা অর্থাৎ আদম (আ) থেকে সৃষ্টি এবং আদম (আ) সৃষ্টি মাটি থেকে। — আল-হাদীস

* আবহমানকাল ধরে রক্ত, বর্ণ, বংশ, গোত্র প্রভৃতিকে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক বলে প্রচার করে মানুষ অন্য মানুষের এবং একদল অন্য দলের ওপর প্রভুত্ব ও শোষণ-নির্যাতন চালিয়ে আসছিল। শ্রেষ্ঠত্বের এ মিথ্যা দাবি নস্যাৎ করে দিয়ে ইসলাম কঠোর ভাষায় ঘোষণা করেছে— রক্ত, বর্ণ, বংশ, গোত্র প্রভৃতির দাবিতে কেউ শ্রেষ্ঠ হতে পারে না, আল্লাহর কাছে এর কোনওটাই শ্রেষ্ঠত্বর পরিচায়ক নয়। আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ ও সম্মানের যোগ্য "যে আল্লাহকে বেশি ভয় করে এবং বেশি সৎকার্যশীল"। — আল-কুরআন

আমার বক্তব্য তুলে ধরার জন্যে কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতিই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। ইসলামগ্রহণের পূর্বে আমি গভীর আনন্দ ও উৎসাহের সাথে লক্ষ্য করেছিলাম যে, রক্ত, বর্ণ, বংশ, গোত্র, ভাষা, ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতির ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও আবহমানকাল ধরে ইসলাম এক মহান আদর্শের ভিত্তিতে বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে ঐক্য, সংহতি, সমতা ও ভাতৃত্ব গড়ে তোলার পথনির্দেশ দিয়ে এসেছে।

যেহেতু উদাহরণ ছাড়া কোনও উপদেশ বা পথনির্দেশ যথাযথরূপে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়, অতএব যুগে যুগে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে যখনই কোনও সমস্যা জটিল ও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে তখনই সেসব দেশে নবী-রাসূলের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা সেই সমস্যার আদর্শভিত্তিক সমাধান কী হতে পারে তার বাস্তব উদাহরণ স্থাপন করেছেন।

পরিশেষে পৃথিবীর সকল দেশের, সকল যুগের সকল মানুষের যাবতীয় সমস্যার নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য, পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গসুন্দর সমাধান নিয়ে এলেন পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা)।

এ বিশ্ব-নিখিলে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা কি, কিভাবে মানুষ সে মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে এবং রক্ত, বর্ণ, বংশ, গোত্র প্রভৃতির মিথ্যা ও কৃত্রিম দাবিতে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন হয়ে যাওয়া মানুষদের একটা আদর্শের ভিত্তিতে কিভাবে 'একদেহ' ও 'সীসা-ঢালা প্রাচীর' সদৃশ করে গড়ে তোলা যায়, বিশ্ববাসীর কাছে তার বাস্তব উদাহরণ তিনি সার্থকভাবে তুলে ধরে ছিলেন।

শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে যিনিই আরবের তদানীন্তন ইতিহাস এবং বিশ্বনবী (সা)-এর কর্ম-তৎপরতার সম্পর্কে কিছু পড়াশোনা করেছেন তিনিই মুগ্ধ-বিমোহিত হয়েছেন। আমিও মুগ্ধ-বিমোহিত না হয়ে পারিনি এবং পারিনি বলেই আমাকে ইসলামগ্রহণ করতে হয়েছে।

এখানে প্রসঙ্গের ইতি টানতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু তা করা হলে আমার আসল বক্তব্যই না-বলা থেকে যাবে। তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ন্যায় ও কর্তব্যের তাড়নায়, সর্বোপরি বুকের জ্বালা নিবারণের জন্যে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, পরবর্তী সময়ে অজ্ঞতা, স্বার্থের কোন্দল, ভুল বোঝাবুঝি, ধর্মীয় গোড়ামি, কুপমণ্ডুকতা এবং অতি তুচ্ছ ও অতি নগণ্য বিষয় নিয়ে মতভেদ ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির ফলে মুসলমানেরা আজ সহস্রধাবিভক্ত, বিচ্ছিন্ন এবং ঘোরতর শত্রু ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। "বিশ্বের সকল মুসলমান একটি দেহ সদৃশ" এটা আজ বক্তৃতা ও মজলিস গরম করার বিষয়ে পরিণত হয়েছে; বাস্তবে কোথাও তার সামান্যতম পরিচয়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিশ্বনবী (সা) তাঁর পবিত্র জীবনের অক্লান্ত সাধনায় মুসলমানদের দিয়ে 'সীসা-গলানো প্রাচীর সদৃশ' নিচ্ছিদ্র, দুর্ভেদ্য ও মহাশক্তিশালী যে জামায়াত গড়ে গিয়েছিলেন মুসলমানেরা আজ তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে।

অবশ্য মুসলমানদের এই অবস্থার জন্যে তাদের দুঃখজনক পরাধীনতা এবং দেশী-বিদেশী শত্রুদের শঠতা-ষড়যন্ত্রও যে বহুলাংশে দায়ী ইতিহাসের পাঠকমাত্রেরই সেকথা জানা রয়েছে।

কিন্তু তাই বলে চিরদিনই তারা শঠতা-ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়ে থাকবে আর এত মার খেয়েও তাদের সম্বিৎ ফিরে আসবে না, সেটাইবা কিকরে সমর্থনযোগ্য হতে পারে?

মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাধারণ মানুষেরা ইতিহাস পড়ে না। ধর্মশাস্ত্র নিয়েও ঘাটাঘাটি করে না। চোখে যা দেখে তাই সত্য বলে গ্রহণ করে। তাই মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান হানাফী-মুহাম্মদী ভেদাভেদ, শিয়া-সুন্নীর ঝগড়া, ওহাবী-অওহাবী সংঘর্ষ, খারেজী-মুতাজিলাসংগ্রাম প্রভৃতি কাণ্ডকারখানা স্বচক্ষে দর্শন করে অন্য ধর্মের মানুষ বিশেষ করে হিন্দুসমাজ বিশ্বাস করে যে, তাঁদের মতো মুসলমানদের মধ্যেও জাতিভেদপ্রথা এবং তার বিষময়তাও বিদ্যমান রয়েছে।

অনুরূপভাবে তরীকা-পন্থী অসংখ্য পীরের অসংখ্য দল এবং ভক্ত-অনুরক্তগণ কর্তৃক পীর-মাজার পূজার কাণ্ডকারখানা দেখে এটা বুঝতে তাদের মোটেও বিলম্ব হয় না মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান গুরুগিরির ব্যবসাটা তুলনামূলকভাবে হিন্দুদের চেয়ে সমধিক উৎকট এবং সমধিক জমজমাট।

এ নিয়ে আর কথা না বাড়িয়ে একটি মাত্র তিক্ত ঘটনার উল্লেখ করে প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাই। ঘটনাটি হলো : একদিন কার্যোপলক্ষে গাইবান্ধার জনৈক প্রখ্যাত হিন্দু উকিলের বাসায় আমাকে যেতে হয়েছিল। মক্কেলের ভীড়। তাই

ঘরের এক কোণায় চুপচাপ বসেছিলাম। দু-তিনজন বাদে বাকি মক্কেলেরা সবাই ছিল মুসলমান।

একটি মামলার আর্জি লেখা হচ্ছিল। মামলাকারী একজন হানাফী মুসলমান। জনৈক মুহাম্মদী (তার ভাষায় রফাদানী।) মুসলমানের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ : স্থানীয় কোনও এক হাটের মসজিদে নামাযের সময়ে মুসল্লীরা ওজু করছিল। সবাই আগন্তুক অধিকাংশই অপরিচিত। ওজুকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হানাফী, মুহাম্মদী, উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ছিল।

ওজুর এক পর্যায়ে আসামী বাদীর খুঁৎ ধরে এবং ওজর মছলা নিয়ে তর্ক শুরু করে। তর্ক-বিতর্কের এক পর্যায়ে আসামী হঠাৎ উত্তেজিত হয় এবং নিজের হস্তস্থিত বনদাটি সজোরে বাদীর দিকে নিক্ষেপ করে। ফলে বদনা নাকে লেগে বাদী জখম হয় এবং রক্তপাত ঘটে। সাথে সাথে হানাফী-মুহাম্মদী ভেদে মুসল্লীরা দু-ভাগ হয়ে পড়ে এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে কিল-ঘুষি চালাতে শুরু করে দেয়। হাটের ইজারাদার এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপের ফলে তখনকার মতো অবস্থা আয়ত্তে আসে। এখন দেখা দিয়েছে শ্রেণীগত মান-সম্মানের প্রশ্ন। একপক্ষ অন্যপক্ষকে জব্দ করার জন্যে বদ্ধপরিকর। ব্যক্তির প্রশ্ন এখানে গৌণ, মাজহাবের ইজ্জত রক্ষাই মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

উকিল বাবু বেশ রসিক মানুষ। তাই তিনি এই মাজহাবী ঝগড়ার কথা শুনছিলেন এবং রসিয়ে রসিয়ে প্রশ্ন করছিলেন।

হঠাৎ তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন কেমন আছেন মাওলানা সাব? হিন্দুদের জাতিভেদ নাকি আপনার দেহে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল; এখন মুসলমানদের জাতিভেদ আর মারামারি দেখে আপনার কেমন লাগছে?

আমি : আমি এ নিয়ে আপনার কাছে আসিনি। আপনার প্রতিবেশী উকিল সিরাজউদ্দিন সাহেব একটি বিশেষ পরামর্শের জন্যে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

উকিল বাবু : সেকথা আমি জানি। সিরাজের সাথে আমার কথা হয়েছে। মক্কেলের ভীড়ের মধ্যে সেকথা হবে না। অপেক্ষা করতে হবে। আর অপেক্ষা যখন করতেই হবে, তখন একটু ধর্মালোচনা করতে দোষ কি? মুসলমানদের মধ্যেও যে জাতিভেদ প্রথা বিদ্যমান সেটা কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন?

আমি : এ নিয়ে আমার স্বীকার-অস্বীকারের মূল্য কতটুকু? আপনি নিজে ইসলাম সম্পর্কে জানুন এবং মুসলমানদের ইতিহাস পড়ুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন ইসলাম জাতিভেদ প্রথা কিভাবে রদ করেছে। আর সাথে সাথে এ কথাও বুঝতে পারবেন যে, আমি এবং আমার মতো হাজার হাজার মানুষ কেন ইসলামগ্রহণ করছে।

উকিল বাবু : ওসব পড়া এবং জানার সময় কই? আর তার প্রয়োজনইবা কি? চোখের সম্মুখেই তো সব দেখতে পাচ্ছি। আপনি কি বলতে পারেন, এই যে হানাফী-মুহাম্মদী, শিয়া-সুন্নী, মালেকী-হাম্বলীর বিভেদ আর ঝগড়া এটা জাতিভেদ প্রথা নয়? ওরা কি কখনও এক হতে পারবে? না এক হওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব?

আমি : আমি নিশ্চিতরূপেই বলতে পারি যে, এটা জাতিভেদ নয় এবং এই বিভেদ ইসলামসমর্থিতও নয়।

উকিল বাবু : আশ্চর্য! দেখুন মাওলানা সাহেব! আর যাই করুন, "শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে" আপনি পারবেন না, আমাদেরও চোখ রয়েছে।

আমি : চোখ থাকলেও দেখাটা ঠিক হচ্ছে না। মুসলমানদের এই বিভেদকে কোনওক্রমেই জাতিভেদ বলা যেতে পারে না; বড়জোর সাম্প্রদায়িক বিভেদ বলা যেতে পারে।

উকিল বাবু : ওটা আপনার মনগড়া কথা। নাম যাই দেয়া হোক আসলে এটা জাতিভেদ ছাড়া আর কিছুই নয়। জিজ্ঞাসা করি আপনার শাক দিয়ে মাছ ঢাকার এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টা কেন?

দুঃখের বিষয় উপস্থিত মক্কেলবৃন্দও বাবুকে সমর্থন করে বলে উঠলো "মাওলানা সাহেব, আপনি চুপ করুন, বাবুতো ঠিকই বলছেন। জন্মের পর থেকেই হানাফী আর রফাদানীর বিরোধ দেখে আসছি। কোনও দিনই এদের মিল হবে না— হতে পারে না।" এ সময়ে বাবুও সায় দিয়ে বলে উঠলেন— বোঝাও, তোমাদের মাওলানা সাবকে একটু ভাল করে বোঝাও যে, কোনও দিনই ওদের মিল হবে না। আর মাওলানা সাহেবও যেন গোঁজামিল দিয়ে আমাদের ইসলাম বোঝাতে না আসেন।"

ঘটনাটা ইংরেজ আমলের। বাবুদের তখন প্রবল প্রতাপ। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির মিথ্যা অজুহাতে আমাকে নাজেহাল করতে তাদের বিবেকে মোটেই বাধবে না। তাই মাথা হেঁট করে চলে এসেছিলাম। আর সেইদিন বুকে যে ব্যথা পেয়েছিলাম আজও তার জের কাটিয়ে উঠতে পারিনি। হয়তো সারা জীবনেও পারবো না।

একটি অবিস্মরণীয় সাক্ষাতকার

মুসলমানদের মধ্যে এই সব ভেদাভেদ, প্রথা-পদ্ধতির নামে ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া, হিন্দুদের পূজা-পার্বণে অংশগ্রহণ প্রভৃতি আমাকে ভীষণভাবে বেদনাতুর করে তুলেছিল। মনের এই বেদনা নিয়ে একদিন প্রখ্যাত মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সাহেবের সাথে দেখা করি।

তিনি ধৈর্যসহকারে আমার কথা শোনেন এবং অশ্রু-সজল চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থাকেন। অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর তাঁর সাথে আমার যে কথোপকথন হয়েছিল, পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে তার অংশ বিশেষ এখানে তুলে ধরছি :

মাওলানা : আপনার বোধহয় মনে আছে, ইসলামগ্রহণের পূর্বে আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, ইসলামগ্রহণ খুবই কঠিন কাজ। অতএব ভাল করে ভেবে দেখুন।

আমি : জ্বি হুবহু মন রয়েছে।

মাওলানা : যেসব কারণের জন্যে ইসলামগ্রহণ আমি কঠিন কাজ বলেছিলাম, তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা। এই অবস্থা আপনাকে যে প্রচণ্ড আঘাত দেবে সেটা আমি অনুমান করতে পেরেছিলাম। কাগজের ইসলাম আর আমাদের ইসলামের মধ্যে এই যে বিরাট ফাঁক, এ জন্যে আমাদের অর্থাৎ আমরা যারা ইসলাম নিয়ে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করি তাদের বুকের বেদনাও মোটেই কম নয়।

আমি : এখন প্রশ্ন হলো এই বেদনা লাঘবের কি উপায় আপনারা করছেন?

মাওলানা : ইসলাম সম্পর্কে যাদের সামান্য অভিজ্ঞতাও রয়েছে, তাঁরা জানেন যে, রাষ্ট্রব্যবস্থায় কুরআনের আইন চালু না হওয়া পর্যন্ত কারো পক্ষেই সত্যিকারের ইসলামী জীবন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় মুসলমানেরা দীর্ঘদিন যাবত পরাধীন জীবনযাপন করছে; দেশে চালু রয়েছে ইংরেজের আইন। আপনি বোধহয় জানেন যে, একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করা বা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কেউ সত্যিকারের মুসলমান বলে পরিগণিত হতে পারে না।

অথচ পরাধীন দেশে রাজার আনুগত্য করতে হয় এবং রাজার আইন মেনে চলতে হয়। এর সামান্যতম ব্যতিক্রমও রাষ্ট্রদ্রোহিতা, আর রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তি হলো প্রাণদণ্ড। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রীয় বিধান এবং আল্লাহর বিধান, এ দু'টো এক সাথে মেনে চলা কোনওক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। এককথায় আমরা এখন ইংরেজের গোলাম— আল্লাহর গোলাম নই। সরকারের কাছে কোনও আবেদন-নিবেদন করতে গেলে আমাদের যে "Your most obedient servant" লিখতে হয়, তা থেকেই আমরা কার গোলামি করছি সেটা সুস্পষ্টরূপেই বুঝতে পারা যায়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এছাড়া আর কোনও উপায় নেই দেখে আলেম-সমাজ কোনওরূপে ইসলাম টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যদি এ চেষ্টাটুকুও তাঁরা

না করতেন তবে এতদিনে ইংরেজ এবং তাদের তলপী-বাহকেরা এদেশ থেকে ইসলামের নাম-নিশানাটুকুও নিঃশেষে মিটিয়ে দিতো।

আমি : বর্তমান পরিস্থিতিতে সত্যিকারের মুসলমান হওয়া যদি সম্ভবই না হয় তবে আমার ইসলামগ্রহণ তো একটা ব্যর্থ প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

মাওলানা : সাধ্যানুযায়ী যতটুকু পারেন ইসলামী জীবনযাপন করে যান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী আইন যাতে চালু হয় অত্যন্ত গোপনে হলেও তার জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। মনে রাখবেন, নফল নামায পড়ে এবং দোআ করে আর যা-ই-হোক ইসলামী আইন চালু করা যায় না। এ জন্যে যে চরম মূল্য দিতে হয় বিশ্বনবী (সা) তার জ্বলন্ত প্রমাণ রেখে গিয়েছেন।

আমি : ইসলামী আইন চালু করার প্রচেষ্টা কিভাবে গ্রহণ করবো সে সম্পর্কে কিছু উপদেশ আমাকে দিন।

মাওলানা : মুসলিমলীগ পাকিস্তানের আন্দোলন শুরু করেছে। আজ হোক আর কাল হোক, ইংরেজকে এ দেশ ছাড়তেই হবে; হিন্দু কংগ্রেস গোটা ভারতবর্ষ গ্রাস করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। যদি কংগ্রেস তা করতে পারে তবে এ দেশের সংখ্যালঘু মুসলমানেরা আর কোনওদিনই মুক্তি পাবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে হিন্দুরা চিরকাল ধরে মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব করে যাবে।

ইংরেজদের শাসন থেকে ওদের শাসন হবে নিকৃষ্টতর। মুসলমানেরা যদি এ সময়ে দুর্বার আন্দোলন সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদের জন্যে পৃথক একটা আবাসভূমি করে নিতে এবং সেখানে ইসলামী আইন চালু করতে না পারে, তবে সেই নিকৃষ্টতর শাসনের নির্মম শিকার তাদের হতে হবে। কাজেই এই আন্দোলনে শরীক হতে চেষ্টা করুন— এই আমার উপদেশ।

বলাবাহুল্য, মাওলানা সাহেবের কথায় আমার মনটা এক অনির্বচনীয় আশা ও আনন্দে ভরে উঠেছিল। সুযোগ বুঝে একদিন শ্রদ্ধেয় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে দেখা করি। বেশ কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা হয়। মুসলিম-প্রধান অঞ্চলসমূহ নিয়ে পাকিস্তান তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথা তিনি বুঝিয়ে বলেন। ইসলামী বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের আদর্শ হতে পারে এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলা যে খুবই সম্ভব, বেশ দৃঢ়তার সাথে সোহরাওয়ার্দী সাহেব সে কথাও সেদিন আমাকে বলেছিলেন।

ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে উঠবে, ফলে মুসলমানদের পক্ষে সত্যিকারের মুসলমান হয়ে গড়ে ওঠা সম্ভব হবে, হিন্দুদের কাছে আমাকে আর লজ্জিত-অপমানিত হতে হবে না, বরং আমিই তাদের কাছে মাথা তুলে বলতে পারবো— "সত্যিকারের

মুসলমান কাকে বলে চেয়ে দেখ, বল, ইসলামগ্রহণ করে আমি ভাল কাজ করেছি কি না।"

আমার বিক্ষুব্ধ-বেদনাহত দেহ-মনের পরতে পরতে এই কথাগুলো এমনই এক আশা ও আনন্দের হিল্লোল সৃষ্টি করেছিল যে "পাকিস্তান তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে আমি আমার নগণ্য শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাবো" আকুল আগ্রহের সাথে জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে এই ওয়াদা করে সেদিন আমি বিদায় নিয়েছিলাম।

আজ লিখতে বসে অবাক হতে হয় যে, এই আশার ছলনা একদিন আমাকে আমার স্নেহশীল জননীর কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কলকাতায় আমার জনৈক ভগ্নিপতির বাড়িতে তাঁকে একান্তে ডেকে এনে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম এবং বলেছিলাম, "মা! তুমি আশীর্বাদ কর, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে সেদিন তোমরা ইসলাম ও মুসলমানের সত্যিকারের চেহারা দেখতে পাবে এবং বুঝতে পারবে যে, ইসলাম কত সুন্দর, কত মহান। আর আমি ভুল করে ইসলামগ্রহণ করিনি সেকথাও সেদিন তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।"

আমার স্নেহশীলা জননী এই বলে সেদিন আমার কথার উত্তর দিয়েছিলেন, "দেখ বাবা! তুই মুসলমান হওয়ার কারণে বুকটা আমার ভেঙ্গে গিয়েছে। বুকে পাথরচাপা দিয়ে কোনওমতে বেঁচে আছি। কিন্তু তোর মুসলমান হওয়ার কারণে সমাজের পক্ষ থেকে আমাদের বিশেষ করে আমার ওপর যে লাঞ্ছনা, অপমান ও ঠাট্টা বিদ্রূপের শেল নিক্ষিপ্ত হয়ে চলেছে বহু চেষ্টা করেও তা আমি সহ্য করতে পারছি না।"

এইটুকু বলেই হঠাৎ আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন এবং আমার কানের কাছে মুখ রেখে অনুচ্চ স্বরে বলেছিলেন, "তোকে আর বলবো কি বাবা! বাড়ির কাছে কোনও মুসলমান ছিল না, কামলা এবং মুসলমান প্রজারা কেউ যদি কোনওদিন বাড়িতে এসেছে, বাইরে থেকেই বিদায় নিয়েছে। বাড়ির ভেতরে প্রবেশের অধিকারই কারো ছিল না, কেবলমাত্র তোর মামাবাড়ি যাওয়ার সময় বছরে একবার মুসলমান মাঝির নৌকায় চড়ে গিয়েছি, তখন তোর বাবা বা অন্য কেউ সঙ্গে থেকেছেন। এছাড়া কোনওদিন কোনও মুসলমানের চেহারাও চোখে দেখিনি। অথচ আজ একথাও আমার কানে পড়ছে যে, তুই নাকি মুসলমানের ছেলে। অর্থাৎ মুসলমানের ঔরসে জন্ম হয়েছে বলেই তুই নাকি মুসলমান হয়েছিস।

বলতো, কোনও সতী নারীর পক্ষে এর চেয়ে জঘন্য কথা আর কী হতে পারে?"

আমাকে বাহুবন্ধন থেকে ছেড়ে দিয়ে বসে পড়েছিলেন এবং লজ্জা ও দুঃখে কিছুক্ষণ তিনি কোনও কথাই বলতে পারছিলেন না। অঝোরে শুধু কেঁদেই চলেছিলেন।

উল্লেখ্য, আমার স্নেহশীলা মাতার দেহের বর্ণ ছিল দুধে আলতা মেশানো রং-এর মতো। গুরুজনেরা ডাকতেন 'রাঙ্গাবউ' বলে। আর ছোটরা কেউ রাঙ্গাদি, কেউ রাঙ্গাপিসি প্রভৃতি বলে ডাকতো। সেই রাঙ্গা-মা আমার যখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন তখন তার মুখমণ্ডল লাল টুকটুকে হয়ে উঠেছিল। আর তাঁর সেই রাঙ্গা চেহারা দেখে দুঃখ-বেদনায় আমার মনটা নিকষ-কালো আঁধারে ছেয়ে গিয়েছিল।

আশ্চর্যের বিষয় এহেন মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যেও পাকিস্তানরূপী ইসলামী রাষ্ট্রের কল্পিত ছবি আমার মনের মাঝে ঝিলিক দিয়ে উঠছিল।

তাই আমার রোরুদ্যমান জননীর পায়ে হাত রেখে আমি এই বলে সেদিন বিদায় নিয়েছিলাম যে, মা! তুমি আশীর্বাদ কর, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হোক, তা হলেই সকলের ভুল ভেঙ্গে যাবে, তোমাকে বা অন্য কাউকে আর আমার ইসলামগ্রহণের জন্যে লাঞ্ছনা অপমান ভোগ করতে হবে না।

পথে যেতে যেতে এই প্রার্থনা করছিলাম, হে দয়াময় প্রভু! তুমি ইসলামী রাষ্ট্র দাও এবং তার মাধ্যমে আমাদের সত্যিকারের মুসলমানরূপে গড়ে তোল। আমার স্বজন-পরিজন বিশেষ করে আমার স্নেহশীলা জননীকে লজ্জা ও অপমানের হাত থেকে রক্ষা করতে এছাড়া আর অন্য কোনও পথ দৃষ্টি-গোচর হচ্ছে না। অন্তত আমার স্নেহশীলা জননীর মুখের দিকে চেয়ে তুমি আমার এই প্রার্থনা কবুল কর।

চাকুরিজীবন

'বিশ্বনবী (সা)-এর বিশ্ব-সংস্কার' নামীয় আমার লিখিত ও প্রকাশিত প্রথম বইখানা প্রায় নিঃশেষিত হয়ে আসছিল। অতএব অর্থাভাবের আশংকা করছিলাম। কেননা, উক্ত বই বিক্রয়ের অর্থ দিয়েই কোনওরূপে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের কাজ চালিয়ে আসছিলাম।

প্রতিটি সভায় যথেষ্ট সংখ্যক বই বিক্রয় হতো। একদিকে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা-প্রদানের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা; অন্যদিকে বই নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া— এই উভয়টিই ছিল আমার কাছে গভীর বেদনাদায়ক।

অবশ্য তখনো সরকারি নিষেধাজ্ঞা-জারি হয়নি। সভা-সমিতির অনুষ্ঠান এবং বক্তৃতা প্রদান করা যেতে পারে এমন বহু স্থানই ছিল। কিন্তু যেকোনও সময় নিষেধাজ্ঞাজারি হতে পারে এমন আশংকা পুরাপুরিই বিদ্যমান ছিল।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সভা-সমিতির সংগঠকদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত বক্তা বা আলেমকে 'রাহাখরচ', 'নজরানা', 'হাদিয়া', 'পারিশ্রমিক' প্রভৃতি কোনও না কোনও নামে অর্থ প্রদান করার রেওয়াজ অন্তত এতদ্দোশ্যে প্রচলিত রয়েছে। অধিকাংশ বক্তা এবং আলেমই এই অর্থ গ্রহণ করে থাকেন।

অনেকে অনন্যোপায় হয়ে এ অর্থ নিতে বাধ্য হন। কেউ কেউ এটাকে পেশা হিসেবেও গ্রহণ করেছেন। যিনি যেভাবেই এটা গ্রহণ করুন, তাঁদের সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না।

তবে আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি যে, এভাবে অর্থ গ্রহণ করা হলে বক্তৃতা বা ওয়াজের গুরুত্ব এবং কার্যকারিতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। সমাজে এমন মানুষ যথেষ্টই রয়েছেন যারা প্রকাশ্যেই কঠোর ভাষায় এসব বক্তা, আলেম এবং পীরদের সমালোচনা করে থাকেন।

সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁরা এমন কথাও বলেন যে, "আলেমরা ওয়াজের ব্যবসা খুলে বসেছেন, আসলে ইসলামপ্রচার এদের উদ্দেশ্য নয়— উদ্দেশ্য হলো পেটপূজা"।

সাধারণত স্থানীয়ভাবে চাঁদা সংগ্রহ করে এসব অনুষ্ঠানের ব্যয়নির্বাহ করা হয়ে থাকে। সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট থেকেই চাঁদার বড় অংশটা পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় ওদের সকলের উপার্জন হালাল নয়।

ওদের উপার্জন যে হালাল নয় ওয়াজ বা বক্তৃতার মধ্যে সেকথা বলা হলে ওরা ভীষণভাবে রুষ্ট হবেন এবং চাঁদা দেয়া থেকে বিরত থাকবেন। অতএব এই শ্রেণীর আলেম এবং বক্তাদের নিজেদের স্বার্থেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওদের উপার্জন যে হালাল নয় সেকথা বলা থেকে বিরত থাকতে অথবা পাশ কাটিয়ে যেতে হয়।

অন্যদিকে যেহেতু উক্তরূপ বক্তা ও আলেমগণ একদিকে ওদের অর্থ গ্রহণ করেন, আবার অন্যদিকে ওদের উপার্জন সম্পর্কেও চুপ থাকেন। অতএব ওদের উপার্জন যে হারাম বা অবৈধ নয়, এমন একটা ধারণাও উক্ত উপার্জনকারীদের মনে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বক্তা এবং আলেমগণ কর্তৃক এভাবে অর্থ গ্রহণের পক্ষে এবং বিপক্ষে বহু যুক্তিই রয়েছে। এনিয়ে কথা বাড়াতে চাই না। তবে এভাবে অর্থ গ্রহণ করা হলে বক্তৃতা এবং ওয়াজের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা যে বহুলাংশে হ্রাস পায় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর এমন একটা ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে।

সুতরাং সার্থকভাবে ইসলামপ্রচার করতে হলে জীবিকার জন্যে আমাকে যে একটা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে হবে সেকথা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। অন্য একটি সমস্যাও আমাকে একাজে উৎসাহিত করেছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইতোমধ্যেই প্রায় ষাটজন অমুসলমান আমার কাছে ইসলামগ্রহণ করেছিল। আমি লক্ষ্য করে আসছিলাম যে, এইভাবে ইসলামপ্রচার করে প্রকৃতপক্ষে আমি এক গুরুতর সমস্যারই সৃষ্টি করে চলেছি।

কেননা, স্বজন-হারা, নিঃসম্বল ও নিরাশ্রয় এ নওমুসলিমদের একান্ত বাধ্য হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। পরের আশ্রয়গ্রহণ ও পরের গলগ্রহ হওয়া ছাড়া তাদের কোনও গত্যন্তর থাকে না। ইসলামগ্রহণের পর ইসলামের সাথে পরিচিত হওয়ারও কোনও সুযোগ তারা পায় না।

এসব কথা চিন্তা করে তাদের জন্যে সাময়িক আশ্রয়, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্যে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সংকল্প আমি গ্রহণ করি। নিজে মোটামুটিভাবে সচ্ছল ও স্বাবলম্বী না হয়ে কোনও ব্যক্তির পক্ষে তেমন কোনও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যে সম্ভব নয়, সেকথাও আমি বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলাম।

আমাদের দেশে এ ধরনের বহু সংগঠনের গোড়াপত্তন হতে দেখা যায়। আবার কিছুদিন পর ওগুলোর অনেকটারই অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। কেন পাওয়া যায় না তার কিছুটা আভাস আমার এই কথার মধ্যে রয়েছে।

'নওমুসলিম তবলিগ জামায়াত'-এর প্রতিষ্ঠা এবং শোচনীয় পরিণাম থেকে এর বাস্তব শিক্ষাও আমি পেয়েছিলাম। কাজেই স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যে অতঃপর আমাকে যে সরকারি চাকুরিগ্রহণ করতে হয়েছিল যথাস্থানে সেকথা বলা হয়েছে।

পাকিস্তানের জন্ম

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট। বৃটিশ সরকার কর্তৃক পাকিস্তান সৃষ্টির ঘোষণা-বাণী প্রচারিত হলো। যদিও বেশ কিছুকাল ধরে পাকিস্তান সৃষ্টি একরূপ অবধারিত বলেই জানা গিয়েছিল, তথাপি ইংরেজ এবং অখণ্ড ভারতের দাবিদারদের ষড়যন্ত্র ও কারসাজি শেষ পর্যন্ত সবকিছু ভণ্ডুল করে দিতে পারে, এমন একটা আশঙ্কা মুসলমানদের মন-মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল।

এই ঘোষণার দ্বারা সেই আশঙ্কা দূরীভূত হলো এবং নতুন করে আর একবার প্রমাণিত হলো যে, শোচনীয়রূপে সংখ্যালঘু একটি জাতি সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং ত্যাগ ও তিতিক্ষার বলে কি করে নিজেদের ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় করে নিতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য, 'ধারণা প্রকাশক বিভাগ' (National Division) অনুযায়ী মালদহ জিলা পূর্বপাকিস্তানের ভাগে পড়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত এটা টিকবে কিনা তা নিয়ে মুসলমানদের মনে কিছুটা সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। বিত্তশালী হিন্দুগণ

কর্তৃক গোপনে গোপনে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ এবং অন্যান্য কার্যক্রম থেকে এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল।

অন্তত মালদহ জিলাকে হিন্দুস্তানের অঙ্গীভূত করার জন্যে এরা যেকোনও পন্থা অবলম্বনে বদ্ধপরিকর, এমনকি প্রয়োজন হলে যেকোনও ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বনেও এরা যে পিছপা হবে না, অনেকের কাজে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এই কারণে বৃটিশ সরকার কর্তৃক পাকিস্তান সৃষ্টির ঘোষণা মালদহের মুসলমানগণ বিশেষ ধৈর্য, সতর্কতা এবং গাম্ভীর্যের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে একটিমাত্র ঘটনার বিবরণই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

ঘোষণানুযায়ী প্রত্যুষে সকল সরকারি এবং বেসরকারি ভবনে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের কথা। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানই এই কাজ থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিলেন। তাঁদের যুক্তি এই ছিল যে, পতাকা উত্তোলনটা বড় কথা নয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত আবার যদি সেই পতাকা নামিয়ে ফেলে সেখানে হিন্দুস্তানের পতাকা উত্তোলন করতে হয় তবে সেটা মুসলমানের জন্যে শুধু গভীর মর্মবেদনার কারণই হবে না; নিদারুণভাবে অবমাননার কারণও হয়ে দাঁড়াবে।

এমনকি স্থানীয় কোর্ট বিল্ডিং-এ পতাকা উত্তোলনের সময়ও দেখা গিয়েছিল যে, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার মতো যে দু' একজন পদস্থ মুসলমান কর্মচারী ছিলেন, তারা ওকাজে রাজি হলেন না। উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারীরাও নানা অজুহাতে অনুপস্থিত থাকলেন। ফলে পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের কাজটি সমাধা করলেন অফিসের ব্রাহ্মণ হেড ক্লার্ক মহাশয়!

এ কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্থানীয় মুসলমানদের বেদনাক্লিষ্ট মন-মানস আমার মনের ওপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাছাড়া মালদহে বহু দীনদার মুসলমান রয়েছেন যাঁদের অনেকের সাথেই পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সর্বোপরি বহু প্রসিদ্ধ অলীআল্লাহর মাজার এবং মুসলমান আমলের ঐতিহ্যমণ্ডিত বহু কীর্তি এ জেলার নানাস্থানে ছড়িয়ে রয়েছে।

এমন একটি জিলা পাকিস্তানের অঙ্গ বলে ঘোষিত হওয়ার পর আবার হিন্দুস্তানের অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়ার আশংকা আমার মনকেও যে কম বেদনাক্লিষ্ট করেছিল না সেকথা অনুমেয়।

এদিক দিয়ে মন ভারাক্রান্ত থাকলেও অন্য দিকটির কথা মনে জাগতেই আমার মনের মাঝে এক অনির্বচনীয় আনন্দের হিল্লোল বয়ে যেতো। বলাবাহুল্য, সেই অন্য দিকটা হলো পাকিস্তান লাভ। অর্থাৎ বিশ্ববাসী বিশেষ করে হিন্দুসমাজের কাছে তুলে ধরার জন্যে ইসলামী আদর্শে এক অভিনব রাষ্ট্র গড়ে তোলার সুযোগ লাভ।

ইসলামী রাষ্ট্র গড়ার এই সুযোগদানের জন্য করুণাময় বিশ্বপ্রভুর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করেছিলাম। কিন্তু সেজন্যে প্রয়োজন একটি নির্জন ও নিরিবিলি স্থানের।

তাই অতি প্রত্যুষে নদী পাড়ে গিয়েছিলাম। ফিরে আসার পথে কোর্ট সংলগ্ন খেলার মাঠটির প্রায় মাঝামাঝি স্থানে জনৈক হিন্দুর সাথে মুখোমুখি হতে হলো।

লোকটি আমার মাথার টুপির দিকে লক্ষ্য করে এমন জঘন্য একটি উক্তি করলো যে, আমি দুঃখ এবং বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লাম।

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরও একজন হিন্দুর কাছে এমন জঘন্য উক্তি শুনতে হবে সেকথা ভাবতেও মনটা বেদনায় টনটন করে উঠলো। তার সেই উক্তিটি শুধু জঘন্যই ছিল না, প্রতিশোধগ্রহণের একটা হুমকিও তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। বহু চেষ্টা করেও সেই জঘন্য উক্তিটি শালীনতার খাতিরে আমি এখানে তুলে ধরতে পারলাম না।

খুব সম্ভবত সুপরিকল্পিতভাবেই লোকটি এ কাজ করেছিল। হয়তো সে ভেবেছিল যে, তার এই জঘন্য ও ভীষণ অবমাননাকর উক্তিটি শুনে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠবো এবং কঠোরভাবে প্রতিবাদ করে বসবো। আমার এই উত্তেজনা এবং প্রতিবাদের সূত্র ধরে সে আমাকে আক্রমণ করে বসবে এবং এমনভাবেই একটা হৈ-হল্লা শুরু করে দেবে যাতে শহরের গোটা হিন্দুসমাজ উত্তেজিত হয়ে একটি লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেয়। আর এতদ্বারা পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই মুসলমানেরা যে হিন্দুদের ওপর জঘন্য ধরনের অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করে দিয়েছে তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ তারা দাঁড় করাতে পারবে।

কিন্তু সে জঘন্য এবং অবমাননাকর উক্তি শুনেও আমি যখন কোনও প্রতিবাদ বা উত্তেজনা প্রকাশ না করে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম, আর অন্যদিকে তিন চার জন পথচারী মুসলমানকেও এদিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল তখন উক্ত হিন্দুটি অগত্যা রণেভঙ্গ দিয়ে কঠোরভাবে আমার দিকে তাকালো এবং পাশকাটিয়ে চলে গেল!

ভগ্ন, বেদনার্ত এবং অপমানহত মন নিয়ে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চললাম। বারে বারে সেই জঘন্য উক্তিটি মনে পড়তে লাগলো। পূর্বেই বলেছি, প্রতিশোধগ্রহণের একটি হুমকীও ঐ উক্তিটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। চলতে চলতে এই প্রশ্নটাই আমার মনে জেগে উঠছিল যে, এই হুমকি দেয়ার মতো উৎসাহ এবং সাহস লোকটি পেল কোথা থেকে?

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং সুপরিকল্পিতভাবে লোকটি একাজ করেছিল বলে আমার এই ধারণা যে মিথ্যা ছিল না, পরবর্তী সময়ের কতিপয় ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

উল্লেখ্য, র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ (Radcliffe award) ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে জানতে পারা গিয়েছিল যে, মালদহ জিলার পনেরটি থানার মধ্যে মালদহ টাউনসহ দশটি থানাই হিন্দুস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই অন্তর্ভুক্তির খবর আগে থেকেই হিন্দুদের জানা ছিল। হয়তো এ কারণেই তাঁরা নিজেদের নিরাপত্তার নামে বেশ কিছুসংখ্যক সশস্ত্র ভাড়াটে গুণ্ডা গোপনে গোপনে আমদানি করে রেখেছিলেন।

রোয়েদাদ ঘোষিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই কোর্ট বিল্ডিং ও অন্যান্য স্থান থেকে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে সেসব স্থানে অশোকচক্র-খচিত হিন্দুস্তানী পতাকা উত্তোলনের আয়োজন করা হয়।

জনৈক ব্রাহ্মণ এস. ডি. ও. কোর্ট বিল্ডিং-এর ওপরে উঠে পাকিস্তানের পতাকাটি নামিয়ে ছাদের ওপরে রাখেন এবং হিন্দুস্তানের পতাকাটি যথাস্থানে স্থাপন করেন। সত্য-মিথ্যা জানিনা, অবস্থাদৃষ্টে কতিপয় মুসলমানের মনে হয়েছিল যে, উক্ত এস. ডি. ও. মহাশয় পাকিস্তানী পতাকাটির অবমাননা করেছেন, ফলে তারা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে থাকেন। এটাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে আমদানিকৃত গুণ্ডাবাহিনী তাদের অভিযান শুরু করে দেয়।

স্থানে স্থানে অগ্নিসংযোগ, মারপিট প্রভৃতি দ্বারা মুসলমানদের মনে ত্রাস ও আতংক সৃষ্টির প্রয়াস চলতে থাকে। এমনিতেই স্থানীয় মুসলমানগণ মনমরা অবস্থায় কালাতিপাত করছিলেন। তার ওপর এই গুণ্ডামি তাদের একেবারে দিশেহারা করে তুলেছিল।

আমি যে আবাসিক হোটেলটিতে অবস্থান করতাম তার পাশেই ছিল জনৈক রায়বাহাদুর বাবুর দ্বিতল অট্টালিকা। অবস্থা আঁচ করতে পেরে ভীষণভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। নওমুসলিম হিসেবে যেকোনও মুহূর্তে আমি তাদের প্রতিশোধের করুণ শিকারে পরিণত হতে পারি। কাজেই ভেবেচিন্তে শেষপর্যন্ত পাশের বাড়ির রায়বাহাদুর বাবুর সাথে দেখা করতে গেলাম। কালেক্টরেটের নূর মুহাম্মদ নামীয় জনৈক কেরানিও আমার সাথে ছিলেন।

রায়বাহাদুর বাবুর সাথে আমি পরিচিত ছিলাম না। তাঁর বাড়িতে গেলাম। তিনি বৈঠকখানায় একখানা আরামকেদারায় অর্ধশায়িত অবস্থায় খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

আমি আমার পরিচয় দিলাম এবং আমার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখার অনুরোধ জানালাম। আমার কথা শুনে চোখে-মুখে বেশ কিছুটা গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলে তিনি বললেন, "দেখুন পি. আর. ও. সাহেব! ছেলেপেলেদের রক্ত হলো গরম। ওদের ব্যাপারে আমি কিছু করতে পারি না।"

এ কথার উত্তরে আমি বলেছিলাম : কি পারবেন আর কি পারবেন না সেকথা আমি জানি না। আপনি রায়বাহাদুর মানুষ, বিরাট খ্যাতি আপনার রয়েছে। শুধু এই কথাটুকু আমি আপনাকে জানাতে এসেছি। যদি সম্ভব হয় একটু লক্ষ্য রাখবেন।

রায়বাহাদুর : আপনার সাথের এই ছেলেটি কে?

আমি : কালেক্টরেটের জনৈক কেরানি।

রায়বাহাদুর : দেখুন! আপনি অফিসার মানুষ, আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনার সম্পর্কে আমি ভেবে দেখবো। কিন্তু কেরানি-ফেরানি নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই।

আমি : শুধু আমার দিকে লক্ষ্য রাখলেই চলবে।

রায়বাহাদুর : দু' এক দিনের মধ্যেই আপনি অন্যত্র অর্থাৎ মুসলমান পাড়ায় সরে যাবেন। কেননা দু-এক দিনের বেশি লক্ষ্য রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

রায়বাহাদুরকে আদাব জানিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। বুঝতে পারলাম, রায়বাহাদুরের সাহায্য চাওয়া আমার ঠিক হয়নি। কেননা, কেউ যদি আক্রমণ করতে আসে তবে সে বা তারা রায়বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করে আসবে না। সোজা এসে আক্রমণ করবে। আর আক্রমণের কথা জানতে পেরে রায়বাহাদুর যদি একান্তই দয়াপরবশ হয়ে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করেনও তাঁর এই ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বেই যা ঘটবার তা ঘটে যাবে।

এই ভুলের জন্যে মনে মনে তওবা করলাম। কেঁদে কেঁদে সেই অগতির গতি সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য চাইলাম। রাতের অন্ধকার ভেদ করে স্থানে স্থানে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছিল এবং আর্তচিৎকার কর্ণকুহরে আঘাত হানছিল। কিন্তু ভয় আমার ছিল না। যেকোনও অবস্থার জন্যে প্রস্তুত হয়ে প্রহর গুণে গুণে সেই কালরাত্রি অতিবাহিত হয়ে গেল।

বোধগম্য কারণেই দায়িত্বশীল জিলা কর্তৃপক্ষ উত্তেজনা প্রশমনে আগ্রহী ছিলেন। দু-তিন দিনের মধ্যেই প্রায় প্রতিটি মুসলমানপল্লীতে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করা হলো; তৃতীয় দিনে সুযোগ বুঝে নিকটস্থ এক মুসলমানপল্লীতে গিয়ে উঠলাম।

অতীব দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, অফিসে আমার হিন্দুসহকর্মীদের মধ্যে তিনজন ছিল অত্যন্ত হীনমন্য, কুচক্রী এবং ভীষণভাবে সাম্প্রদায়িক। আমাকে জব্দ করার একটা ফন্দি যে তারা আটছিল তাদের হাবভাব দেখে সেটা আমি বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলাম।

নওমুসলিম হিসেবে আমার প্রতি তাদের একটা জাত-ক্রোধ তো ছিলই, তদুপরি অন্য একটা ঘটনাও ঘটে গিয়েছিল; সে ঘটনা হলো :

মালদহে প্রচার বিভাগের একটি সিনেমা (টকি) ইউনিট ছিল। যেহেতু ন্যাশনাল ডিভিশন হিসেবে মালদহ্ পূর্ব পাকিস্তানের অংশ বলে ঘোষিত হয়েছিল, সে কারণে পাকিস্তানের মাল হিসেবে সিনেমা ইউনিট মালদহে প্রেরণ করা হয়েছিল।

কিন্তু র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে মালদহের দশটি থানা হিন্দুস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। গোটা জিলাটি হিন্দুস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলেও যেহেতু সিনেমা ইউনিটটি পাকিস্তানের মাল হিসেবে ভাগ হয়েছে। অতএব কোনও অবস্থায়ই হিন্দুস্তান তা দাবি করতে পারে না। আর যদি দাবি করেও; পাকিস্তানে পড়া পাঁচটি থানার অংশ হিসেবে হিন্দুস্তান সরকারকে এ মালের ১/৩ অংশ বা তার মূল্য পাকিস্তানকে অবশ্যই দিতে হবে। ইউনিটের মালগুলোর মূল্য ছিল অন্ত তপক্ষে দুই লাখ টাকা।

মালগুলো সীমান্ত পার করে দেয়ার একটা অজুহাত আমরা খুঁজছিলাম। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ঘোষিত হওয়ার পর যখন প্রবল উত্তেজনা এবং 'জ্বালাও-পোড়াও' শুরু হয়ে গেল, তখন এ. পি-কে জানানো হলো যে, নৌকায় সিনেমা ইউনিটের মালপত্র ছাড়াও যথেষ্ট পেট্রোল রয়েছে। গুণ্ডা-পাণ্ডারা যেকোনও মুহূর্তে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। অতএব চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হোক।

আমরা জানতাম সারা টাউনে যখন উত্তেজনা চলছে তখন নৌকা পাহারার কাজে পুলিশ লাগানো সম্ভব হবে না। তাই গোপনে নৌকাটি নওয়াবগঞ্জে পাঠিয়ে দেয়া হলো। তথাকার থানায় মালপত্র উঠিয়ে রেখে একটি তালিকা মালদহে এবং অন্যটি ঢাকায় পাঠিয়ে জানিয়ে দেয়া হলো যে, নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়ায় অগত্যা এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে ডি. পি. আর. ও. জনাব আবু সাঈদ সাহেবই মুখ্যভূমিকা পালন করেছিলেন, কিন্তু তিনি তখন ছিলেন তাদের নাগালের বাইরে, অর্থাৎ ইতোপূর্বেই রাজশাহী চলে গিয়েছিলেন।

তবে কারণ যা-ই হোক এই মাল পাচারের পরামর্শটা যে আমিই দিয়েছিলাম, এমন একটা বিশ্বাস ওদের মনে বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল।

সুতরাং, ওদের সমস্ত ক্রোধটাই তখন পড়েছিল আমার ওপর। একেতো নওমুসলিম হওয়ার অপরাধ, তার সাথে দুই লক্ষাধিক টাকার মালপত্র পাকিস্তানে পাচার করার অপরাধ মিলিত হওয়ায় ওদের মানসিক উত্তেজনা যে কোনও পর্যায়ে উঠতে পারে সেকথা সহজেই অনুমেয়।

আমার নিকট অফিসের চার্জ বুঝে নিয়ে 'লাস্ট পে সার্টিফিকেট' ইস্যু করার জন্যে ইতোপূর্বে লিখিতভাবে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু তার কোনও এ্যাকশন নেয়া হচ্ছিল না।

এটা যে বিরুদ্ধবাদীদের কারসাজিরই ফল সেকথা বুঝতে পারা যাচ্ছিল। এই ষড়যন্ত্র ও টীকা-টিপ্পনীর খপ্পর থেকে ছুটে গিয়ে পাকিস্তানের মুক্ত আবহাওয়ায় নিশ্বাস নেয়ার জন্যে মনটা অধীর হয়ে উঠেছিল।

অগত্য জিলা ম্যাজিস্ট্রেট বাবুর সাথে দেখা করলাম এবং তাড়াতাড়ি আমার আবেদনটি মঞ্জুর করার অনুরোধ জানালাম। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট বাবু ছিলেন এক নামকরা আচার্য পরিবারের সন্তান। খুব উদার ও অমায়িক বলে তাঁর খ্যাতির কথাও ইতোপূর্বে শুনেছিলাম। তাই ভেবেছিলাম ভট্টাচার্য পরিবারের সন্তান হয়েও আমি ইসলামগ্রহণ করেছি একথা জানা সত্ত্বেও তিনি আমার প্রতি সুবিচার করবেন।

দুঃখের বিষয়, আমাকে অতি নিদারুণভাবে হতাশ হতে হয়েছিল। আচার্য-বাবু গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, "আপনার বিরুদ্ধে অনেকগুলো কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট রয়েছে; তাই আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি রিলিজ করা সম্ভব হবে না। সময় পেলে আমি রিপোর্টে উল্লেখিত অভিযোগগুলো তদন্ত করে দেখবো। তার পরে রিলিজ করার প্রশ্ন উঠতে পারে।"

তাঁর কথার উত্তরে এই বলে সেদিন আমি বিদায় নিয়েছিলাম যে, আমার বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ রয়েছে এবং কে বা কারা তা করেছে সেকথা আমি জানি না। তবে আমি একথা জানি যে, ওসব মিথ্যা এবং আমাকে বিপদে ফেলা ও জব্দ করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। নিরপেক্ষ মন নিয়ে তদন্ত করলে এ মিথ্যা অবশ্যই আপনার কাছে ধরা পড়বে। অতএব আমার অনুরোধ, আপনি দয়া করে যত শীঘ্র সম্ভব এটা তদন্ত করার ব্যবস্থা করুন।

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আচার্যবাবুর অফিস থেকে বের হয়ে বাইরে এলাম। মাথায় চিন্তার পাহাড়। কোথায় যাবো, কি করবো, আমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ, কি তার পরিণাম? এমনি ধরনের নানা প্রশ্ন, মাথাটা যেন গুলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো।

ভাবলাম, সবকিছু ভাল করে ভেবে দেখা দরকার। নিরিবিলি স্থান হিসেবে মসজিদের দিকে পা বাড়ালাম। লক্ষ্য করলাম, কেরানি নূর মুহাম্মদ কিছুটা দূর থেকে এবং সতর্কতাসহকারে আমাকে অনুসরণ করছে।

মসজিদের একটি নিরিবিলি স্থান বেছে নিয়ে বাইরের দিকে লক্ষ্য করলাম। দেখলাম নূর মুহাম্মদ বসে ওজু করছে এবং বার বার পথের দিকে লক্ষ্য করছে।

ওজু শেষেও একবার ভাল করে এদিকওদিক দেখে মসজিদে এসে আমার পাশে বসলো এবং ভয় ও বেদনা জড়িত কণ্ঠে অনুচ্চস্বরে বললো, পি. আর. ও. সাহেব! আপনার বিরুদ্ধে একটু আগেই ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়েছে। একবার ধরা পড়লে জীবনেও আর ছাড়া পাবেন কিনা সন্দেহ।

অশ্রুসজল চোখে ও আমার পা-ছুঁয়ে সালাম করলো এবং বললো, আপনাকে পীরের মতো দেখেছি। বিপদের দিনে একসাথে রয়েছি। হয়তো জীবনে আর দেখা হবে না। আমার বাড়ি হিন্দুস্তানে পড়েছে। সারাজীবন এবং বংশ পরম্পরায় আমাকে হিন্দুস্তানের গোলামি করতে হবে। আপনি ভাগ্যবান, "পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলবেন। হিন্দুদের কাছে মুসলমানদের সত্যিকারের পরিচয়কে তুলে ধরবেন" আল্লাহ আপনার এই স্বপ্ন সফল করুন, সারাজীবন এই দোআ করবো, কিন্তু আপনার পা ধরে বলছি আর একটি মুহূর্তও দেরি করবেন না। গাঢাকা দিয়ে যেমন করে পারেন পাকিস্তানে চলে যান।"

এই বলে আমার বিপদের দিনের সাথী কেরানি নূর মুহাম্মদ (রায়বাহাদুর বাবু সেদিন যাকে কেরানি-ফেরানি বলে অবজ্ঞা করেছিলেন।) আবার আমার পা ছুঁয়ে সালাম করলো এবং উঠে দাঁড়ালো। উৎকণ্ঠার সাথে শেষবারের মতো বলে উঠলো, "দোহাই আল্লাহর, আপনি আর বসে থাকবেন না। পুলিশ সক্রিয় হওয়ার আগেই যেন টাউন ছেড়ে যেতে পারেন" এইবলে দ্রুত বেরিয়ে গেল। পথে ওঠার আগে আর একবার আমার দিকে ফিরে তাকালো, হাত দিয়ে ইশারা করলো— যার অর্থ "শীঘ্র বেরিয়ে পড়ুন।"

উঠে দাঁড়ালাম। বিছানাপত্র, বাকস-পোটলা সবই হোটেলে রয়েছে। ওগুলো সাথে নিলে নির্ঘাৎ ধরা পড়তে হবে। ঘড়ি দেখলাম। ছুটে গেলে তখনো ট্রেনটা পাওয়া যেতে পারে। টাকা-পয়সাও রয়েছে হোটেলের বাক্সে। পকেটের পয়সা হিসেব করে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। আল্লাহর মর্জি রাজশাহী পৌঁছবার মতো সম্বল রয়েছে।

কিছুটা গাঢাকা দেয়ার জন্যে মাথার টুপিটা পকেটে নিলাম। রুমালটা এমন করে মাথায় দিলাম যাতে মুখের কিছুটা অংশ ঢাকা পড়ে যায়। পা'জামাটা গ্রাম্য চাষীমানুষদের কায়দায় উঁচু করে নিলাম। ঊর্ধ্বশ্বাসে যখন স্টেশনে গিয়ে পৌঁছেছি ঠিক তখন ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে। লাফ দিয়ে ট্রেনে উঠেই পায়খানায় ঢুকে দরওয়াজা বন্ধ করে দিলাম। ভয়, উত্তেজনা আর পরিশ্রমে থর থর করে শরীরটা কাঁপছিল। মনে হলো, অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবো। তাড়াতাড়ি বসে পড়লাম। কল খুলে অনেকক্ষণ ধরে মাথায় পানি দিতে লাগলাম।

এমনিভাবে চারটি কি পাঁচটি স্টেশন পার হয়ে যাওয়ার পরে বাইরে এলাম। যাত্রীদের হাবভাব লক্ষ্য করলাম। বুঝলাম, ভয়ের কিছু নেই। তবু সাবধানতার জন্যে বাঙ্কের ওপর উঠে বিপরীত দিকে মুখ করে শুয়ে রইলাম।

হোটেলের কামরায় পড়ে থাকা মালপত্রগুলোর চেহারা মাঝে মাঝেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতো। মনের মাঝে তীব্র একটা বেদনা অনুভব করতাম। তখন মনটাকে এই বলে বুঝ দিতাম, জীবন ও সম্মানের চেয়ে মালপত্রের মূল্য বেশি নয়— তার পরিমাণ যত বেশিই হোক। পাকিস্তানের জন্যে বড় বড় বিত্তশালী হাজার হাজার মানুষকে পথের ভিখারী হতে হয়েছে। সে তুলনায় আমার মালপত্রের কথাটা মনে করাই অন্যায়। মালের লোভে পড়ে থাকলে নির্ঘাৎ ধরা পড়তে হতো, আর ওরা মনের সাধ মিটিয়ে আমার ইসলাম-গ্রহণের প্রতিশোধ নেবে— অবস্থাটা চিন্তা করতেই গা'টা আমার শিউরে উঠলো।

ট্রেনটা পাকিস্তানের সীমানায় প্রবেশ করতেই আমার মনটা যে কিভাবে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, আজ এতদিন পরে ভাষার সাহায্যে সেকথা বোঝানোর সাধ্য আমার নেই। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথাটা একেবারে নুইয়ে পড়েছিল। আর মনে মনে বলেছিলাম :

"এই আমার স্বপ্নের দেশ পাকিস্তান। এই পাকিস্তানের কথা বলার জন্যে আমার গলাটিপে ধরা হয়েছিল, বক্তৃতার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। এই পাকিস্তানের মমতাতেই আমার যথাসর্বস্ব হোটেলের কামরায় ফেলে রেখে আমি আসতে পেরেছি।"

এই দেশকে একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার কাজে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে আমি আমার জীবনের সকল সাধনা, সকল শ্রম এবং সকল উদ্যম ঢেলে দেবো।

একে ইসলামী রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার কাজ কিছুটা এগিয়ে যেতেই যেমন করেই হোক ছুটে গিয়ে অন্তত আমার স্নেহশীলা জননীকে নিয়ে আসবো এবং বলবো, "আসল মুসলমান বলতে কী বোঝায় তা চোখভরে দেখে নাও এবং তোমার বিবেককে জিজ্ঞেস কর তোমার ছেলে ইসলামগ্রহণ করে ভাল কাজ করেছে কিনা।"

ঘটনাপ্রবাহ

রাজশাহীতে এসে কাজে যোগদানের ইচ্ছাপত্র (জয়েনিং রিপোর্ট) দাখিল করলাম। 'লাস্ট-পে সার্টিফিকেট' চাওয়া হলো। ঘটনার কথা বললাম এবং বিনা

লাস্ট-পে সার্টিফিকেটে জয়েনিং রিপোর্ট গ্রহণ করার অনুরোধ জানালাম। কিন্তু কোনও ফল হলো না। বৃটিশ আমল থেকে এই আইন চলে আসছে, কি করে তার বিরুদ্ধাচরণ করা যেতে পারে?

বেতন পাওয়া বন্ধ হলো। একরূপ রিক্তহস্তে রাজশাহীতে এসেছি। নতুন জায়গা। ধারকর্জইবা কে দেবে? নোয়াখালীতে প্রবল বন্যা হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে ধান-চাল সংগ্রহ করে ওখানে পাঠানো দরকার। খাদ্যসংগ্রহ অভিযান (Food drive) চালানোর ব্যবস্থা করা হলো। দারুণ বর্ষা। আমাকে দুর্গম বাগমারা থানার দায়িত্ব দেয়া হলো। নিজের অবস্থা জানিয়ে কিছু অগ্রিম (Advance) টাকার জন্যে আবেদন করলাম। প্রশ্ন দেখা দিল, বেতন যে পায় না, তাকে অগ্রিম দেয়া হবে কোন আইনে? আবেদন মাঠে মারা গেল।

রাজশাহীর তদানীন্তন জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদে অর্থাৎ হিন্দুস্তানে। মালদহের আচার্যমহাশয় তাঁর বিশেষ দূতকে রাজশাহীতে পাঠিয়ে মালগুলো ফেরৎ দেয়ার জন্যে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাই আমাদের বলা হয়েছিল, "আমরা যেন অনর্থক ঝামেলা বাদ দিয়ে মালপত্রগুলো ওদের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে আসি এবং লাস্ট-পে সার্টিফিকেট নিয়ে এনে আরামে চাকুরি করি।" জিলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিভাগীয় কমিশনার এ উভয়ের কেউ যখন আমাদের কথার যৌক্তিকতা মেনে নিতে পারলেন না, তখন অগত্যা ছুটি নিয়ে আমি ঢাকা যাই। উল্লেখ্য, মালপত্র সরিয়ে দেয়ার পর পরই আমি গোপনে মালদহ থেকে ঢাকা গিয়ে বিষয়টা কর্তৃপক্ষের গোচরিভূত করে এসেছিলাম। আমরা ঠিক কাজ করেছি দেখে তাঁরা খুশিই হয়েছিলেন।

ঢাকা গিয়ে ডাইরেক্টরসাহেবকে বর্তমান পরিস্থিতির কথা বুঝিয়ে বলতেই তিনি সিনেমা ইউনিটটি নওয়াবগঞ্জ থানা থেকে রাজশাহীতে এনে তার সাহায্যে অতি শীঘ্র কাজ শুরু করা এবং বিনা লাস্ট-পে সার্টিফিকেটে আমাদের বেতন ভাতা পরিশোধের ব্যবস্থা করার জন্যে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ জানিয়ে পত্রও লিখেন। অর্থাৎ ঢাকা থেকে ফিরে এসে সব বকেয়া বেতন পেয়ে যাই, ফলে নিশ্চিন্ত মনে কাজ শুরু করা সম্ভব হয়।

হিন্দুকর্মচারীরা প্রায় সকলেই হিন্দুস্তানে চলে গিয়েছিলেন। কোনও কোনও অফিসে কর্মচারী নেই, পিয়ন নেই, কালি-কলম নেই, এমনকি টেবিল-চেয়ার পর্যন্ত নেই। অথচ অবিরাম কাজ চলছে। কে কোন ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী তা নিয়ে কোনও বাদ-বিবাদ নেই। কাজ পেলেই হলো। কোনও কোনও কর্মচারী দিনরাত খেটে দু'তিনটি ডিপার্টমেন্টের কাজ চালাচ্ছেন, এমনটাও দেখা গিয়েছে। সবাই দেশ গড়ার জন্যে পাগল। কোনও কোনও মাস যথাসময়ে বেতন পাওয়া যেতো না। কিন্তু তা নিয়ে কোনও অভিযোগ ছিল না।

সর্বজনাব, এ. মজিদ সি. এস. পি; এল. আর. খান; এ. হাই; ফজলুল হক; আবদুল কুদ্দুছ; মোকাররম হোসেন, নূরুল আনোয়ার; আবদুল মালেক; আঃ জব্বার; অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ও সুসাহিত্যিক এ. সামাদ প্রভৃতি অফিসারবৃন্দের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং কর্মতৎপরতা দেখে আশায় ও আনন্দে আমার বুক ভরে যেতো। মনে হতো সব যেন কোনও এক প্রসিদ্ধ ফুটবল টীমের নামকরা খেলোয়াড়।

দুঃখের বিষয়, অল্পদিনের মধ্যেই নানা কারণে উর্ধ্বতন মহলের কার্যকলাপ সম্পর্কে একটা সন্দেহ ও অবিশ্বাস অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দিনে দিনে এই সন্দেহ ও অবিশ্বাস যত বাড়তে থাকে, স্বাভাবিক নিয়মে নিম্নতন মহলের উৎসাহ, কর্মতৎপরতা এবং ত্যাগের মানসিকতাও ততই হ্রাস পেতে থাকে।

সে মর্মান্তিক ঘটনাপ্রবাহের কথা প্রায় সকলেরই জানা রয়েছে। নতুন করে লেখার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

সেই মর্মান্তিক ঘটনাপ্রবাহের একটি

মা খবর দিয়েছেন আমার নব-জাত প্রথম সন্তানকে দেখার জন্যে তিনি রাজশাহী আসছেন। তাঁর থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা কোথায় করা যায় তা নিয়ে সমস্যায় পড়লাম। বাঘার সুপরিচিত শৈলেন শাহ চৌধুরী অতি সহজেই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। রাজশাহী শহরের কুমারপাড়াতে তিনি থাকতেন। পিতৃ-পিতামহের দেয়া দেবোত্তর সম্পত্তির তিনি ছিলেন সেবায়েত। কুমারপাড়ার বাড়িতে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠিত ছিল। পুরোহিত ঠাকুর প্রত্যহ রেঁধে বিগ্রহের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতেন। শৈলেন বাবু বললেন যে, সেই বিগ্রহের প্রসাদ হলেই মার চলে যাবে এবং রাতযাপনের ব্যবস্থাও তিনি করবেন। শৈলেন বাবুর কথা শুনে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

তিন দিন পর আমার ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে মা রাজশাহীতে এলেন। সকালবেলা আমার বাড়িতে আসেন, দুপুরে চলে যান, আবার বিকেলে এসে কিছুক্ষণ রাত পর্যন্ত থাকেন। কাজের তাকিদে আমাকে প্রায়ই মফস্বল যেতে হয়। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন।

বলা আবশ্যক যে, এর কিছুদিন পূর্বেই মরহুম লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন।

একদিন হঠাৎ মা আমাকে প্রশ্ন করে বসলেন— কিরে খোকা, এখানে ইসলামী রাষ্ট্র হতে আর কত দেরি? পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম প্রধানমন্ত্রীর রক্ত দিয়েই তোর সেই ইসলামী রাষ্ট্রের যাত্রা শুরু হলো নাকি?

একান্ত অপ্রত্যাশিতরূপে মার এই প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে পড়লাম। পরে অনেক কষ্টে শক্তি সঞ্চয় করে মাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, এখনও ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান রচিত হয়নি।

এখন যেসব কাজ-কারবার চলছে, তার সব হলো ইংরেজি আইনের কুফল। পাকিস্তানের আইন যখন চলবে তখন এ সবের নামগন্ধও খুঁজে পাওয়া যাবে না। মা দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, ইসলামী আইন যারা তৈরি করবে এই নৃশংস খুনও তো তারাই করেছে? এদের ইসলামী আইন যে কেমন হবে এখনও কি সেকথা তুই বুঝতে পারিসনি?

কথা বলার ভাষাই যেন আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। মাকে বড়গলা করে কি বলে এসেছিলাম আর ঘটে চলেছে কি? তবু বুদ্ধি করে বললাম— না না, এরা আইন রচনা করবে কেন? সে জন্যে ভিন্ন লোক রয়েছেন।

মা বললেন, তুই দেখে নিস আইনের জায়গায় আইন পড়ে থাকবে, কাজের বেলায় ঠনঠন। হিন্দুশাস্ত্রেও অনেক ভাল ভাল কথা রয়েছে। কিন্তু কেউ তা মানে না। নরক যারা ভয় করে না, জেলের ভয় তারা করবে কেন?

লজ্জায়, ক্ষোভে এবং দুঃখে প্রায় পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। বুকে কত বড় আশা নিয়ে মার কাছে ইসলামী রাষ্ট্রের কথা বলেছিলাম। আর আজ আমার সেই আশার মুখে ছাই দিয়ে সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী কাজ-কারবার চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহ সাহেবের উলটা-পালটা কথা শুনেই তাঁদের ইসলামী রাষ্ট্র কেমন হবে সেটা আঁচ করে শিউরে উঠেছিলাম। একদিন তিনি বলেন, "পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হয়ে রয়েছে। পবিত্র কুরআনই হলো পাকিস্তানের সেই সংবিধান।" অন্যদিন বলেন, "এদেশের হিন্দু হিন্দু নয়, মুসলমান মুসলমানও নয়; এখন আমরা সবাই পাকিস্তানী।"

বলাবাহুল্য, এ কথা দ্বারা তিনি ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের কথাই বলেছিলেন। অথচ ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ইসলাম সমর্থন করে না, করতে পারে না।

মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসার আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ আলহাজ্ব মাওলানা রহীম বকস সাহেবের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কিন্তু একটি কাজের জন্যে তিনি আমার ওপর কিছুটা অসন্তুষ্ট ছিলেন; সেটা হলো পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার প্রতি আমার দৃঢ় সমর্থন। একদিন কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন, "দেখ আবুল হোসেন! যারা নিজেদের সাড়ে তিন হাত দেহের ওপরে ইসলামকে কায়েম করতে পারেনি, তারা একটা বিরাট দেশের ওপরে ইসলাম কায়েম করবে, একমাত্র পাগল ছাড়া আর কেউ একথা বিশ্বাস

করতে পারে না। যে পাকিস্তানের জন্যে তোমরা এখন পাগল হয়ে উঠেছো একদিন তোমরাই সেই পাকিস্তান থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্যে পথ খুঁজে বেড়াবে। কিন্তু পথের সন্ধান তোমরা পাবে না।"

আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদজী আজ নেই। কিন্তু তাঁর কথাগুলো ইথারে ভেসে ভেসে চিরদিন থেকে যাবে। আর থেকে যাবে আমার মনের পাতার পরতে পরতে— যতদিন আমার এই দেহটা কবরের মাটি হয়ে না যায়।

পাকিস্তান তথা আমার স্বজন-পরিজনদের কাছে সত্যিকারের ইসলামী চরিত্র সার্থকভাবে তুলে ধরার নেশায় সেদিন এমনিভাবেই মেতে উঠেছিলাম যে আমার স্নেহশীল উস্তাদজী নারাজ হবেন সেকথা জেনেও নিজেকে থামিয়ে রাখতে পারিনি। তাই আজ এই বৃদ্ধ বয়সে চোখের পানিতে আমাকে বুক ভাসাতে হচ্ছে। আর এমনিভাবে চোখের পানি নিয়েই একদিন আমাকে কবরে যেতে হবে।

এ ঘটনার পর আমার স্নেহশীলা জননী আর দু'দিন রাজশাহীতে ছিলেন। সাধ্যপক্ষে আমি তাঁকে এড়িয়ে চলতাম। তিনি সেটা বুঝতে পেরেছিলেন।

বিদায়ের সময় আমাকে কাছে ডেকে স্নেহভরা কণ্ঠে তিনি বললেন, "বোকা ছেলে! পালিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন? আমি যে তোর মা এবং তোকে যে আমি পেটে ধরেছি, সেকথা কেন ভুলে যাস? মা হয়ে ছেলের মনের কথা বুঝবো না, সেটা কি করে সম্ভব?"

"পাকিস্তানে ইসলামী আইন হলে ভালই হতো। আমিও সেই আশাই করেছিলাম। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা তা যে হতে দেবে না লিয়াকত আলী সাহেবকে খুন করার সাথে সাথেই সেকথা বুঝতে পারা গিয়েছিল।"

তারপর আমার মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন, "তোকে ফেরানোর বহু চেষ্টাই আমরা করেছি। কিন্তু সবই বৃথা হয়েছে। আর দেখা হবে কিনা জানি না। আসা-যাওয়ার ভীষণ ঝামেলা। তুই যাস না বলেই কষ্ট করে আমাকে আসতে হয়। যাওয়ার সময় বলে যাচ্ছি, ইসলামী আইন হোক আর না হোক নিজেরা সর্বদা সৎপথে থাকবি। ভগবানকে কখনো ভুলবি না। আর কখন কেমন থাকিস তোর এই চিরদুঃখিনী মাকে সে কথা জানাবি। দাদুভাই এবং বৌমার প্রতি লক্ষ্য রাখবি।"

এ বলে তিনি তাঁর দাদুভাইকে কোলে নিয়ে চুমু খেলেন, তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। তারপর দ্রুতপদে বের হয়ে গেলেন। মনে হলো তিনি কান্না চেপে রাখতে পারছিলেন না এবং এটাই তাঁর দ্রুতপদে বের হয়ে যাওয়ার কারণ।

আশার ছলনা

এর প্রায় দু'বছর পর মা গাইবান্ধায় এসে তাঁর সাথে দেখা করার জন্যে আমার কাছে টেলিগ্রাম করেছিলেন। আমি তখন ময়মনসিংহে। সেখানে উল্লেখযোগ্য কোনও আত্মীয় না থাকায় সেখানকার ভিসা তিনি পাননি।

বহুদূরের পথ ছিল না। ইচ্ছা করলে গাইবান্ধা গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে পারতাম। কিন্তু আমি যাইনি, যেতে পারিনি। সেবার তিনি বলেছিলেন, "পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম প্রধানমন্ত্রীর রক্ত দিয়েই ইসলামী রাষ্ট্রের যাত্রা শুরু হলো নাকি।"

এবারে হয়তো বলবেন, "এতবড় একটা খুন হয়ে গেল, তার বিচার তো দূরের কথা একটা তদন্ত পর্যন্ত হলো না। খুনীরা সদম্ভে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ইসলামী রাষ্ট্রের ইসলামপ্রিয় নাগরিকেরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে।" টেলিগ্রামখানা হাতে নিয়ে এসব কথা আমার মনে জেগে উঠেছিল। তাই আমি যেতে পারিনি। আমার দেখা না পেয়ে আমার স্নেহশীলা জননী অব্যক্ত বেদনা বুকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন।

প্রিয় পাঠকবর্গ! একথা শুনে হয়তো আপনারা আশ্চর্যান্বিত না হয়ে পারবেন না যে, এর পরে মৃত্যুশয্যায় মা আমাকে শেষবারের মতো দেখতে চাচ্ছেন একথা জানতে পেরেও তাঁর সাথে দেখা করতে যাইনি। যেতে পারিনি।

শেষবারের মতো তাঁকে একবার দেখার জন্যে মনটা আমার ভীষণভাবে আকুলি-বিকুলি করেছে। কিন্তু তাঁর ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের কাছে গিয়ে লজ্জায় মাথা হেঁট করে দাঁড়াতে হবে একথা মনে হতেই ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছি।

আমার এই লজ্জার কারণটা কি তা অনেকেই হয়তো সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন না। তাই অতি সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন যে, কী কারণে আমার নগণ্য শক্তি নিয়ে আমি পাকিস্তান আন্দোলনে করেছিলাম, ইতোপূর্বে সে সম্পর্কে কিছুটা আভাস দেয়া হয়েছে। এখানে একটু বিস্তৃতভাবে বলতে হচ্ছে যে, এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার সময়ে পার্থিব কোনও লোভ-লালসা আমার ছিল না। নিজে ব্রাহ্মণ ছিলাম, সুতরাং হিন্দুসমাজের মন-মানস, আবেগ-অনুভূতি, ধারণা-বিশ্বাস-প্রভৃতির সাথে আমার যে পরিচয় তা জন্মগত, প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব।

কিছুসংখ্যক সম্মানজনক ব্যতিক্রম বাদে গোটা হিন্দুসমাজ এমনকি তাদের সমাজের মুচী-মেথর, ডোম, চাড়াল প্রভৃতিরাও মুসলমানদের কতখানি ঘৃণা করে সেকথা বেশ ভালভাবেই আমার জানা ছিল। আর জানা ছিল বলেই অখণ্ড

ভারতে বিপুলভাবে এত জঘন্য এবং এত শোচনীয় মুসলিমহত্যা হবে সেকথা ভেবে আমি ভীষণভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম।

আগামীদিনের নাগরিক কোটি কোটি মুসলমান শিশুর চেহারা সেদিন আমার মানস-পটে ভেসে উঠেছিল। সেই সোনার শিশুরা অখণ্ড ভারতে সংখ্যালঘু হওয়ার অপরাধে চিরদিন হিন্দুসমাজের অধীন ও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে, ঘৃণা ও লাঞ্ছনার জীবনযাপন করবে সেকথা ভাবতেই আমার দেহ-মন ভীষণভাবে শিহরিত হয়ে উঠতো।

তখন পাকিস্তান সৃষ্টিই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান বলে বুঝতে পেরেছিলাম। কেননা তাহলে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানেরা নিজেদের জন্যে শুধু একটি স্বাধীন রাষ্ট্রই লাভ করবে না, ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সেই রাষ্ট্রকে এমন একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে যা হবে পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশের জন্যে অনুকরণীয়।

বিশ্বের আদর্শ এবং অনুকরণীয় সেই রাষ্ট্রে আমার মানস-পটে ভেসে ওঠা সেই কোটি কোটি সোনার শিশু সোনায় গড়া ফুলের মতো দিনে দিনে ফুটে উঠবে এবং নিজেদের বিশ্বের আদর্শ ও অনুকরণীয় মানুষরূপে গড়ে তোলার সুযোগ পাবে। ফলে গোটা হিন্দুসমাজ বিশেষ করে আমার স্বজন-পরিজনদের কাছে আমি মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হব। এক বুকভরা আশা নিয়েই সেদিন পাকিস্তান আন্দোলনে আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।

শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান পাঠকবর্গ! পাকিস্তান সৃষ্টির পরবর্তী কার্যকলাপের কথা স্মরণ করুন এবং ভেবে দেখুন সেই সব কার্যকলাপের দ্বারা আমার বুক ভরা আশাকে কিভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হয়েছে।

যেহেতু আমার মানস-পটে ভেসে ওঠা সেদিনের সে সোনার শিশুরা যারা আজ যুবক ও তরুণ হয়ে বেড়ে উঠেছে এসব কার্যকলাপের কথা জানে না। অতএব তাদের অবগতির জন্যে ওসবের কিছুটা আভাস এখানে তুলে ধরতে হচ্ছে।

অখণ্ড ভারতের দাবিদারগণ সর্বশক্তি নিয়োগ করেও যখন পাকিস্তান সৃষ্টি ঠেকাতে পারলো না, তখন তারা আতুরঘরেই তাকে গলাটিপে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো। নানারূপ শঠতা ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে তারা পাকিস্তানের ন্যায্য ন্যায়সঙ্গত পাওনা শত শত কোটি টাকা, বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত করে পাকিস্তানকে ঠুটো জগন্নাথে পরিণত করলো।

এই ঠুটো জগন্নাথে পরিণত করেই সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরে এক ভীষণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু করে দিল, অন্যায়ভাবে হায়দারাবাদ, জুনাগড়, মানভাদর প্রভৃতি

রাজ্য গ্রাস করলো। পাকিস্তানের উভয় সীমান্তে পুনঃ পুনঃ হামলা চালাতে লাগলো, চোরাকারবারীর দলসমূহকে লেলিয়ে দিয়ে সেই ঠুটো জগন্নাথকে একেবারে নিঃশেষ ও নিঃসম্বল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলো।

ভেবে আশ্চর্যান্বিত না হয়ে পারা যায় না যে, বাইরের এই বিভিন্নমুখী আক্রমণে শিশু পাকিস্তানের যখন নাভিশ্বাস উপস্থিত, যেকোনও মুহূর্তে সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার যখন প্রবল আশঙ্কা বিদ্যমান, ঠিক তেমনি সময়ে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে শুরু করা হয়েছে এক নারকীয় কাণ্ড-কারখানা।

পাকিস্তান-আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিলেন এমন ব্যক্তিদের কিছুসংখ্যক এই "ঘর পোড়ার সুযোগে খৈ খাওয়ার" জন্যে মত্ত হয়ে উঠলেন। অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে গদি নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিলেন এবং এ জন্যে শঠতা, ষড়যন্ত্র, হত্যা, জুলুম প্রভৃতির আশ্রয় নিতেও কণামাত্র দ্বিধা করলেন না।

পাকিস্তান ধ্বংস হোক, তাদের এই জঘন্য কাণ্ড-কারখানা দেখে ইসলাম, ইসলামী রাষ্ট্র এমনকি তাদের নিজেদের সম্পর্কে সারা বিশ্বে নিন্দার ঝড় উঠুক, সেদিকে লক্ষ্য করার সুযোগ তাদের নেই। সকল লক্ষ্য, সকল মনোযোগ এবং সকল কার্যক্রম গদী দখলের লড়াইয়ে তারা নিয়োজিত করেছেন।

বলাবাহুল্য, চারদিকে নিন্দা ও সমালোচনার ঝড় উঠেছে। হয়তো গদী দখলের নেশায় মশগুল থাকায় সেসব শুনতে পাননি। কিন্তু আমাকে তা শুনতে হয়েছে এবং সাথে সাথে আশায় ভরা আমার বুকখানায় হতাশার তীব্র দহন আমি অনুভব করেছি।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে এই যে গদীর লড়াই শুরু হয়েছে, আজও তার অবসান ঘটেনি। মুসলিম লীগের চেষ্টায় এ উপ-মহাদেশের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত এবং পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়া মুসলমানদের মধ্যে যে ঐক্য ও সংহতি গড়ে উঠেছিল, অন্য কথায় যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারা এই উপ-মহাদেশের মুসলমানেরা ভারত বিভক্তির মতো অসাধ্য সাধনে সক্ষম হয়েছিল, গদীর লড়াই সে ঐক্য ও সংহতি ভেঙ্গে চুরমার করতে লাগলো; গদীর স্বার্থ দিনের পর দিন নানা ধরনের মারমুখো দল-উপদল গড়ে তোলার প্রতিযোগিতায় গদী শিকারীদের ভীষণভাবে মাতিয়ে তুললো।

এসব কাণ্ড-কারখানা দেখে ভীষণভাবে মর্মাহত হলেও একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলাম না। কারণ তখনও আমার মানস-পটে ভেসে ওঠা সেই কোটি কোটি শিশুর চেহারা মনের মাঝে ঝিলিক দিয়ে চলছিল। এই নিদারুণ হতাশার মাঝেও মনকে বুঝ দিচ্ছিলাম যে, একদিন না একদিন এই সোনার শিশুরা সোনার মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে এবং এই দেশটাকেও সোনার দেশে পরিণত করবে।

কিন্তু আসলে আমার এই আশাও বিরাট ধরনের একটা ছলনা বা মায়ামরীচিকা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পাকিস্তান-আন্দোলনের সময় যে কোটি কোটি শিশুর চেহারা আমার মানস-পটে ভেসে উঠেছিল, যারা দিনে দিনে সোনায় গড়া ফুলের মতো পাকিস্তানের মাটিতে ফুটে উঠছে, তাদের সত্যিকারের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা ছিল রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব।

কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম যে, এই প্রথম ও প্রধান দায়িত্বটিকে অতি নির্মমভাবে পদদলিত করা হচ্ছে। গদী শিকারীর দল প্রগতি ও আধুনিকতার নামে সুপরিকল্পিতভাবে এই সোনার শিশুদের বহুসংখ্যককে ধর্মহীন, নাস্তিক এবং ঘোরতর ইসলামবিরোধী করে গড়ে তুলছে।

অন্য একদল ইসলামের নামে অপরিকল্পিতভাবে এই সোনার শিশুদের কিছু সংখ্যককে কূপমণ্ডুক, অনুষ্ঠানসর্বস্ব, প্রথা-পদ্ধতির অন্ধ অনুসারী, ফতোয়াবাজ এবং যুগের অনুপযোগী করে তুলছে।

আর বাদবাকি যেসব শিশু সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাদের উভয়দলই ছেড়ে দিয়েছে সম্পূর্ণরূপে ভাগ্যের ওপর। ফলে এরাও ইসলামী আদর্শে গড়ে ওঠার কোনও সুযোগ পেল না। এতদ্বারা আমি একথাই বোঝাতে চাচ্ছি যে, আমার সে সোনার শিশুদের সুপরিকল্পিতভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার কোনও প্রচেষ্টাই কোনও পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়নি। তবে নিজস্ব প্রতিভার বলে এবং অধ্যবসায়ের ফলে যারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠেছেন এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে না।

ইসলামের নামে সৃষ্ট এই দেশের ভবিষ্যত নাগরিকদের প্রায় বারো আনা অংশকে সুপরিকল্পিতভাবে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ করে রাখা আর বাদবাকি চার আনা অংশকে নাস্তিক, ইসলাম-বিদ্বেষী বা ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণকারীতে পরিণত করার পরিণাম দেশ ও জাতির পক্ষে কত ভীষণ ও ভয়াবহ হয়েছে, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ সকলের চোখের সম্মুখেই রয়েছে।

সে যাহোক, এই বিপুল সংখ্যক মানুষ যাদের পূর্বতন শাসকেরা সুপরিকল্পিতভাবে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, বিদ্বেষপরায়ণ এবং ভ্রান্ত ধারণা পোষণকারীতে পরিণত করেছিলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের সময় এক শ্রেণীর লোক তাদের কিভাবে ব্যবহার করেছিলেন আসুন অতঃপর সেকথা স্মরণ করি।

(ক) এটা সকলেরই জানা রয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানী স্বৈরাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রটির দৌরাত্ম্য এবং শোষণ-নির্যাতন যখন সকল সীমা

অতিক্রম করে, তখন অনন্যোপায় হয়ে পূর্বপাকিস্তানীদের স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু করতে হয়।

বলাবাহুল্য, এটা ছিল একান্তরূপেই একটা রাজনৈতিক বিষয়। অবশ্য রাজনৈতিকভাবেই এর সমাধানও করতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। তবে অনেকের ধারণায় রাজনৈতিকভাবেই এই ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ছিল।

কিন্তু তা না করে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো'র মতো হঠাৎ সেখানে ইসলাম টেনে আনা হলো এবং সকল অন্যায় ও সকল ব্যর্থতা ইসলামের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হলো।

অর্থাৎ দেশবাসী বিশেষ করে তরুণ ও যুবসমাজকে একথাই বোঝানো হলো যে, যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্রটি মুসলমান বলে পরিচিত এবং যেহেতু ইসলামের নামেই তারা এসব ঘৃণ্য কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে, অতএব এসব কিছুর জন্যে ইসলামই সর্বোতভাবে দায়ী।

আর যেহেতু ইসলামই এইসব কিছুর জন্য সর্বোতভাবে দায়ী, অতএব ইসলাম যে বুর্জোয়াদের শোষণের হাতিয়ার, সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। এমতাবস্থায় এ দেশের মাটি থেকে ইসলামকে উৎখাত না করা পর্যন্ত কোনওক্রমেই এ দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে না।

এর পরবর্তী অবস্থা ভয়াবহ এবং বেদনাদায়ক হয়েছিল সেকথা প্রায় সকলেরই জানা রয়েছে। সুতরাং নতুন করে লেখার প্রয়োজন হয় না।

অথচ ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে সকলেই জানেন যে, ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই বুর্জোয়া-অবুর্জোয়া নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল প্রকার কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে আপোসহীনভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত আর কোনও প্রভু বা উপাস্য নেই' এই পবিত্র এবং বিপ্লবী কালেমা এবং 'মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি' এ যুগান্তকারী ঘোষণার মাধ্যমে ইসলাম আল্লাহ এবং মানুষ উভয়ের মধ্যে গড়ে ওঠা এবং গড়ে তোলা যাবতীয় মাধ্যম অন্য কথায় ছোট বড় সকল প্রকারের কল্পিত সত্তা ও বিষয় নির্মূল করে বিশ্বের বুকে একমাত্র আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভুত্ব এবং সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠা করার কঠোর সুমহান দায়িত্ব মুসলমানদের ওপর অর্পণ করেছে।

এমতাবস্থায় যারা ইসলামকে 'বুর্জোয়াদের শোষণের হাতিয়ার' এবং 'স্বাধীনতার শত্রু' বলে আখ্যায়িত করে, তাদের সম্পর্কে কোনও মন্তব্য না করাকেই আমরা নিরাপদ বলে মনে করি।

(খ) পৃথিবীর ইতিহাসের সামান্যতম পরিচয় রয়েছে এমন ব্যক্তিরাও একথা জানেন যে, বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরাই আবহমানকাল যাবত রক্ত, বর্ণ,

বংশ, গোত্র, ভৌগোলিক সীমারেখা, ভাষা, পেশা, সামাজিক মর্যাদা, অর্থ-বিত্ত, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি জাতীয়তার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে মানুষে মানুষে ভেদ-বৈষম্যের অলঙ্ঘ্য প্রাচীর সৃষ্টি করেছে এবং এভাবে অখণ্ড মানবতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে নানা দল-উপদলের সৃষ্টি ও পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষের আগুনে জ্বালিয়ে নিজেদের প্রভুত্ব-প্রাধান্য ও শাসন-শোষণ অব্যাহত ও নিরঙ্কুশ করেছে।

তাদের এই জঘন্য কাজের পরিণামে যখনই পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ, সংঘাত-সংঘর্ষ এবং শোষণ-নির্যাতনে মানবতা পর্যুদস্ত এবং দিশেহারা হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে মুসলমান এবং একমাত্র ইসলামই এক মহান আদর্শের ভিত্তিতে ভেদ-বৈষম্যের সকল বাধা ও সকল প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ভাষা-পেশা, গোত্র-বর্ণ প্রভৃতি নির্বিশেষে সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করেছে। প্রাণঘাতী শত্রুকেও ভাইয়ের মর্যাদা দিয়ে বুকে টেনে নিয়েছে।

আদর্শকে ভিত্তি করা ছাড়া নানা রং, নানা ভাষা, নানা পেশা ও নানা স্বার্থে বিভক্ত-বিচ্ছিন্ন মানবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ, সুসংহত এবং মানবতাবোধসম্পন্ন করে গড়ে তোলার বিকল্প কোনও পথই যে আর নেই কোনও স্থিরপ্রাজ্ঞ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিই সেকথা অস্বীকার করতে পারেন না।

অথচ বাংলাদেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময় এই মহা-সত্য অস্বীকার করে দেশবাসী বিশেষ করে দেশের উদীয়মান তরুণ ও যুবসমাজকে একথাই বোঝানো হয়েছিল যে, নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখাই হলো আমাদের জাতীয়তার মূল ভিত্তি। অর্থাৎ আমরা বিশ্বের এক কোণায় নির্দিষ্ট এতটুকু স্থানের মধ্যে গোটা মানবজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র একটি জাতি।

(গ) যেহেতু পৃথিবীর অন্য সকল ধর্ম শুধু ধর্মই। নিছক অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে পারলৌকিককল্যাণ অর্জনই সেসবের মূল লক্ষ্য। সুতরাং ইহ-জীবনের কাজ-কারবারের সাথে ধর্মের কোনও সম্পর্ক থাকার কথা ওসব ধর্মের অনুসারীরা স্বীকার ও বিশ্বাস করেন না।

পক্ষান্তরে ইসলাম শুধু ধর্মই নয়, পরিপূর্ণ জীবনবিধানও। বলাবাহুল্য, জীবনবিধান জীবনে বাস্তবায়িত করার ওপরই তার সার্থকতা নির্ভর করে। আর তা বাস্তবায়িত করতে হয় ইহ-জীবনেই। কেননা, জীবনবিধান জীবনের পরপারে বা পারলৌকিক জীবনে বাস্তবায়নের কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এটা বাস্তবায়িত করার সুফল শুধু ইহ-জীবনই নয়, পরজীবন পর্যন্তও পরিব্যাপ্ত। অন্য কথায় ইসলামের দৃষ্টিতে ইহ-জীবনই পারলৌকিক জীবনের ভিত্তিভূমি বা কর্মক্ষেত্র। অর্থাৎ ইহ-জীবন সুন্দর ও সফল করে গড়ার ওপরই পারলৌকিক জীবনে সাফল্য বা কল্যাণ ও মঙ্গল একান্তরূপে

নির্ভরশীল। আর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই যে জীবন-বিধান বাস্তবায়িত করা সহজ ও সম্ভব সেকথা খুলে বলার কোনও প্রয়োজন হয় না।

যেহেতু পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম জীবনবিধান নয়, অতএব ওসবের দ্বারা জীবন গড়ার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর জীবন গড়ার প্রশ্ন উঠতে পারে না বলেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সাথে তা সামঞ্জস্যশীল নয় বা হতে পারে না।

এই সামঞ্জস্যশীল নয় বা হতে পারে না বলে পৃথিবীর অন্য সকল রাষ্ট্র, জীবন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা থেকে ধর্ম বাদ দিয়েছে এবং নিজেদের ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুযায়ী 'ধর্মনিরপেক্ষ' জীবন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

জীবন ধর্ম থেকে পৃথক বা নিরপেক্ষ করা যায় কি না জানি না। তবে আমরা যা জানি এবং যা সত্য ও স্বাভাবিক বলে মনে করি, তাহলো মানব-জীবন অবলম্বন করেই ধর্মকে টিকে থাকতে হয়। অনুরূপভাবে ধর্ম ধারণ বা অবলম্বন করেই মানবজীবন সুন্দর ও সফল করতে হয়। অর্থাৎ একটির সাথে অন্যটির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

অতএব ব্যক্তিজীবন যদি ধর্মনিরপেক্ষ করা না যায়, তবে পারিবারিক সামাজিক, রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি জীবনের কোনও পর্যায়কেই 'ধর্মনিরপেক্ষ' করা যেতে পারে না।

এমতাবস্থায় যারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেন, তাঁরা হয় জীবন এবং ধর্ম এ দুটোর কোনওটা সম্পর্কেই সঠিক জ্ঞান রাখেন না অথবা উদ্দেশ্যমূলকভাবে যত্রতত্র এবং যথেচ্ছভাবে তাঁরা এই শব্দটির ব্যবহার করে থাকেন।

এইতো গেল 'ধর্ম'-এর কথা। অতঃপর প্রিয় পাঠকবর্গ! আপনারা 'জীবন-বিধান' শব্দের তাৎপর্য যথাযথভাবে অনুধাবন করুন এবং ইসলামকে যাঁরা জীবনবিধান বলে বিশ্বাস করেন এবং যে দেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা নব্বইজনের মনেই এই বিশ্বাস বদ্ধমূল রয়েছে, সেই দেশে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা চলতে পারে কিনা সেকথা একবার ভেবে দেখুন।

আপনারা যে 'চলতে পারে না' বলেই রায় দেবেন সে বিশ্বাস আমার রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চলতে পারে না একথা যত সত্য এবং যত বাস্তব হোক, এদেশের শতকরা নব্বইজন অধিবাসীর ওপর সেই 'ধর্মনিরপেক্ষ' শাসনব্যবস্থাই চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

তবে 'ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা' চাপিয়ে দেয়ায় কিছুটা সুবিধাও হয়েছে। আর তাহলো মুসলমান হিসেবে চলে আসা স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য মিটে গিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষ, বিশেষ করে ভারতীয় হিন্দুদের সাথে একাকার হয়ে যাওয়ার পথটা যথেষ্ট পরিমাণে সহজ ও সুগম হয়েছে।

আর অসুবিধা যা কিছু হয়েছে তার সবটাই হয়েছে আমার মতো নওমুসলিমদের জন্যে। কেননা, বড় সাধ করে মুসলমান হতে এসে আমরা না থাকলাম হিন্দু, আর না হতে পারলাম মুসলমান। অন্য এক অভিনব জাতীয়তার অঙ্কুশে আটকে পড়ে ত্রিশঙ্কু রাজার মতো মাঝপথে ঝুলে রইলাম।

(ঘ) পাকিস্তান আন্দোলনের সময় আমার মানসপটে ভেসে ওঠা সেই কোটি কোটি সোনার শিশু যারা আলোচ্য সময়ে কৈশোর ও যৌবনে পদার্পণ করেছিল, তাদের বোঝানো হলো যে, "ইসলামী চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ প্রভৃতি সবকিছুই মধ্যযুগীয় এবং সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট। অতএব প্রগতির স্বার্থে এ সব সর্বোতভাবে বর্জন করতে হবে।"

যেহেতু তাদের এ কথাও বোঝানো হলো যে, 'আল্লাহ' শব্দটিও প্রাচীন ও সাম্প্রদায়িক। সুতরাং ওটাকেও বর্জন করতে হবে। মোটকথা, ইসলামের নাম-নিশানা রয়েছে এমন সবকিছু বর্জন করে আমরা যে আধুনিক প্রগতিবাদী এবং অসাম্প্রদায়িক তার প্রত্যক্ষ এবং জাজ্বল্যমান প্রমাণ সর্বসমক্ষে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে।

শুধু আধুনিকতার স্বার্থেই নয়, আমাদের জাতীয় ভাষা এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির স্বার্থেও যে ওসব বর্জন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, কিশোর-তরুণদের সেকথাও বেশ ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়া হলো।

এরপরে দেখা গেল যে, এক শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে আমাদের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাস্থল কিশোর-তরুণদের বেশ কিছুসংখ্যক তাদের কথাবার্তা ও সাহিত্যকর্মে সাম্প্রদায়িক (!) 'আল্লাহ' শব্দটি বাদ দিয়ে সেস্থলে অসাম্প্রদায়িক (?) 'ভগবান; শব্দটির ব্যবহার শুরু করে দিয়েছেন।

হিন্দুদের মূর্তিপূজার সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট অর্ঘ্য, অঞ্জলি, আলপনা, লগ্ন, লক্ষ্মী, বেদী, বর্ষবরণ, বর্ষাবরণ প্রভৃতি শব্দ টেনে এনে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির আসল পরিচয় তুলে ধরার কাজেও তাদের অনেককে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করতে দেখা গেল।

গভীর বিস্ময়ের সাথে আরও লক্ষ্য করা গেল যে, আমাদের স্নেহের তরুণীরাও আর পিছিয়ে রইলেন না। তাদের অনেকেই ইলোরা-অজন্তার গায়িকা-নর্তকি, মঠ-মন্দিরের দেবদাসী-সেবাদাসী ও স্বর্গবেশ্যা রম্ভা-মেনকা প্রভৃতির কায়দায় পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে শুরু করলেন। তাদের চাল-চলন, অঙ্গ-ভঙ্গী এমনকি তাদের বাঁকা ঠোঁটের হাসিটুকুও হুবহু নকল করার অনুশীলন তারা শুরু করে দিলেন।

আরও দেখা গেল যে, আমাদের প্রগতিশীলতার পরিচয় তুলে ধরার মহান উদ্দেশ্যে এসব সংস্কৃতিসেবীরা এখন থেকে কয়েক হাজার বছর পূর্বে প্রচলিত

শ্যামা-নৃত্য, বাউল সঙ্গীত, ভৈরবী-তাল, সূর্যশপথ, ঝুমুরনাচ প্রভৃতি নতুন করে চালু করার কাজে ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

একদল নিজেদের 'সূর্য-সন্তান' বলে পরিচিত করাকে মহা-গৌরবের কাজ বলে মনে করতে লাগলেন। অথচ সূর্যের সন্তান হওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার। আর হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী কুমারী অবস্থায় কুন্তির গর্ভে সূর্য কর্তৃক কর্ণ নামক একটি মাত্র সন্তানেরই জন্ম দেয়া হয়েছিল। যেহেতু সে যুগ বহু পূর্বেই বাসী হয়ে গিয়েছে। অতএব সূর্য কর্তৃক সন্তান জন্মদানের কথা এখন আর কল্পনা করা যেতে পারে না।

আমাদের উল্লেখিত সংস্কৃতিসেবী এবং প্রগতিপরায়ণরা তাঁদের এসব কার্যকলাপ এত প্রকাশ্যে এবং এত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ধুম-ধামের সাথে চালিয়ে যাচ্ছেন যে, যাঁদের চোখ-কান খোলা রয়েছে তাঁদের কাছে এ সবের বিশদ বর্ণনা দেয়ার কোনও প্রয়োজনই হয় না।

তাঁদের এসব কার্যকলাপের সমালোচনা করার সামান্যতম যোগ্যতা আমার নেই। তেমন কোনও অধিকার আমার আছে বলেও আমি মনে করি না। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে স্বাধীনভাবে সবকিছু করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার তাঁদের রয়েছে বলে আমি মনে করি।

তবে আমি এবং আমার মতো নওমুসলিমরাও এ দেশের আইনসঙ্গত নাগরিক। আমাদের সুবিধা অসুবিধার কথা তুলে ধরার ন্যায্যসঙ্গত অধিকার নিশ্চিতরূপেই রয়েছে। সেই অধিকার বলে সুধী পাঠকবর্গের কাছে শুধু একটা বিষয়ের পরামর্শ বা একটা প্রশ্নের উত্তর আমরা পেতে চাই। আর সেটি হলো :

এইসব কার্যকলাপের ফলে আমাদের পূর্বতন আত্মীয়-স্বজনেরা যদি বলেন যে, "যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তা, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভৃতির দিক দিয়ে আমরা এবং তোমাদের দেশের মুসলমানেরা অভিন্ন, যেহেতু তাদের এবং আমাদের ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত এবং যেহেতু আমাদের পূজার্চনার অর্ঘ্য, অঞ্জলি, আলপনা, লগ্ন, লক্ষ্মী, এমনকি আমাদের ভগবানকে পর্যন্ত তারা নিজস্ব করে নিয়েছে, অতএব তোমাদের আর মুসলমান থাকার কি প্রয়োজন থাকতে পারে? এবার শুদ্ধির মাধ্যমে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসো।"

"তবে যেহেতু বেশ কিছুদিন ধরে তোমরা 'নিষিদ্ধ মাংসটা' ব্যবহার করেছ, অতএব শুদ্ধির বেলায় তোমাদের যে গোবর-চোনা খেতে হবে, অন্যদের তুলনায় স্বাভাবিক নিয়মেই তার পরিমাণটা হবে অনেক বেশি", তাহলে আমরা কী করবো আর তাঁদের কথারইবা কি উত্তর আমরা দেবো?

এইসব সম্মানিত প্রগতিবাদী এবং সংস্কৃতিসেবীরা আমাদের জাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও প্রগতিশীলতাকে তুলে ধরার জন্যে বিভিন্নমুখী যেসব কার্যক্রম

চালিয়ে যাচ্ছিলেন তার একটি মাত্র দিকের কিছুটা আভাস ওপরে তুলে ধরা হলো।

অন্তত অন্য আর একটি দিক সম্পর্কে কিছুটা আভাস না দিলে আলোচনার অঙ্গহানি হবে বলে আমাকে পূর্বকথার জের টেনে এখানে বলতে হচ্ছে :

একসময় এটাও লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, আমাদের জাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং প্রগতিশীলতাকে ভিন্নভাবে তুলে ধরার জন্যে ওপরোক্ত মহলের একটি অংশ বিশেষভাবে তৎপর হয়ে উঠলেন। এবং একাজটা করতে গিয়ে তাঁদের কেউবা নতুন করে টাই এবং কোট-প্যান্টের অর্ডার দিলেন, কেউবা ব্লাউজের কাপড় দিয়ে শার্ট আর কেউবা শার্টের কাপড় দিয়ে ব্লাউজ বানালেন। কেউবা প্যান্টের সাথে পাঞ্জাবী জুড়ে দিলেন আর কেউবা শাড়ির পরিবর্তে প্যান্ট পরতে শুরু করলেন।

এদেরই অন্য একটি দল বাংলাভাষা এবং বাঙালি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতে গিয়ে লাঞ্চের টেবিল-এ বসে কাটাচামুচের সাহায্যে চপ-কাটলেট খাওয়া এবং ডিনারে দল বেঁধে (বুকে— Buflet) ঘুরে ঘুরে রাইচ, মাটন, কারী এবং শিকারের সদ্ব্যবহার শুরু করে দিলেন।

এরাই নিজেদের ছেলে-মেয়েদের আদর্শ নাগরিকরূপে গড়ে তোলাকে মূলতবী রেখে তারা জাতীয়তাবাদী নাম রাখার দিকেই সম্পূর্ণ মনোযোগটা ঢেলে দিলেন এবং যথাযোগ্য বিচার-বিচেনার পরে তাদের নাম রাখলেন— টম, টাইগার, রকেট, বুলেট, টিটো, স্টালিন, টাইফুন অথবা টগর, জবা, সুবোধ, তুষার, পলাশ, পারুল প্রভৃতি। আর না হয় এই ধরনের অন্য কিছু।

এনিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে জাতীয়তা এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে এই যে হ-য-ব-র-ল অবস্থা চলছে তার একটি মাত্র কারণ আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। বলাবাহুল্য, এই অবস্থার পশ্চাতে বহু কারণই থাকতে পারে। তবে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং উদাসীনতাও যে তার একটি কারণ, নানাভাবে সেকথা আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অতএব জাতীয়তা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি, সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আভাস দিয়ে প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

ইসলাম সম্পর্কে আমি অতি সামান্য যেটুকু পড়াশোনা করেছি তা থেকে যা বুঝতে পেরেছি তা হলো :

ইসলাম আল্লাহর দেয়া পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা এবং ইসলাম তার অনুসারীদের এই জীবনব্যবস্থার মাধ্যমে আদর্শ মানুষ বা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তুলতে চায়।

'পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা' হিসেবে এর অনুসারীদের জীবনের ছোট বড় কোনও সমস্যার সমাধানের জন্যে অন্যের মুখাপেক্ষী বা অন্য কারো লেজুড়বৃত্তি করার প্রয়োজন যে হয় না, এই নামটি থেকে সে কথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

সংস্কৃতিকে সভ্যতার নির্যাস বলা হয়ে থাকে। যদি তাই হয় তবে ইসলাম তার অনুসারীদের আদর্শ মানুষ বা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তুলে তাদের দ্বারা যে সভ্যতার সৃষ্টি করতে চায় সেই সভ্যতার নির্যাস কী হতে পারে, প্রিয় পাঠকবর্গ একটু অভিনিবেশসহকারে সেকথা একবার ভেবে দেখুন; আর আল্লাহর দেয়া পরিপূর্ণ জীবনবিধানের সাহায্যে গড়ে ওঠা আদর্শ মানুষ বা আল্লাহর প্রতিনিধিদের দ্বারা যে সংস্কৃতি গড়ে উঠবে তা কত সুন্দর, কত শালীন, কত সুদৃঢ়, কত নিখুঁত এবং কত সুরুচিসম্পন্ন হতে পারে সেকথাও একবার চিন্তা করুন।

(ঙ) অন্যায়, অসত্য, উচ্ছৃঙ্খলতা ও চরিত্র-হীনতার দ্বারা সাময়িকভাবে কোনও স্বার্থসিদ্ধি করা সম্ভব হলেও তার পরিণাম যে অতি ভয়াবহ হয়ে থাকে, জ্ঞানী ও চিন্তাশীল কোনও ব্যক্তিই সেকথা অস্বীকার করতে পারেন না।

অথচ বাংলাদেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময় আমি অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করেছি যে, দেশবাসী বিশেষ করে পাকিস্তান-আন্দোলনের সময় আমার মানস-পটে ভেসে ওঠা সেই সোনার শিশুদের যারা সে সময় তরুণ ও যুবক হয়ে উঠেছে, তাদের লক্ষ্য করে কোনও নেতা নির্দেশ দিলেন, আইন অমান্য কর, উচ্ছৃঙ্খলতা চালিয়ে যাও এবং ধরো আর মারো।

কোনও নেতা তাদের জ্বালানো পোড়ানো, নির্মূল করা, ধ্বংস করা ও খতম করার সবক দিলেন।

কোনও নেতা লুটপাট, হত্যা-ব্যভিচার, বেয়াদবী ও বে-তমিজী প্রভৃতি চরমভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্যে উৎসাহ যোগাতে লাগলেন।

ফলে যে সোনার শিশুরা সোনার মানুষ তথা দেশের যোগ্য ও আদর্শ নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে এ আশায় আমি সেই থেকে বুক বেঁধে প্রতীক্ষা করছিলাম, তাদের একটা বড় অংশ আমার চোখের সম্মুখেই চোর, ডাকাত, খুনি, হাইজাকার, উচ্ছৃঙ্খল, চরিত্রহীন, মদ্যপায়ী প্রভৃতি হয়ে গড়ে উঠলো।

একথা বলতে বুক ফেটে যায় যে, আমার মানস-পটে ভেসে ওঠা সেই সোনার শিশুরা যাদের কল্যাণের আশায় আমি পাকিস্তান-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলাম এবং যাদের কল্যাণ কামনায় সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলাম, আমার সেই সোনার শিশুদের যারা বড় হয়ে 'গেরিলা পার্টি' বা 'মুক্তিবাহিনী' গঠন করেছিল, আমার এই বৃদ্ধ বয়সে তাদের কেউ কেউ আমাকে শায়েস্তা করার জন্যে কয়েকবার অফিসে হানা দিয়েছে, রাস্তা-পথে আমাকে লক্ষ্য করে টিটকারি বর্ষণ

করেছে, অপমানজনক কথায় আমার স্নেহ-প্রবণ এই অন্তরটাকে জর্জরিত করে তুলেছে। তাদের এসব করার একটি মাত্র কারণই আমি খুঁজে পেয়েছি। আর তাহলো, ইসলামের প্রতি আমার ভালবাসা!

এদের কার্যকলাপ কত বীভৎস, কত ক্ষতিকর এবং কত ভয়াবহ হয়েছিল, দেশবাসীর স্মৃতি থেকে এত সকালেই তা মুছে যায়নি বলে মনে করি। তবু কেউ যদি এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিতভাবে জানতে চান তবে তাঁকে আমার লিখিত 'ইতিহাস কথা কয়' নামক বইখানা অন্তত একবার পড়ে দেখতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের ঘটনাবলীকে আমাদের স্মৃতিতে জাগরুক রেখে আসুন, ক্ষণিকের জন্যে আমরা ইসলামের দিকে নজর ফেরাই। ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠায় এবং অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ইসলাম কী ভূমিকা পালন করতে বলেছে সেটা জানতে চেষ্টা করি।

* ইসলাম আক্রান্ত না হলে আক্রমণ করার অনুমতি দেয় না।

* যেহেতু অন্যায়-অসত্যের দ্বারা ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়; অতএব ন্যায় ও সত্যের দ্বারা অন্যায়-অসত্যের প্রতিরোধ করার শিক্ষাই ইসলাম দিয়ে থাকে।

* সমস্যা এবং বিরোধ যত বড় এবং যত প্রচণ্ডই হোক ইসলাম তা আপোসে মিটিয়ে ফেলতে বলে। আপোসের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে এবং যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে একমাত্র তখনই আক্রমণ প্রতিরোধ করার অনুমতি ইসলাম দিয়ে থাকে।

* যেহেতু ইসলামী সংগ্রাম আদর্শের সংগ্রাম অতএব ইসলামের পক্ষে যারা সংগ্রাম করবে তাদের আদর্শবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ, ধৈর্যশীল, স্থিরপ্রাজ্ঞ, মানবদরদী, ক্ষমাপরায়ণ অথচ কঠোর ও যুদ্ধনিপুণ অন্য কথায় প্রকৃত বীর বলতে যা বোঝায় তাই হতে হবে।

* বৃদ্ধ, শিশু, নারী, রুগ্ন, পৃষ্ঠ-প্রদর্শনকারী, পরাজিত শত্রু এবং কোনও শান্তিপূর্ণ নাগরিককে আক্রমণ, এমনকি সামান্যতম আঘাত দেয়াও ইসলামের দৃষ্টিতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

* যুদ্ধাবস্থায় বা অন্য কোনও সময় ফলবান বৃক্ষ ক্ষেতের ফসল, সাধারণের জলাশয়, গৃহপালিত পশুপাখি, কোনও উপাসনালয়, বিগ্রহ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সামান্যতম ক্ষতিসাধন ইসলাম ঘোরতর অন্যায় এবং কঠোরভাবে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে।

* যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি যত প্রতিকূল এবং যত ভয়াবহই হোক মুসলমান যোদ্ধাগণ সর্বদা ন্যায় ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধ করে যাবে। কোন

অবস্থায়ই সামান্যতম অন্যায়-অধর্মকে সমর্থন করবে না বা প্রশ্রয় দেবে না। এই হলো ইসলামসমর্থিত যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

অথচ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় এর কোনওটাই মানা হয়নি, বরং যুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে জাতির ভবিষ্যত আশা-ভরসার স্থল কিশোর-তরুণদের এসব নীতি-নিয়মবিরোধী কাজে প্রবলভাবে উৎসাহ যোগানো হয়েছে এবং এসব কাজে দক্ষতা প্রদর্শনকারীদের উদাত্ত কণ্ঠে প্রশংসা করা হয়েছে।

তারপর স্বাধীনতাসংগ্রামের শেষপর্যায়ে যখন মুসলমানদের একটি দল ইসলামরক্ষার নামে এবং অন্য দলটি শত্রু ধ্বংসের নামে নির্বিচারে নরমেধ যজ্ঞ চালিয়ে গেল এবং বিজয়ী ভারতীয়রা যখন মুসলমান এবং পাকিস্তান নামক ইসলামী রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে আদর্শ এবং অনুকরণীয় হবে বলে আমি, আমার মা এবং অন্যান্য হিন্দুদের কাছে বড় গলায় বলে আসছিলাম, সেই রাষ্ট্রের রক্ষক এবং বীর মুজাহিদ বলে পরিচিত লক্ষাধিক মানুষকে চরমভাবে লাঞ্ছিত-অপমানিত করে যুদ্ধবন্দী হিসেবে বেঁধে ভারতে নিয়ে গেল, তখন আমার মনের অবস্থা কী হয়েছিল সেকথা একবার ভেবে দেখুন।

ভেবে দেখুন, স্বাধীন মুসলমান-রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, বিলাস-ব্যসন আর চরিত্রহীনতার কথা। তাহলেই এটা আপনাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, আমার স্নেহশীলা জননীর উদাত্ত আহ্বান সত্ত্বেও তার মৃত্যুশয্যার পাশে শেষদেখা করার জন্যে কেন আমি যাইনি, যেতে পারিনি।

নূতন যুগের সূচনা

প্রিয় পাঠকবর্গ! এতক্ষণ একটানা শুধু হতাশা এবং দুঃখ-বেদনার কথাই বলে চলেছি। এবার আসুন! কিছু আশা ও আশ্বাসের কথা তুলে ধরি :

"আল্লাহ তাঁর দীন হেফাজত করবেন।" আল্লাহর এ ওয়াদা যে কত সত্য এবং কত নির্ভুল আবার নতুন করে এই বাংলাদেশের মাটিতে সেকথা প্রমাণ করার জন্যে একটা বিরাট ও আকস্মিক পরিবর্তন সাধিত হওয়ার কথা হয়তো আপনাদের সকলেরই জানা রয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম এবং তার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা এখন আর নেই। বর্তমানে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মতো বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরাও আজ স্বচ্ছন্দে এবং স্বাধীনভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করার সুযোগ পেয়েছে।

ইসলামের কথা বললে এখন আর আগের মতো কেউ প্রকাশ্যে ও দম্ভের সাথে নির্যাতন চালাতে সাহস পায় না। এর একটা বড় কারণ হলো, সরকার ও

এর সহকর্মীবৃন্দের মানসিকতার পরিবর্তন। বলাবাহুল্য, সুবিধাবাদীদের কোনও দিনই নিজস্ব কোনও মত বা ইচ্ছা থাকে না। প্রভুর ইচ্ছায়ই ওরা কীর্তন গায়।

সে যাহোক, আল্লাহর অসীম করুণায় এখন ইসলামকে তার যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার একটা বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সুযোগ সব সময় আসে না। অতএব, বর্তমান সুযোগের সদ্ব্যবহার না করা হলে চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে আসতে পারে। কেননা, যারা ইসলামের ধ্বংস চায় তারা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি সজাগ, অনেক বেশি সংঘবদ্ধ এবং অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে সুযোগ ও সময়ের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

প্রিয় পাঠকবর্গ! আপনারা অবশ্যই জানেন যে, মানুষকে অবস্থা বা পরিবেশের দাস বলা হয়ে থাকে।[১] কেননা সাধারণভাবে পরিবেশের ঊর্ধ্বে ওঠা কোনও মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। অবস্থার পরিবর্তনে মনের পরিবর্তন হওয়া যে খুবই স্বাভাবিক এ থেকে সেকথা অনায়াসেই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

তাই হতাশা ও অবসাদে ভেঙ্গে পড়া আমার এই মনটা অবস্থার পরিবর্তনে আবার নতুন করে জেগে উঠেছে। এ পরিবর্তন শুধু বাংলাদেশেই আমি লক্ষ্য করিনি, অন্যত্রও করেছি। কোথায় এবং কিভাবে এ পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করেছি অতঃপর সেই কথাটুকু বলেই নিবন্ধের ইতি টানছি।

গত বছর ১৯৭৮ সালের আগস্ট মাসে রাবিতা-এ-আলম আল-ইসলামী (Muslim World League)-র উদ্যোগে করাচীতে যে 'The First Asian Islamic Conference' অনুষ্ঠিত হয়, ইসলাম প্রচার সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে রাবিতা-এ-আলম আল-ইসলামী কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে উক্ত কনফারেন্সে যোগ দেয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল।

এখানে 'ইসলাম প্রচার সমিতি' সম্পর্কে দু'কথা বলা প্রয়োজন। অন্যথায় বিষয়টি বুঝতে পারা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে উঠবে না।

প্রিয় পাঠকবর্গের অবশ্যই মনে রয়েছে যে, সার্থকভাবে ইসলাম প্রচার এবং নওমুসলিমদের আশ্রয়, প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্যে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সংকল্প নিয়ে ১৯৪৬ সালে আমি সরকারি চাকুরি গ্রহণ করি।

চাকুরিজীবনের সুদীর্ঘ দুই যুগ ধরে একাজের জন্যে আমাকে প্রস্তুতিগ্রহণ করতে হয়েছে। অবশেষে ১৯৬৮ সালে সহকর্মী জনাব বদরে আলম এবং আরও কতিপয় নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানের সহযোগিতায় 'ইসলাম প্রচার সমিতি' নাম দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন করা হয়।

---

১. মুসলমান কখনো পরিবেশের দাস হয় না। বরং পরিবেশকে নিজেদের দাস বানায়। আর নিজেরা হয় একমাত্র আল্লাহর দাস।

চাকুরির ফাঁকে ফাঁকে প্রচারমূলক বই-পুস্তক লেখা, সভা-সমিতির অনুষ্ঠান, ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন প্রভৃতির মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ১৯৭০-এর গণ-আন্দোলনের ডামাডোলে কাজ চালানো সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আল্লাহর অপার অনুগ্রহে বর্তমান সরকারের আমল থেকে পূর্ণোদ্যমে সমিতির কাজ শুরু করা সম্ভব হয়েছে এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে সমিতির সদস্যবৃন্দ ও ইসলামপ্রিয় ভ্রাতা-ভগ্নিদের নিষ্ঠা, কর্ম-কুশলতা এবং অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলে আশাতিরিক্ত অগ্রগতিও সম্ভব হয়েছে।

তবে একথা দৃঢ়তার সাথেই বলা যেতে পারে যে, এতদুদ্দেশ্যে এই ধরনের এটাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সমিতির কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা সম্ভব নয়। অতঃপর আমার পূর্বকথার জের টেনে এখানে বলতে হচ্ছে যে, এই ইসলাম প্রচার সমিতির একজন অতিনগণ্য খাদেম হিসেবেই রাবিতা-এ-আলম আল-ইসলামী বা Muslim World League-এর আমন্ত্রণে The first Asian Islamic Conference-এ যোগদানের সুযোগ আমার হয়েছিল।

শুধু তাই নয় উক্ত বিশ্বসংস্থার সৌজন্যে আমি এবং দু'জন নওমুসলিমসহ এই সমিতির মোট পাঁচজন সদস্য সে বছর পবিত্র হজ্জ পালনের সুযোগও লাভ করেছিলাম।

এই উভয় স্থানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বহু মুসলমানের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ এবং আলাপ-আলোচনার সুযোগ আমার হয়েছিল। সকলের মধ্যেই নব-জাগরণের একটা জোয়ার আমি লক্ষ্য করেছি। তাদের প্রতিটি লোকের মধ্যে যে বিপ্লবী মানসিকতা, অদম্য উৎসাহ এবং সুদৃঢ় মনোবলের পরিচয় আমি পেয়েছি তা থেকে গভীর প্রত্যয়ের সাথে আমি বলতে পারি যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো যত শক্তিশালী এবং যত সংঘবদ্ধই হোক, ইনশাআল্লাহ্ ইসলামের এই নবজাগরণ তারা ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না।

বাংলাদেশী মুসলমানদের মনেও যে এই জাগরণের ঢেউ লেগেছে তার লক্ষণও ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও অবসরগ্রহণ না করে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছি এবং সর্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, হে দয়াল প্রভু! কবরে যাওয়ার পূর্বেই স্বচক্ষে যেন এ জাগরণ এবং তার মাধ্যমে গড়ে ওঠা নতুন যুগটিকে আমি দেখে যেতে পারি, এই সৌভাগ্য তুমি আমাকে দান কর। আমীন!

প্রভুর সন্ধানে

সংক্ষিপ্ত বাল্যপরিচয়

ফরিদপুর জেলার গোঁসাইর হাট উপজিলার দাসের জঙ্গল গ্রামের এক ভট্টাচার্য পরিবারে আমার জন্ম। পিতার নাম ছিল বাবু শশীকান্ত ভট্টাচার্য। জন্মের লগ্ন ও তিথি-নক্ষত্রাদি বিচার করে আমার নাম রাখা হয়েছিল 'সুদর্শন'।

বাপ-দাদারা খুবই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন বিধায় বাড়ির প্রতিটি ছেলে-মেয়ে যাতে নিষ্ঠাবান হয়ে গড়ে ওঠে সেদিকে তাঁদের প্রখর দৃষ্টি ছিল। কাজেই আশৈশব আমাকে যে ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যেই কাটাতে হয়েছিল, সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, আমার মনে প্রভু-সন্ধান-স্পৃহা জেগে ওঠার পশ্চাতে প্রভু সম্পর্কে অজ্ঞতা বা প্রভুর অবিদ্যমানতার প্রশ্ন ছিল না। কেননা, শৈশব থেকে প্রত্যহ বাস্তুদেবতা-রূপী শালগ্রাম শিলার পূজা হতে দেখেছি। বাড়িতে বিদ্যমান পুরুষদের নিত্যনৈমিত্তিক কর্তব্য হিসেবে আহ্নিকতর্পণ এবং বাণলিঙ্গের (শিবলিঙ্গ) পূজা করতে দেখেছি।

তাছাড়া নিষ্ঠাপরায়ণতার সাথে বেশ কিছুটা আর্থিক স্বাচ্ছল্য থাকার কারণে নিজেদের বাড়িতে বার মাসে তের পার্বণের অনুষ্ঠান হতে দেখেছি। কাজেই বলছিলাম যে, প্রভু সম্পর্কে অজ্ঞতা বা প্রভুর অবিদ্যমানতার প্রশ্ন আমার ছিল না।

উল্লেখ্য, শুধু চোখে দেখাই নয়, কানে শোনার মাধ্যমে প্রভু বা প্রভুদের পরিচয় লাভের যথেষ্ট সুযোগও সেই শৈশবকাল থেকেই আমার হয়েছিল। এ সম্পর্কে একটি মাত্র ঘটনার কথা তুলে ধরাই যথেষ্ট বলে মনে করি।

ভোরে শয্যাত্যাগের পূর্বে বাবা, মা এবং অন্যদের মুখে প্রত্যহই 'প্রাতঃশ্লোক' পাঠ করতে শুনেছি। সাধারণত ঠাকুরমা বা পিতামহীর সাথে আমি এবং আমার ছোটকাকা গঙ্গাজীবন ঘুমাতাম। ভোরে ঘুম থেকে জেগেই ঠাকুরমা মুখে মুখে শ্লোকটি পাঠ করতেন এবং আমাদেরও পাঠ করতে বলতেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই শ্লোকটি আমাদের উভয়ের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এরপর

থেকে অন্যদের মত ভোরে শয্যাত্যাগের পূর্বে নিজে নিয়মিতভাবে শ্লোকটি পাঠ করতাম; আর এত শ্রদ্ধা এবং নিবিষ্টতার সাথে পাঠ করতাম যে, আজ প্রায় ৫০ বছর পরেও শ্লোকটি হুবহু স্মৃতিতে গাঁথা রয়েছে এবং পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে স্মৃতি থেকে চয়ন করেই এখানে তা তুলে ধরছি :

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা-দুর্গাক্ষরদ্বয়ম,
আপদস্তস্যনশ্যন্তি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা ॥
ব্রহ্মা, মুরারী, ত্রিপুরান্তকারী, ভানু, শশী,
ভূমি, সূত, বুধশ্চ, গুরুশ্চ, শুক্র, শনি, রাহু,
কেতু কুর্বন্তি সর্বেমম সুপ্রভাত ।
অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তি, তারা, মন্দোদরী তথা
পঞ্চ-কন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম,
ইত্যাদি ।

অর্থাৎ 'সূর্যোদয়ের সাথে যেমনভাবে অন্ধকার দূরীভূত হয়, ঠিক তেমনই যে ব্যক্তি প্রভাতকালে 'দুর্গা' এ 'দু'টি অক্ষর স্মরণ করে, তার সকল বিপদাপদ নাশ হয়ে থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, সূর্য, চন্দ্র, ভূমি, সূত, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু এরা সকলে আমার প্রভাতকে সুপ্রভাতে পরিণত করুক। যে ব্যক্তি প্রত্যহ অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তি, তারা এবং মন্দোদরী এই পঞ্চকন্যাকে স্মরণ করে, তার মহাপাপও নাশ হয়ে থাকে'। মহাপাপ-নাশিনী এই পঞ্চকন্যার মোটামুটি পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলো :

(ক) অহল্যা : গৌতম মুনির স্ত্রী। সদ্যস্নাতা এবং আর্দ্র বস্ত্র পরিহিতা অবস্থায় আশ্রমে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে গৌতম-শিষ্য দেবরাজ ইন্দ্রের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে।

আর্দ্র বস্ত্রের মিথ্যা আবরণকে ভেদ করে উদগত যৌবনা অহল্যার রূপলাবণ্য বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ফুটে ওঠায় ইন্দ্রদেবের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে; তিনি গুরুপত্নী অহল্যার সতীত্ব হরণ করেন।

ত্রিকালজ্ঞ গৌতম মুনির কাছে একথা অজ্ঞাত থাকে না; তাঁর অভিশাপে অহল্যা প্রস্তরে পরিণত হন আর ইন্দ্রদেবের দেহে 'সহস্রযোনির' উদ্ভব ঘটে। এটা দ্বাপরযুগের ঘটনা। সুদীর্ঘকাল পর ত্রেতাযুগে ঈশ্বরের অবতাররূপে শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হলে তার পদস্পর্শে অহল্যার পাষাণত্ব অপনোদিত হয়।

পদ্ম পুরাণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬৯০ পৃঃ।

(খ) দ্রৌপদী : বিখ্যাত পঞ্চপাণ্ডব অর্থাৎ যুধিষ্ঠির, অর্জুন প্রভৃতি পাঁচ ভ্রাতার পত্নী।

(গ) কুন্তি : পাণ্ডুর স্ত্রী; বিবাহের পূর্বে সূর্যের ঔরসে কর্ণ নামক পুত্রের জন্ম; বিবাহিতা অবস্থায় ধর্মের (যমরাজ) ঔরসে যুধিষ্ঠির, বায়ুদেবের ঔরসে ভীম এবং দেবরাজ ইন্দ্রের ঔরসে অর্জুনের জন্ম হয়।

— অগ্নিপুরাণ, ১৩ অ:, ৮-১২ শ্লোক এবং মহাভারত।

(ঘ) তারা : বালী নামক বানরের স্ত্রী। বালীর সাথে ছোট ভাই সুগ্রীবের বিরোধ ছিল; সুগ্রীবকে হাতে পাওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীরামচন্দ্র বালীকে নিহত করেন, পরে বালীর স্ত্রী দেবর সুগ্রীবের হস্তগত এবং স্ত্রীরূপে ব্যবহৃত হয়।

— অগ্নিপুরাণ ৯ অ:, ১-৩ শ্লোক।

(ঙ) মন্দোদরী : রাক্ষস-রাজ রাবণের স্ত্রী।

অতএব একথা বুঝতে পারা সহজ যে, অন্য অনেকের মত আমাকেও জীবনের প্রাতঃকাল থেকেই প্রাতঃশ্লোকের মাধ্যমে প্রত্যহ এই দশটি গ্রহ-উপগ্রহ, তিনজন পুরুষ এবং ছয় জন নারী একুনে উনিশটি প্রভু বা উপাস্যের পবিত্র নাম সভক্তি স্মরণ করতে হয়েছে।

মোটকথা, সেই শৈশবকাল থেকেই দেখা এবং শোনার মাধ্যমে বহুসংখ্যক প্রভু বা উপাস্যের পরিচয় লাভের সুযোগ আমার হয়েছিল। তাই বলছিলাম যে, প্রভু বা উপাস্যের অভাব বা অদর্শন আমার মনে প্রভু-সন্ধানস্পৃহা জাগিয়ে তোলেনি, কি করে এই স্পৃহা জেগে উঠেছিল অতঃপর সেকথাই বলছি।

ঘটনার সূত্রপাত

রায়ের বাড়ির (জমিদার গোলকচন্দ্র রায়) পাঠশালায় পড়তে যেতাম। ডাকঘরও ছিল ঐ বাড়িতেই পাঠশালার সাথে। বাবা, ঠাকুরদাদা প্রভৃতির নামে বহু জায়গা থেকে পত্র আসতো। ব্যবস্থানুযায়ী বাড়ি ফেরার পথে ডাকঘর থেকে আমাদের ঠিকানায় লিখিত পত্রগুলো আমাকে গ্রহণ করতে হতো।

কৌতূহলবশে পথে চলতে চলতে পোস্টকার্ডে লেখা পত্রগুলো পড়তে চেষ্টা করতাম। প্রথমদিকে খুবই কষ্ট হতো। বানান করে করে কোনওমতে পাঠোদ্ধার করতাম। প্রতিটি পত্রের শীর্ষে লিখিত দেব-দেবীর নাম থেকেই শুরু করতাম। প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর নাম লিখিত থাকতো। আজও স্মৃতিতে গাঁথা রয়েছে এমন কতগুলো নাম নিম্নে তুলে ধরা হলো :

শ্রীশ্রী কালী শরণম, শ্রীশ্রী দুর্গা সহায়, নারায়ণ শরণং, গণেশায় নমঃ, প্রজাপতি শরণম, বাগদেবী শরণং, হরি সহায়, লক্ষ্মীমাতা শরণং, জয়মা সিদ্ধেশ্বরী, জয়মা জগদম্বা, হুংফট, ওঁ, ওম, শ্রীশঃ, শ্রীং, হং, রিং, ক্লিং ইত্যাদি।

কি জানি কেন হঠাৎ একদিন মনে প্রশ্ন জেগে বসলো, 'আমি বড় হয়ে যখন পত্র লিখবো তখন কোন নামটি ব্যবহার করবো। অর্থাৎ এতসব দেব-দেবীর মধ্যে কে বড় এবং সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য?'

কৌতূহলী মন নিয়ে একদিন ঠাকুরমাকে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেন— "এঁদের কেউই ছোট নয়, সকলেই বড় এবং সকলেই গ্রহণযোগ্য।" মনের খট্‌কা মিটলো না। তাই আবার প্রশ্ন করলাম— সবাই যদি বড় এবং গ্রহণযোগ্য হয় তবে আমিতো সবগুলোকে বাদ দিয়ে একটি নামই লিখবো, এমতাবস্থায় বাদ পড়া দেব-দেবীরা রাগ করবে না? "উত্তরে ঠাকুরমা বলেছিলেন— "ছেলে মানুষের এত কথা ভাল নয়, মন দিয়ে লেখাপড়া কর, বড় হয়ে যখন শাস্ত্র পড়বি তখন সবই জানতে পারবি।" অতঃপর ধমক খাওয়ার ভয়ে ঠাকুরমা বা বাড়ির অন্য কাউকে আর এ সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করিনি। মনের খট্‌কা মনে চেপে রেখে ঠাকুরমার কথামত পড়াশোনায় মন দিয়েছি।

পাঠশালার দু'জন পণ্ডিত। প্রধান কফিল উদ্দিন ঢালী, সহকারী অবনী মোহন দাশ। একজন মুসলমান; অন্যজন নমশূদ্র বা চাঁড়াল।

ছোট কাকা গঙ্গাজীবন বয়সে আমার চেয়ে ছ' মাসের ছোট। এক সাথেই পাঠশালায় ভর্তি হয়েছি। আমরা অবুঝ হলেও অভিভাবকেরা তো আর অবুঝ ছিলেন না? তাই ভর্তির দিনই বাবা পণ্ডিতদ্বয়কে লক্ষ্য করে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেন— "দেখ হে বাপু! আমাদের ছেলেদের গায় হাত তুলে জাত মারবে না, অপরাধ করলে আমাদের কাছে বলবে; শাস্তি দিতে হয় আমরাই দেব।"

বলা আবশ্যক যে, শৈশব থেকেই নানাভাবে, একথা জেনে আসছিলাম যে, "মুসলমানেরা ম্লেচ্ছ এবং ছোটলোক; ওদের আচার-বিচার নেই, ধর্ম-কর্ম নেই, অখাদ্য ভক্ষণ করে আর মাথা ফাটা-ফাটি, মামলা-মোকদ্দমা, মিথ্যা-সাক্ষ্যদান, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি হলো এদের কাজ।" মুসলমানবাড়ি অনেক দূরে, তাই মুসলমান দেখার সুযোগ ইতিপূর্বে আমার হয়নি। অর্থাৎ হেডপণ্ডিতসাহেবই ছিলেন আমার দেখা প্রথম মুসলমান।

প্রথম দিকে খুব ভয়ে ভয়ে থাকতাম। হেডপণ্ডিতসাহেবকে কোনও ছেলের ওপর রাগ করতে দেখলেই ভয়ে জড়-সড় হয়ে কাঁদতে শুরু করতাম। মনে হতো, এখনই বোধহয় মাথা ফাটাতে শুরু করবে!

আমার এই করুণ অবস্থার প্রতি একদিন পণ্ডিতসাহেবের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তিনি কাছে ডেকে আদর করতে থাকেন এবং কান্নার কারণ জানতে চান।

আমিও মুসলমান সম্পর্কে এতদিন যা শুনেছি সরলভাবে সেকথা তাঁকে জানাই এবং মাথা ফাটানোর ভয়ই যে আমার কান্নার কারণ সেকথাও বলে ফেলি। তিনি অত্যন্ত স্নেহের সাথে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আমাকে বলেন, "দূর বোকা! যারা ওসব করে তারা কি মুসলমান? তোমরা যেমন হিন্দু হয়েও হিন্দু চোর-ডাকাত প্রভৃতি ঘৃণা কর, আমরাও ঠিক তেমনই মুসলমান হয়েও তোমাদেরই মতো মুসলমান নামধারী চোর-ডাকাত প্রভৃতি ঘৃণা করি। মনে রাখবে, যারা খাঁটি মুসলমান তারা কোনও অন্যায়ই করতে পারে না। কাজেই

আজ থেকে কখনো মাথা ফাটানোর ভয় করবে না। দেখবে কেউ যদি তোমাদের মাথা ফাটাতে আসে আমি নিজের জীবন দিয়ে হলেও তোমাদের রক্ষা করবো। সেদিন থেকে শুধু মাথা ফাটানোর ভয়ই কেটে গিয়েছিল না, পণ্ডিতসাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মমতায়ও মন ভরে উঠেছিল।

ছোটকাকা ছিলেন হিংসুটে প্রকৃতির। তাই পণ্ডিতসাহেব কর্তৃক আমাকে আদর করতে দেখে তার মনে হিংসার উদ্রেক হয়েছিল এবং বাড়িতে ছুটে গিয়েই ঠাকুরমার কাছে ইনিয়ে-বিনিয়ে সবকথা তিনি বলে দিয়েছিলেন। এমনকি মাস্টারসাহেব যে আমাকে ছুঁয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ কাছে টেনে নিয়ে আদর করেছেন সেকথা বলতেও ত্রুটি করেননি।

মুসলমানপণ্ডিত আমাকে ছুঁয়েছেন একথা জানতে পেরে ঠাকুরমা আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, "হারে গোলাম! শিগগির যা, ঐ কাপড়-চোপড় নিয়েই ডুব দিয়ে আয়। আর খবরদার! কখনো মুসলমানকে ছুঁবি না। ওরা যদি ছুঁয়ে ফেলে তাহলে স্নান না করে ঘরে ঢুকবি না।" ঠাকুরমার কথায় স্নান অবশ্যই করেছিলাম; কিন্তু কেন স্নান করতে হলো সেটা বুঝে উঠতে পেরেছিলাম না।

জানি না, কেন পণ্ডিতসাহেব অন্য ছেলেদের তুলনায় আমাকে একটু বেশি স্নেহ করতেন। লক্ষ্য করতাম, আমার দিকে নজর পড়তেই তাঁর চোখে-মুখে কেমন একটা স্নেহের ভাব ফুটে উঠতো। অতএব, বাইরে ছোঁয়া-ছোঁয়ির ভয় থাকলেও ভেতরের মনটা আমার অজ্ঞাতেই তাঁর ধরা-ছোঁয়ার সীমানায় চলে গিয়েছিল।

এক জনকেই খুঁজতে চেষ্টা করবে?

পত্রশীর্ষে লিখিত দেব-দেবীদের নাম সম্পর্কে যে জিজ্ঞাসা ঠাকুরমার কথায় 'বড় হয়ে জানার জন্যে' এতদিন চেপে রেখেছিলাম, পণ্ডিতসাহেবের স্নেহের আবেশে তা আর চেপে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। একদিন বিষয়টা তাঁর কাছে খুলে বলায় তিনি কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। তাঁর প্রশ্ন এবং আমার উত্তর নিম্নরূপ ছিল—

পণ্ডিতসাহেব : তোমার বাড়ির কর্তা কে?

আমি : আমার ঠাকুরদাদা।

পণ্ডিতসাহেব : তিনি ছাড়া আর কেউ কর্তা আছে কি?

আমি : তা কি করে থাকবে? কর্তা বেশি হলে বাড়ির লোক কার কথা মানবে? বেশি কর্তা মানতে গিয়ে বাড়ির লোকের মধ্যে ঝগড়া লাগবে না? আর কর্তারাও তো কে বড় আর কে ছোট তা নিয়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে বসবেন!

পণ্ডিতসাহেব : এইতো সুন্দর বুঝতে পেরেছ। অতএব বুঝতেই পারছ যে, বাড়ির কর্তা একজনই হয়। দেশের রাজাও একজনই হয়ে থাকেন। বাপ মারা

গেলে তার ছেলেরা সবাই কর্তা হতে চায় বলে তখনই ভাই আর ভাই থাকে না— শত্রুতে পরিণত হয়। কর্তা বেশি হলে এটা হওয়াই স্বাভাবিক। আর এ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে, সারা পৃথিবীর কর্তাও একজনই; আমরা মুসলমানেরা সবকিছুর মূল হিসেবে একজন কর্তাকেই মানি।

আমার কথার প্রসঙ্গ তুলে তিনি একথাও বলেছিলেন যে, "আমি হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানি না। তবে মোটামুটি একথা জানি যে, এসব ধর্মমতে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা এবং মহাদেব সংহার কর্তা। অতএব তিনজনই বড়। একজনকে গ্রহণ করা হলে অন্য দু'জনকে অবহেলা করা হয়।"

"আবার মহাদেবের স্ত্রী দুর্গা, ছেলে গণেশ, মেয়ে সরস্বতী বা বাগদেবী। বাপকে বাদ দিয়ে স্ত্রী ছেলে-মেয়েদের কারো একজনের নাম লিখলে সেটা ভাল দেখায় না। স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের বাদ দিয়ে স্বয়ং মহাদেবের নাম লিখলে হয়তোবা তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। সবদিক দিয়েই মুশকিল। প্রভুর সংখ্যা বেশি হলে এমনটাই হয়ে থাকে। তবে আমার মনে হয়, তোমাদের শাস্ত্রেও এমন একজন প্রভুর কথা লেখা রয়েছে যিনি সর্বশক্তিমান এবং সকলের চেয়ে বড়। বড় হয়ে যখন শাস্ত্র পড়বে তখন সেই সর্বশক্তিমানকে খুঁজতে চেষ্টা করবে।" জানি না কেন এই বলেই পণ্ডিতসাহেব হঠাৎ আমার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, "আমি আশীর্বাদ করি তুমি যেন তাঁর সন্ধান পাও।"

অজ পাড়াগাঁয়ের দরিদ্র এবং অল্প শিক্ষিত সেই স্নেহশীল পণ্ডিতসাহেব বহু পূর্বেই গত হয়েছেন। পাঠশালায় পড়া শেষ করেই রংপুর চলে যেতে হয়েছিল বলে তাঁর সাথে আর দেখা করার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু সারাজীবন তাঁর মমতামাখা কথা, স্নেহভরা চোখ এবং আশীর্বাদী হাতখানার কথা আমি ভুলতে পারিনি, শুধু তাই নয়— আজও মনে হয় তাঁর সেই হাতখানা যেন অদৃশ্যভাবে আমার মাথার ওপর থেকে আশীর্বাদ বর্ষণ করে চলেছে।

দ্বিজত্ব লাভ— যাত্রা শুরু

ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেও এতদিন অর্থাৎ প্রথম জীবনের প্রায় তেরটি বছর শুদ্রই ছিলাম। কেননা, অন্নপ্রাসন চূড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি দশটি সংস্কার* না হওয়া পর্যন্ত কেউ ব্রাহ্মণ হতে পারে না। পূজার্চনা, আহ্নিক-তর্পণ, বেদপাঠ প্রভৃতির অধিকারও জন্মে না।

---

* আজন্ম জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।

— জন্ম থেকে সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত শূদ্রত্ব ঘোচে না; সংস্কার দ্বারা দ্বিতীয়বার জন্মলাভ হয় বলেই ব্রাহ্মণকে দ্বিজ বলা হয়ে থাকে।

— Classification of caste By Pandit Shundkor Nath, p. 18.

শাস্ত্রানুযায়ী স্ত্রী জাতির কোনও সংস্কার নেই। সুতরাং সারাজীবন তারা শূদ্রানীই থেকে যায়। ব্রাহ্মণ কন্যাদের বেলায়ও এই একই নিয়ম। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেও সারাটি জীবন তাদের শূদ্রানী সদৃশই থাকতে হয়। শূদ্রানীদের মত তাদেরও পূজার্চনা, আহ্নিক-তর্পণ, বেদপাঠ প্রভৃতির কোনও অধিকার নেই।*

শাস্ত্রানুযায়ী স্বামীই তাদের একমাত্র উপাস্য। তবে স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে তারা শিবলিঙ্গের পূজা করতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও নিয়ম বেঁধে দেয়া হয়েছে যে, যেহেতু স্বামী ছাড়া নারীর দ্বিতীয় কোনও উপাস্য নেই। অতএব স্বামী হিসেবেই শিবলিঙ্গের পূজা করতে হবে।+

সে যাহোক, শাস্ত্রকর্তা নিজে পুরুষ এবং ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং বুঝেসুঝেই ব্রাহ্মণ-সন্তানদের জন্যে সংস্কারের সুযোগ রেখেছিলেন, অন্যথায় আমাদেরও সারাজীবন শূদ্র হিসেবেই কাটাতে হতো।

দ্বিজত্ব লাভ করে বেশ খুশিই হয়েছিলাম। সাথে সাথে কিছুটা গর্ব যে বোধ করিনি তাও নয়। কিন্তু যখন বুঝলাম যে, বাধ্যতামূলকভাবে বেদমন্ত্রের মত কঠিন শ্লোক মুখস্থ করা, আহার-বিহারে স্বাত্তিকতা বজায় রাখা ছাড়াও নিয়মিতভাবে সন্ধ্যা, আহ্নিক ও তর্পণের বোঝা ঘাড়ে চেপে বসেছে, তখন খুশি এবং গর্বের আমেজ অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল।

দাশের জঙ্গল এবং তৎসন্নিহিত কতিপয় গ্রাম ছাড়াও রংপুর জিলার চিলমারি, বৌমারি, হরিপুর প্রভৃতি স্থানে আমাদের বহুসংখ্যক যজমানের বাস ছিল। অধিকাংশ যজমানের বাড়িতেই মাঝে মধ্যে এ পূজা, শ্রাদ্ধ, শান্তিস্বত্যয়ন

---

* নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মো ব্যবস্থিতঃ
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহানৃত মিতিস্থিতিঃ
— যেহেতু স্ত্রীলোকদের মন্ত্র দ্বারা জাতকর্মাদি সংস্কার হয় না, এজন্য নির্মল উহাদিগের অন্তঃকরণ হয় না এবং বেদস্মৃতিতে অধিকার নাই, এজন্য ইহারা ধর্মজ্ঞ হইতে পারে না এবং ইহাদিগের কোন মন্ত্রের অধিকার নাই। এজন্য পাপ হইলে মন্ত্র দ্বারা তাহা স্খলন করিতে পারে না; অতএব উহারা কেবল মিথ্যা পদার্থ। — মনুসংহিতা ৯ম অঃ, ১৮ শ্লোক

\+ বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুনৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচার্য্যঃ স্ত্রীয়া সাধব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্— যজ্ঞোন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম।
পতিং শুশ্রুষতে যেনতেন স্বর্গে মহীয়তে॥

অর্থাৎ—

পতি সদাচার-বিহীন, অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত বা বিদ্যাদি গুণহীন হইলেও সাধ্বী স্ত্রী সর্বদা দেবসেবার ন্যায় পতির সেবা করিবে। স্ত্রীলোকদিগের স্বামী ব্যতিরিক্ত যজ্ঞ নাই, স্বামীর অনুমতি ভিন্ন ব্রত নাই, উপবাস নাই, কেবল স্বামীর সেবা দ্বারাই স্ত্রী স্বর্গালোকে গমন করে।

— মনুসংহিতা ৫ম অঃ, ১৫৩-১৬৫ শ্লোক।

প্রভৃতি লেগেই থাকতো। তাছাড়া লক্ষ্মী এবং কার্ত্তিক পূজার মৌসুমে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই পূজার ধুম পড়ে যেতো।

ফলে ভাড়াটে ব্রাহ্মণের সাহায্য না নিয়ে নির্দিষ্ট লগ্নের মধ্যে এতগুলো পূজা সমাধা করা সম্ভব হতো না। বিশেষ করে ফরিদপুরের এই প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সেখানে গিয়ে যাজনিক কাজ সমাধা করা খুবই কঠিন ছিল। এমতাবস্থায় আমার বড় ঠাকুরদাদা (পিতামহের অগ্রজ) রংপুরের চিলমারিতে একটি বাড়ি নির্মাণ করে একরূপ স্থায়ীভাবেই সেখানে বসবাস করতে শুরু করেন।

প্রয়োজন হলে কিছু দিনের জন্যে আমার পিতা বা পিতামহ অথবা উভয়েই সেখানে গিয়ে থাকতেন। কোনও কোনও সময়ে আমাদেরকেও নিয়ে যেতেন।

উপনয়নের সময় আমরা চিলমারির বাড়িতেই ছিলাম। ছোট কাকা গঙ্গাজীবন, জ্যাঠাত ভাই রাখাল এবং আমি প্রায় সম-বয়সী ছিলাম এবং আমাদের উপনয়ন এক সাথেই হয়েছিল। ফলে বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যেই ব্রহ্মাচর্য্যের কঠোরতাকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল।

উপনয়নের মাধ্যমে দ্বিজত্ব লাভ হলেও দেবদেবী পূজার অধিকার অর্জিত হয় না। সেজন্যে প্রয়োজন হয় দীক্ষাগ্রহণের।

ভাড়াটে ব্রাহ্মণ রেখে বছর বছর যে আর্থিক ক্ষতিটা হচ্ছিল সেটা বন্ধ করার জন্যেও আমাদের যত শীঘ্র সম্ভব দীক্ষাদানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল লগ্ন নিয়ে। কেননা, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে দীক্ষাগ্রহণের উপযোগী লগ্নই ছিল না। অগত্যা তাড়াহুড়া করে খুব উপযোগী নয় এমন এক লগ্নে আমাদের দীক্ষা দেয়া হয়েছিল।

উপনয়নের পর থেকে আহ্নিক-তর্পণ তো বাধ্যতামূলকভাবে ঘাড়ে চেপেছিলই, দীক্ষাগ্রহণের পর নতুন করে শিবলিঙ্গের পূজাও ঘাড়ে চেপে বসলো। তাছাড়া মাঝে মধ্যে বাস্তুদেবতারূপী শালগ্রাম শিলার পূজাও করতে হতো।

উল্লেখ্য, কোনও দেব বা দেবীর পূজা হলে এক পর্যায়ে তাঁর ধ্যান বা রূপের কল্পনা করতে হয়। এ জন্যে পৃথক পৃথক ধ্যানের মন্ত্র রয়েছে এবং এই সব মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেব বা দেবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিধৃত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ শিবলিঙ্গের ধ্যান করতে গিয়ে চক্ষুমুদ্রিত করে যে মন্ত্রটি পাঠ করতে হয় স্মৃতি থেকে চয়ন করে অতঃপর সেটিকে তুলে ধরা হলো :

ঐং প্রমত্তং শক্তি সংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভং
কামবাণান্বিত দেবং সংসার দহণক্ষমং
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম॥

অর্থাৎ— লিঙ্গটি প্রমত্ত, শক্তিসংযুক্ত এবং বাণ নামে আখ্যাত (বাণলিঙ্গ) ও মহাপ্রভাসমন্বিত। এ দেব কামপরায়ণ, সংসার দহনে সক্ষম, শৃঙ্গারাদি রসে উল্লসিত এবং বাণ নামে আখ্যাত পরমেশ্বর।

উল্লেখ্য, নিত্য পূজার জন্যে মাটির তৈরি অঙ্গুষ্ঠ (বৃদ্ধাঙ্গুলী) পরিমাণ লিঙ্গই শাস্ত্র-সম্মত। এজন্যে পূজকের সংখ্যানুযায়ী প্রত্যহ কয়েকটি করে লিঙ্গ তৈরি করা হতো। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সধবা রমণীদের পূজার্চনার কোনও অধিকার নেই; স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা রমণীরা স্বামী-জ্ঞানে শিবলিঙ্গের পূজা করতে পারে।

সে কারণেই বাড়িতে অবস্থানরতা তিনজন বিধবার যে কোনও একজন (আমার এক পিশিমাতা যিনি ১৫-১৬ বছর বয়সে এবং দুই খুড়িমাতার একজন ২০-২১ এবং অন্যজন ২৫-২৬ বছরে বিধবা হন) এই লিঙ্গ তৈরির দায়িত্ব পালন করতেন।

খুড়িমাদ্বয় সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন বলে সাধারণত পিশিমাতাই একাজে এগিয়ে আসতেন। কোনও কারণে তিনি অনুপস্থিত থাকলে বড় খুড়িমা এ দায়িত্ব পালন করতেন। সাধারণত আমরা যখন মণ্ডপে বসে আহ্নিক তর্পণ শুরু করতাম পিশিমা সে সময়ে মণ্ডপের বারান্দায় বসে মাটি দিয়ে শিবলিঙ্গ তৈরি করতেন।

প্রাকৃতিক কারণে বড় খুড়িমা এবং পিশিমা উভয়কেই কয়েকদিন শিবলিঙ্গ তৈরি কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। ফলে অনভ্যস্তা ছোট খুড়িমাকে সে কয়দিন কাজ চালিয়ে নিতে হয়েছিল।

অভ্যাস না থাকায় প্রথম দিন তিনি কিছুটা ভুল করেছিলেন। ওদিক দিয়ে অতিক্রম করার সময়ে হঠাৎ ঠাকুরমার (বড় ঠাকুরমার অর্থাৎ আমার পিতার জ্যেঠিমা) নজর সেদিকে পড়েছিল এবং তিনি বলে উঠেছিলেন, "বৌমা! যোনি-পীঠটা তো ঠিক হয়নি। ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে তৈরি কর আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।" একথা শুনে ছোট খুড়িমা প্রশ্ন করেছিলেন "যোনি-পীঠ কোনটা?" ঠাকুরমা বলেছিলেন— "যেটার মধ্যে লিঙ্গ বসানো রয়েছে— কেন বিভিন্ন শিবমন্দিরে যেখানে পাথরের তৈরি বড় বড় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেখানে তুমি কি দেখনি যে কার মধ্যে এবং কিভাবে লিঙ্গ বসানো থাকে?"

কথাগুলো ছিল একান্তরূপেই দেববিগ্রহ সম্পর্কীয়। সুতরাং ভক্তিপুত মনে এবং অত্যন্ত সহজ-সরলভাবেই এগুলো উচ্চারিত হচ্ছিল। তাই শাশুড়ী এবং বিধবা পুত্রবধুর মধ্যে কথার আদান-প্রদানে লিঙ্গ, যোনি প্রভৃতি শব্দ কোনও বাধা বা সংকোচের সৃষ্টি করছিল না। কিন্তু এই আলোচনা থেকেই উভয়লিঙ্গ সংযুক্ত হওয়ার কথা আমি জানতে পারি এবং লিঙ্গের উৎপত্তি ও এই সংযুক্তির কারণ জানার একটা আগ্রহ বোধ করি।

আগ্রহ বোধ করলেও নিবিষ্ট মনে একাজ চালিয়ে যাওয়া ছিল আমার পক্ষে খুবই কঠিন। নিত্য-নৈমিত্তিক পূজার্চনাদি এবং স্বাভাবিক কাজ-কর্ম ছাড়াও অনেক সময়ে যাজনিক কাজের দায়িত্ব পালন করতে হতো। মাঝে মাঝে পড়াশোনারই ব্যাঘাত সৃষ্টি হতো। এমতাবস্থায় ধর্মীয় বই-পুস্তক সংগ্রহ, পঠন এবং কোনও সমস্যা দেখা দিলে কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সাহায্য গ্রহণ ইত্যাদির সময় করে নেয়া বলতে গেলে সম্ভবই হতো না। কাজেই বেশ কয়েক বছর ধরে আমাকে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়েছিল।

তবে যাজনিক কাজে অংশগ্রহণ করার ফলে পূজার্চনা এবং বহুসংখ্যক দেবদেবী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ যে আমার হয়েছিল এবং প্রভু সন্ধানের কাজে এটা যে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল সেকথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। অতঃপর আমার সেই অভিজ্ঞতার কিছুটা বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে :

সন্ধ্যা-তর্পণাদি ছাড়া প্রত্যহ আমাদের শিবলিঙ্গের পূজা করতে হতো। আর 'শালগ্রাম' শিলারূপী গোলপাথরের পূজাও মাঝে মাঝে করতে হতো।

শিব বা মহাদেব হলেন 'ধ্বংসকর্তা' আর বিষ্ণু হলেন 'পালনকর্তা'। উপাস্য হিসেবে উভয়েরই স্থান সর্বোচ্চ। সুতরাং তাঁদের পূজা যে করতে হবে সে সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু সে স্থলে তাঁদের একজনের সঙ্গে বিশেষ অন্যজনের পরিবর্তে গোলপাথরের পূজা করতে হবে কেন? স্বাভাবিকভাবেই মনে এই প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছিল।

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা থেকে জানতে পেরেছিলাম যে, ঋষিপত্নিদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঋষিগণ অভিশাপ দিয়েছিলেন বলেই মহাদেবের লিঙ্গ-পাত হয়েছিল।* আর শঙ্খচূড়ের স্ত্রী তুলসির সাথে ব্যভিচার করার ফলে তুলসির অভিশাপে ভগবান বিষ্ণুকে গোলাকার পাথরে পরিণত হতে হয়েছে এবং শালিগ্রাম নামক স্থানে এই ঘটনা ঘটে ছিল বলে ঐ পাথরের নাম হয়েছে শালগ্রাম-শিলা। ঐসব ধর্মগ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী একথাও জানতে পেরেছিলাম যে, বিষ্ণু পাথরে পরিণত হওয়ার পরে দেবতাদের ভয়ে তুলসি দেবী গাছ হয়ে ঐ শিলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন, পরে দেবতাগণ সবই জানতে পারেন এবং ঘোষণা করেন যে, 'প্রত্যহ' পূজার সময়ে এই শিলার বুকে এবং পৃষ্ঠে তুলসিপাতা সংযুক্ত করতে হবে। অন্যথায় ভগবান বিষ্ণুর পূজাই সিদ্ধ হবে না।+

সেই থেকে আজও শালগ্রাম শিলার বুকে এবং পৃষ্ঠদেশে (পাথরটি গোলাকার বিধায় ওপরিভাগে এবং নিম্নদেশে চন্দনের সাহায্যে এই পাতা সংযুক্ত

---

* স্কন্দপুরাণে, নাগর খণ্ড ৪৪১ পৃ. ১-১৬ শ্লোক।

+ দেবীভগবত : নমব স্কন্দ ৫৯৮ পৃঃ।

করা হয়ে থাকে) তুলসিপাতা সংযোগের ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, এসব ঘটনা জানার পর যদিও এই তথাকথিত ভগবানদ্বয়ের কারো প্রতিই আমার অন্তরে কোনও শ্রদ্ধাই ছিল না, তথাপি অভিভাবকদের ভয়ে বেশকিছু দিন এদের পূজার কাজ আমাকে চালিয়ে যেতে হয়েছে।

তবে মহাদেবের লিঙ্গ-পাতের যে ঘটনার কথা ওপরে তুলে ধরা হলো, এটা হলো লিঙ্গ-পূজা প্রবর্তিত হওয়ার ঘটনা।

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন থেকে যায় যে, বাণলিঙ্গ বলতে উভয়লিঙ্গের যুক্ত অবস্থাকে বোঝায়। এমতাবস্থায় এই যুক্ত অবস্থা ঘটলো কি করে? আর তার পূজাইবা করতে হয় কেন?

কয়েকটি ধর্মগ্রন্থেই এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। আগ্রহী-পাঠকগণ দেবী ভগবত, মার্কণ্ডের পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পাঠ করলে বিস্তারিত ঘটনা জানতে পারবেন।

শালীনতা রক্ষার জন্য সেসব ঘটনা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে না। তথাপি আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার স্বার্থে একান্ত বাধ্য হয়ে পাঠকবর্গের কাছে আমার এই অশালীন কাজের জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলতে হচ্ছে যে, এক সময় ভগবান মহাদেব যখন তাঁর পত্নী পার্বতীর সাথে মিলিত হয়েছিলেন তখন মহাদেবের উত্তেজনার ফলে পার্বতী মরণাপন্ন হন এবং প্রাণরক্ষার জন্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে থাকেন।

এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সুদর্শন চক্রের দ্বারা উভয় লিঙ্গকে কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পার্বতীর প্রাণরক্ষা করেন।

দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পূর্বে উভয়লিঙ্গ যুক্ত অবস্থায় ছিল; দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরও সেই অবস্থায়ই থেকে যায়। এই স্মৃতিকে জাগরুক রাখার জন্যেই বাণলিঙ্গ পূজার উদ্ভব ঘটানো হয়েছিল। আশা করি বুদ্ধিমান অনায়াসেই সেকথা অনুমান করতে পারছেন।

তবে কোনও সমালোচক যদি নেহাতই প্রশ্ন করে বসেন যে, এরূপ অঙ্গচ্ছেদ করার পরও কারো বেঁচে থাকা সম্ভব কি না? তাহলে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমি বলবো যে, এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। এমনকি হাজার হাজার বছর ধরে যেসব সম্মানিত ব্যক্তিরা বাণলিঙ্গ তথা এই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন সংযুক্তঅঙ্গের পূজা করে চলেছেন তাঁরাও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না।

কেননা, 'কেন'র উত্তর জানার কোনও প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেন না, ভাল কি মন্দ, সম্ভব কি অসম্ভব, শালীন কি অশালীন, যুগের উপযোগী কি অনুপযোগী অথবা এর ফলে বিশ্ববাসীর কাছে মুখ দেখানো যাবে কি যাবে না, তা নিয়েও তাঁদের কোনও মাথা ব্যথা নেই। 'ভক্তিভাজন পূর্বপুরুষগণ এটা করে গিয়েছেন'

আর অন্ধভক্তি বা অন্ধবিশ্বাসের ঘূর্ণিপাকেই এই সম্মানিত ব্যক্তিরা হাজার হাজার বছর ধরে ঘুরপাক খেয়ে চলেছেন।

অন্যতম ভগবান অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা বলে কথিত ভগবান ব্রহ্মার চরিত্রও যে এই শ্রেণীর শাস্ত্রকারেরা একইভাবে চিত্রিত করেছেন সেকথা সহজেই অনুমেয়। এ সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে বলে এখানে শুধু আভাসটুকু দিয়ে রাখা হলো।

তবে সাথে সাথে এ আভাসটুকুও দিয়ে রাখা প্রয়োজন যে, দেব-দেবীদের এসব কার্যকলাপকে অন্যরা যত গর্হিত এবং চরিত্রহীনতার পরিচায়ক বলেই মনে করুন না কেন, উল্লিখিত শাস্ত্রকার এবং একশ্রেণীর ভক্ত-বাবুদের তাতে কিছু যায় আসে না। কেননা, তাদের এ ধরনের কাজকর্ম সবই লীলাখেলার অন্তর্ভুক্ত; আর লীলাখেলায় যিনি যত বেশি পটু এদের বিবেচনায় তিনি তত বড় দেবতা।

যেহেতু তাঁদের মন-মানস এভাবেই তাঁরা গড়ে তুলেছেন। অতএব অদ্ভুত অবিশ্বাস্য এবং চমকপ্রদ কল্পকাহিনী রচনা ও রটনার মাধ্যমে অজ্ঞ-অশিক্ষিত মানুষদের তাক লাগানো এবং তাদের সম্মুখে দেব-দেবীদের আদর্শ সার্থকভাবে তুলে ধরার এ মহান প্রচেষ্টা থেকে তাঁরা যেকোনও অবস্থাতেই বিরত হবেন না নিশ্চিতরূপে সেটা ধরে নেয়া যেতে পারে।

তবে তাঁরা নিজেরা বিরত না হলেও জাগ্রত জনতার ধূমায়িত রুদ্র-রোষ যে অচিরেই তাঁদের কণ্ঠ অতি নির্মমভাবে চেপে ধরবে সুনিশ্চিতরূপেই সেকথা বলা যেতে পারে। আর ইতোমধ্যেই তার লক্ষণও বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অতএব, দেবতাদের মত এরাও যত খুশি ধর্ম নিয়ে তাদের এই লীলাখেলা চালিয়ে যেতে থাকুক, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর খুব বেশি প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। কারণ, "সেকালের মাথা আর একালের দেহ" নিয়ে যারা জন্মগ্রহণ করেন তাদের ব্যাপার-স্যাপারই ভিন্ন, আর তাই স্বাভাবিক। সে কারণেই এই ব্যক্তিদের সম্পর্কে মাথা ঘামানো যে বৃথা এবং পণ্ডশ্রম সেকথা পণ্ডিত ব্যক্তিরা একবাক্যে বলে গিয়েছেন।

হিন্দুরা নিজেদের একেশ্বরবাদী বলে দাবি করে থাকেন এবং সেই ঈশ্বর যে অজড়, অমর, স্বয়ম্ভু, সর্বশক্তিমান, সর্বপ্রদাতা, নিরাকার প্রভৃতি তাদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে সেকথারও যথেষ্ট উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু কার্যত সেই 'সর্বপ্রদাতা ও সর্বশক্তিমান' ঈশ্বরের স্থান হিন্দুসমাজে নেই। কল্পিত দেব-দেবীসমূহকে সেখানে ঠাঁই দেয়া হয়েছে। ওসব দেব-দেবীরা নিছক মানবীয় কল্পনারই ফসল কি না সেকথা ভেবে দেখার জন্যে তাদের স্বভাবচরিত্র, খাদ্যাখাদ্য, আচারাচরণ প্রভৃতির কিছুটা পরিচয় নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা হলো :

(ক) পরমব্রহ্মকে মুখে মুখে সর্বশক্তিমান এবং সর্বপ্রদাতা বলা হলেও কার্যত ধন-ধান্যাদির জন্যে লক্ষ্মী, বিদ্যার জন্যে সরস্বতী, পুত্রলাভের জন্যে ষষ্ঠী, বৃষ্টির জন্যে ইন্দ্র বা বরুণ, স্বাস্থ্যের জন্যে অশ্বিনী কুমারদ্বয়, শত্রুনাশের জন্যে কার্তিক, সিদ্ধিলাভের জন্যে গণেশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যের কল্পনা ও তাদের কাছে মাথানত করার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

(খ) একইভাবে সাপের ভয়ে মনসাপূজা, বজ্র-বিদ্যুতের ভয়ে ইন্দ্রের পূজা, যক্ষ্মার ভয়ে রক্ষাকালীর পূজা, নৌকাডুবির ভয়ে গঙ্গাপূজা, জ্বরের ভয়ে জ্বরাসুরের পূজা, কলেরা ও বসন্তের ভয়ে শীতলাপূজা, পাঁচড়া-চুলকানির ভয়ে ইটেকুমারের পূজা, অমঙ্গলের ভয়ে শনিপূজা প্রভৃতি অসংখ্য ভয়ের দেবতা সৃষ্টি করে এক অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের অসন্তুষ্টির ভয়কে মন থেকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে।

(গ) মহাদেব গাঞ্জা-ভাং ভালবাসেন, ভাং-এর শরবৎ ভালবাসেন, ত্রিনাথ, শ্রীকৃষ্ণ ননী-মাখনের লোভী, সত্যনারায়ণের লোভ ময়দা গোলা সিন্নির প্রতি, শনিঠাকুর কলা খেতে ভালবাসেন, ভদ্রকালী ভালবাসেন পায়েস-পরমান্ন, নারায়ণ নাড়ু খাওয়ার অভিলাসী, মা মনসা দুধের পিয়াসী— এমনিভাবে অসংখ্য লোভের দেবতা সৃষ্টি করে পূজক-ঠাকুরেরা নিজেদের লোভ চরিতার্থ করার এক চিরস্থায়ী সুযোগ করে নিয়েছে।

(ঘ) লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, সরস্বতীর রাজহাঁস, গণেশের ইঁদুর, দুর্গার সিংহ, মনসার সর্প, কার্তিকের ময়ূর, শ্রীকৃষ্ণের গরুড় পাখী, মহাদেবের ষাঁড় বা বৃষ, যমরাজের কুকুর, ইন্দ্রের হস্তী, গঙ্গার মকর, ব্রহ্মার পাতিহাঁস, বিশ্বকর্মার ঢেকী, শীতলার গাধা, এমনিভাবে দেব-দেবীদের ভিন্ন ভিন্ন যানবাহন থাকার কল্পনা করা হয়েছে।

আর যেহেতু যান-বাহন ছাড়া দেব-দেবীদের আগমন-নির্গমন সম্ভব নয়, অতএব তাঁদের পূজায় বসে যান-বাহনরূপী পেঁচা, ইঁদুর, কুকুর, সাপ, গাধা, বলদ, রাজহাঁস, পাতিহাঁস, প্রভৃতির পূজাও করতে হয়। ভক্তগৃহে দেব-দেবীদের আগমন সুনিশ্চিত এবং ত্বরান্বিত করার স্বার্থে এসব ইতর জীব-জন্তুর পূজা না করে কোনও উপায়ও নেই। এত দেব-দেবী এবং জন্তু-জানোয়ারের পূজা করতে এক অদ্বিতীয় পর ব্রহ্মের পূজার অবকাশইবা থাকে কোথায়?

এদের সকলের পরিচয় এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয় বলে নমুনাস্বরূপ প্রথমে কার্তিক ও তাঁর বাহন ময়ূর এবং পরে মহাদেবের বাহনরূপ বৃষের শাস্ত্রীয় পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলো। উল্লেখ্য, মহাদেবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইতোপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। কার্তিক মহাদেবের পুত্র। মহাদেব স্বীয় পত্নী পার্বতীর সাথে রমণকার্যে রত থাকাকালে অকস্মাৎ সেখানে দেবগণের আবির্ভাব ঘটায় তিনি গাত্রোত্থান করেন। ফলে বীর্য মাটিতে পতিত হয়। পৃথিবী তা ধারণে অক্ষম হয়ে অগ্নিতে

নিক্ষেপ করে। অগ্নি কর্তৃক বীর্য শালবণে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তা থেকে সেখানে এক শিশু জন্মলাভ করে। কৃর্তিকাগণ কর্তৃক প্রতিপালিত হওয়ায় উক্ত শিশুর নাম রাখা হয় কার্তিকেয় বা কার্তিক— (শিবপুরাণ)।

উক্ত কার্তিক কি কারণে ময়ূরের সাহায্যে পলায়ন করেছিলেন, ময়ূর-ময়ূরী কেন মুখে মুখে মিলিত হয়, কলাগাছ কার্তিকের বউ কেন হলো ইত্যাদি সম্পর্কে পুরাণ মহাভারতাদিতে যেসব ঘটনার বর্ণনা রয়েছে লজ্জাবশত তা এখানে তুলে ধরা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। উল্লেখ্য, মার্কণ্ডেয়, ব্রহ্ম বৈবর্ত প্রভৃতি পুরাণ, ভাগবত, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে এই জন্ম সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি দেব-দেবী সম্পর্কেই নানা ধরনের অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য এবং জ্ঞান ও যুক্তিবিরোধী কল্প-কাহিনী বিদ্যমান রয়েছে।

সর্বাধিক দুঃখজনক এবং বিস্ময়কর বিষয় হলো : হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সেই অন্ধকার যুগের এই কল্প-কাহিনীগুলো আজও সত্য বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে এবং কল্পিত দেব-দেবীদের পূজা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

০ যোহ সৌ মহেশ্বরো দেবো বৃষশ্চাপিস এবহি।
চতুষ্পাদৌ ধর্ম্মরূপো নীলঃ পঞ্চমুখো হরঃ ॥
যস্য সন্দর্শনাদেব বাজপেয় ফলং লভেৎ।
নীলেচ পুজিতে যস্মিন পুজিতং সকলং জগৎ ইত্যাদি।

অর্থাৎ— যিনি দেব মহেশ্বর তিনিই এই বৃষ। তার নীল (বৃষ) চতুষ্পদ ধর্মরূপী বৃষই পঞ্চমুখ হর (মহাদেব— লেখক)। তার দর্শনমাত্রে বাজপেয় ফল লাভ হয়। নীলের (নীল রং বৃষের) পূজা করিলে সমস্তজগতই পূজিত হয়। নীলকে স্নিগ্ধ গ্রাস প্রদান করলে জগৎ আপ্যায়িত হয়। নীলদেহে সর্বদা শ্রীমান বিশ্বব্যাপী জনার্দন (বিষ্ণু— লেখক) বাস করেন। ঐ নীল সর্বদা সনাতন বেদমন্ত্রের দ্বারা অর্চিত হয়ে থাকে।

ঋষিগণ বললেন, "হে নীল! তুমিই বিশ্বপালকগণের পালক এবং সনাতন। তুমি বিঘ্ন-হর্তা, জ্ঞানদ, ধর্মরূপী, মোক্ষদায়ক, ধনদ, শ্রীদ, সর্বব্যাধি নিসূদন, জগৎ-সুখবিধায়ক, কনকপ্রদ, সকলের তেজধান, সৌরভেয় ও মহাবল। তুমি শৃঙ্গাগ্রে পার্বতীসহ কৈলাস পর্বত ধারণ করেছ। তুমি দেবস্তুত্য, বেদময় বেদাত্মা,... ।"

"হে দেব! তুমি বৃষরূপী ভগবান। যে ব্যক্তি তোমার প্রতি পাপাচারণ করে সে নিশ্চয়ই বৃষল এবং রৌরব নরকে গমন করে পচ্যমান হয়। যে তোমাকে পদ দ্বারা স্পর্শ করে সে গাঢ় বন্ধনপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষুৎক্ষাম ও তৃষ্ণিতভাবে নরক- যাতনা ভোগ করে থাকে— ইত্যাদি" —স্কন্দ পুরাণ : নাগর খণ্ড, ৩৫৯ অঃ ৫০-৭০ শ্লোক।

সুবিজ্ঞ শাস্ত্রকার যেখানে বাহন এবং বাহিতের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকার কথা স্বীকার করেননি, অর্থাৎ স্বয়ং বাণেশ্বর বা মহাদেবকেই ষাঁড় বা বৃষ বলে উল্লেখ করেছেন, সেখানে আমাদের মত অধম ব্যক্তিদের এ সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করা সমীচীন হতে পারে না। তবে আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি যে, যেখানে ষাঁড় বা গরু এভাবে পূজিত হয়ে থাকে এবং যেখানে স্বয়ং মহাদেবই ষাঁড় বলে বিবেচিত হন, সেখান থেকে পরম ব্রহ্মের নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানই সম্ভব এবং স্বাভাবিক।

(ঙ) মহাদেবের অস্ত্র ত্রিশূল, শ্রীকৃষ্ণের গদা ও সুদর্শন চক্র, কার্তিকের তীর-ধনুক, দুর্গার খড়গ, ইন্দ্রের বজ্র, ভীমের গদা, বলরামের লাঙ্গল, পরশুরামের কুঠার, মনসার সর্প, শনির কুদৃষ্টি প্রভৃতি বহুসংখ্যক সশস্ত্র দেব-দেবীর কল্পনা করা হয়েছে এবং তাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের পূজাও অপরিহার্য করা হয়েছে।

(চ) বেলগাছে শিবঠাকুর, তুলসিগাছে নারায়ণ, তমালগাছে শ্রীকৃষ্ণ, বট-অশ্বত্থে হর-পার্বতী, কলাগাছে কলাবউ (কার্তিকের স্ত্রী) পুরীতে জগন্নাথ, কাশীতে বিশ্বেশ্বর; কালীঘাটে কালীমাতা, কামাক্ষায় সতীর অঙ্গ, বৃন্দাবনে গোপীগণ, মথুরায় দেবকী নন্দন প্রভৃতিরা হলেন স্থানীয় দেবতা। এইসব গাছ-বৃক্ষ এবং স্থানগুলোও উপাস্যের মর্যাদা লাভ করেছে এবং উপাসনাও পেয়ে আসছে। এমতাবস্থায় অর্থাৎ গাছ-বৃক্ষে, নদ-নদীতে, পাহাড়-পর্বতে, এখানে-সেখানে যাদের এত উপাস্য আর এত প্রভু বিদ্যমান সারা বিশ্বের জন্যে একজন মাত্র প্রভু থাকার কথা তারা মেনে নেবেন কোন দুঃখে?

(ছ) গণেশের পেট মোটা ও হস্তীমুণ্ড, মহাদেবের চোখ তিনটি, ব্রহ্মার চারটি, মুখ-হাতও চারখানা, শ্রীদুর্গার দশ হাত, রাবনের দশ মাথা, চাঁদের যক্ষ্মাব্যাধি, শিব ঠাকুরের মাথায় জট, ধুম্রলোচনের ধোঁয়াটে চোখ, শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ শ্যাম, মা কালীর রং কালো, মহাদেবের সাদা রং, ব্রহ্মার দেহ রক্তাভ, ইন্দ্রের দেহে সহস্র যোনি, অহল্যার প্রস্তরদেহ, শালগ্রামের গোল চেহারা, অষ্টচক্র মুনির দেহ আট স্থানে বাঁকা। প্রশ্ন হলো— এত রং বেরং-এর উপাস্য থাকতে এই ভক্তবৃন্দের কাছে রূপহীন কায়াহীন পরম ব্রহ্মের কি করে ঠাঁই হতে পারে?

(জ) পরম ব্রহ্মকে অজড়, অমর, ইচ্ছাময়— সর্বশক্তিমান বলা হয়েছে। আবার সাথে সাথে তাঁকে ঈশ্বর, ভগবান, অগ্নি, সূর্য, বায়ু, বরুণ প্রভৃতিও বলা হয়েছে। কোনও কোনও মানুষকেও 'স্বয়ংব্রহ্ম' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর মানুষও যে ব্রহ্ম হতে পারে সে কথারতো বহু স্থানেই উল্লেখ রয়েছে।

অথচ অগ্নি, সূর্য, বরুণ, মানুষ এসবের কোনওটাতো অজড়, অমর ইচ্ছাময়, সর্বশক্তিমান নয়-ই, ঈশ্বর-ভগবানদের একজনও যে ওসব গুণের অধিকারী ছিলেন অন্তত ধর্মশাস্ত্রের বর্ণনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(ঝ) ভগবান বা ঈশ্বরকে অজড়, অমর ইচ্ছাময়, সর্বশক্তিমান এবং সর্বত্র বিরাজমান বলা হয়েছে। আবার সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন কার্য-সম্পাদনের জন্যে তিনি মাছ, কচ্ছপ, শূকর, নৃসিংহ (নর + সিংহ), বামন প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হন বা অবতারত্বগ্রহণ করেন। অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ অবতরণ করা বা নেমে আসা।

একথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তিনি জড়পদার্থ এবং মরণশীল নন বলে তাঁকে অজড় ও অমর বলা হয়। আর তাঁর অসাধ্য কিছু না থাকা এবং তিনি সকল সময়ে সকল স্থানে বিরাজমান রয়েছেন বলেই তাঁকে যথাক্রমে ইচ্ছাময়, সর্বশক্তিমান এবং সর্বত্র বিরাজমান বলা হয়ে থাকে।

এমতাবস্থায় সামান্য কাজ সম্পাদনের জন্যে সেই মহান স্রষ্টার পৃথিবীতে নেমে আসা বা অবতরণ করা, মাছ, কচ্ছপ, শূকর প্রভৃতি রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ[১] ত্রিপাদ ভূমি লাভের জন্যে বামনরূপে বলী রাজাকে ছলনা করা,[২] শূকররূপে পৃথিবীর গর্ভে নরকাসুরের জন্মদান[৩] এসব কি করে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে?

আর এসব অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনার মধ্যে যদি নিগূঢ় কোনও তত্ত্ব থেকেই থাকে, তবে অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে তা প্রচার করেইবা কি লাভ? এসব নিগূঢ় তত্ত্বের পরিবেশকদের মনে রাখা উচিৎ যে, অজ্ঞ জনসাধারণ হলো সরল বিশ্বাসী এবং তত্ত্ব নিয়ে মত্ত হওয়ার মত সুযোগও তাদের নেই।

(ঞ) এমনিভাবে ছোট বড় মিলে উপাস্যদের সংখ্যা তেত্রিশ কোটিতে নিয়ে ঠেকানো হয়েছে এবং তাদের অপরিপক্ক মন-মস্তিষ্ক-প্রসূত এসব তথাকথিত উপাস্যদের জনসাধারণ যাতে সত্য এবং অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে বাধ্য হয় সেজন্যে নানা ধরনের বহুসংখ্যক ফাঁদ তাঁরা পেতে রেখেছেন। এসব ফাঁদেরই একটি হলো "ত্রিত্ববাদ"— যে সম্পর্কে ইতোপূর্বে আভাস দেয়া হয়েছে।

অন্য 'বাদ'গুলোর আধুনিক নাম হলো— দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, সাকারবাদ, জড়বাদ, প্রকৃতিবাদ, প্রতীকবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, শূন্যবাদ, পৌরোহিত্যবাদ, গুরুবাদ, পৌত্তলিকতাবাদ, অহংবাদ, সোহহংবাদ, মায়াবাদ, অবতারবাদ, সন্তানবাদ, বৈরাগ্যবাদ, বর্ণাশ্রমবাদ, বর্ণবাদ, গোত্রবাদ, ব্রহ্মবাদ, বৈষ্ণবাদ, অঘোরবাদ, নির্বাণবাদ, জন্মান্তরবাদ, লীলাবাদ, অংশবাদ প্রভৃতি।

অজ্ঞ জনসাধারণকে এইসব বাদ-এর ফাঁদে ফেলে নির্বিবাদে এবং যথেচ্ছভাবে শাসন ও শোষণের কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

১। অগ্নি পুরাণ ৩য় অঃ ১-৭ পৃঃ।

২। পদ্ম পুরাণ ৩৫৬ পৃঃ ৩০ অঃ ১-১০ শ্লোক।

৩। অগ্নি পুরাণ ৪র্থ অঃ ১-৫ শ্লোক।

তবে একথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, হাজার হাজার বছর পূর্বে গড়ে ওঠা এসব কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসসমূহ শুধু ভারতবর্ষ এবং শুধু হিন্দু-সমাজ কর্তৃকই বংশানুক্রমিকভাবে চালু রাখা হয়েছে একথা মনে করা হলে প্রকাণ্ড ভুল করা হবে। কেননা গোটা পৃথিবীর প্রায় দেশে এবং প্রায় সকল সমাজেই এই অভিশাপ বিরাজমান থাকার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এ সম্পর্কে প্যানডোরার সেই অদ্ভুত বাক্স এবং জুপিটার, মার্স, ভেনাস, ওসিয়্যানস, নেমেসিস, মিনার্ভা, মিউজেস, পসাইডোন, ওডেন, ভেস্টা, থর, লীড্যা, হবারে, হেসিওস, উতু, বারবার, অসেলো, নাটসেস, ইসকাস প্রভৃতি বহুসংখ্যক দেব-দেবীর নাম করা যেতে পারে।

অবশ্য এ সংখ্যা তেত্রিশ কোটি নয়। তবে দেব-দেবীদের আকার-প্রকার এবং গুণ-গরীমা সম্পর্কে অদ্ভুত-অবিশ্বাস্য কল্প-কাহিনী রচনায় হিন্দুদের টেক্কা দিয়ে এই ক্ষতি ওরা পুষিয়ে নিয়েছেন।

অতএব এসব কুসংস্কার এবং অন্ধ-বিশ্বাসের দিক দিয়ে ভারতবর্ষ এবং হিন্দুসমাজের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এবং সমাজের বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। পার্থক্য হল, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য দেশে এবং সমাজে এ অভিশাপ টিকে থাকতে পারেনি। অথবা বিদায়ের পথ খুঁজছে; আর প্রাচীন সভ্যদেশ, প্রাচীন সভ্যজাতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত উন্নত হয়েও হিন্দুসমাজ আজ পর্যন্ত এই অভিশাপ আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

শুধু তাই নয়, এগুলোকে স্বর্গীয় আপ্তবাক্য, অপৌরষেয় এবং অপরিবর্তনীয় বলে প্রমাণ করার জন্যে তাঁদের অনেকেই নিজেদের মেধা, বুদ্ধি এবং কর্মশক্তিকে একনিষ্ঠভাবে নিয়োগ করেছেন এবং করে চলেছেন। এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, প্রাচীন সভ্যজাতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতির দিক দিয়ে এত উন্নত হওয়ার পরে হিন্দুসমাজ কি কারণে আজও এসব কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসের অভিশাপ বহন করে চলেছে? এর আসল গলদটা কোথায়?

হিন্দুসমাজের বিশ্বাস্য তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেব ছাড়াও ভগবান বা ঈশ্বর রয়েছেন, আর তাদের সংখ্যা প্রচুর। ব্রহ্ম বা পরম ব্রহ্মকে একক, অদ্বিতীয়, স্রষ্টা, পালনকর্তা প্রভৃতি বলা হলেও ওপরোক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবকেও ব্রহ্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে; অনেক মুনি ঋষিকেও 'সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ' বলা হয়ে থাকে। বেদ-পারগ ব্রাহ্মণমাত্রই যে ব্রহ্ম হতে পারে সেকথা বার বার বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় কে যে আসল প্রভু আর কে যে নয়, বহু চেষ্টা করেও সেকথা বুঝতে পারা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

যিনি একক কি করে তাঁর দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি থাকতে পারে? স্রষ্টা ও সৃষ্ট, স্থূল ও সূক্ষ্ম, অসীম ও সসীম কি করে এক এবং একাকার হয়ে যেতে পারে সেকথাও আমি বুঝতে সক্ষম হইনি।

আসল গলদ যে কোথায় আশা করি এই আলোচনা থেকে তা বুঝতে পারা সহজ হবে। তবে কোনওপ্রকার ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি যাতে না হয়, সেজন্যে পুনরায় এখানে সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমাকে বলতে হচ্ছে যে, এসব গলদের জন্যে কেউ যদি গোটা হিন্দুসমাজকে দায়ী বলে মনে করেন তবে প্রচণ্ড ভুল করা হবে।

আর্যদের বর্ণ-বিভাগ ভারতবর্ষে আগমনের পরবর্তী ঘটনা। কেননা, এদেশের পরাজিত এবং আত্মসমর্পণকারী আদিম অধিবাসীদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যেই শূদ্রবর্ণের উদ্ভব ঘটাতে হয়েছিল। অতএব বর্ণ-বিভাগ যে ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের পরবর্তী ঘটনা, অনায়াসে সেকথা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

আর্যদের ভারতে আগমন এখন থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর পূর্বে ঘটেছিল বলে অনেকে মনে করেন। আর বর্ণ-বিভাগের অন্তত দু'হাজার বছর পরে 'বর্ণ-বিভাগ'কে 'জাতি বিভাগ' বলে অভিহিত করা হয়েছিল বলে ধরে নিলেও বৈষম্য সৃষ্টি এবং ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক মূর্তি-পূজার প্রচলন ঘটানোর কাজকে তার অব্যবহিত পরবর্তী সময় অর্থাৎ প্রায় হাজার বছর পূর্বের ঘটনা বলে ধরে নিতে হয়।

অতএব প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে এবং একটি বিশেষ মহল কর্তৃক যে কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার জন্যে গোটা হিন্দুসমাজ দায়ী হতে পারে না এবং সেই বিশেষ মহলটির পরবর্তী বংশধরদের দায়ী করারও কোনও যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

তাছাড়া শুধু হিন্দুসমাজই নয়, ওপরোক্ত বিশেষ মহলটির পরবর্তী বংশধর অর্থাৎ বর্তমানের ব্রাহ্মণসমাজও যে সেই ঘটনার নির্মম এবং অসহায় শিকারে পরিণত হয়ে অপরিসীম দুর্ভোগ ভোগ করে চলেছে তার বাস্তব প্রমাণও আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে।

এখানে বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে যে, বেদে ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সূর্য, অগ্নি, প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ থাকলেও ওসব বা অন্য কোনও দেবতার মূর্তি গড়া বা ফুল-চন্দন ও ভোগনৈবিদ্য দিয়ে সেই মূর্তির পূজা করার সমর্থন সূচক একটি মন্ত্রও বেদের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে, বেদের যুগে অন্তত যতদিন বেদ রচনার কাজ চলছিল ততদিন মূর্তি-পূজার উদ্ভবই ঘটেনি। অতএব বৈদিক যুগেরও বহু

পরবর্তী সময়েই যে মূর্তি-পূজার উদ্ভব ঘটানো হয়েছে নিঃসন্দিগ্ধরূপে সেকথা বলা যেতে পারে।

একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজে বুঝতে পারা যাবে বলে আশা করি।

হিন্দুদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বেদের বর্ণনা থেকে জানা যায় : ভগবান তাঁর পবিত্র মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পদযুগল থেকে শূদ্র জাতির সৃষ্টি করেছেন। যথা :

ব্রাহ্মণোহস্য মুখ মাসমীৎ বাহু রাজন্যো কৃতঃ
উরুতদস্য যদবৈশ্যঃ পদ্ভ্যাংশূদ্রো অজায়ত।

— যজুর্বেদ ৩১ অঃ ১১ মন্ত্র

ভগবানের পবিত্র মুখ থেকে সৃষ্ট বিধায় ব্রাহ্মণেরা বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়ে আসছেন। এখানে 'বর্ণশ্রেষ্ঠ' এ জন্যেই বলা হলো যে, প্রথমে এই বিভাগকে 'বর্ণ-বিভাগ' বলা হতো। পরবর্তী সময়ে এই 'বর্ণ-বিভাগ'কেই 'জাতি-বিভাগ' বলে চালিয়ে দেয়া হয়।

সে যাহোক, ভগবানের দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে সৃষ্টি হওয়ার কারণে এদের পরস্পরের গুণ এবং মর্যাদা যেমন ভিন্ন ভিন্ন হয়েছিল তেমনি সেই গুণ এবং মর্যাদানুযায়ী এদের জীবিকার জন্যেও ভিন্ন ভিন্ন কর্ম নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল। যথা :

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণ নাম কল্পয়ৎ।

— মনুসংহিতা ১০ অঃ ৭৫ শ্লোক

অর্থাৎ— ব্রাহ্মণদের জীবিকানির্বাহের জন্যে অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ— এই ছয়টি কর্ম কল্পিত হয়েছে।

এখানে শুধু ব্রাহ্মণদের সম্পর্কেই বলা হবে বিধায় অন্য তিন বর্ণ বা জাতির কর্ম সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হলো না।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই বর্ণ-বিভাগের নির্দেশ যাতে সকলের দ্বারা অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং সত্যতার সাথে প্রতিপালিত হয় অর্থাৎ কোনও বর্ণ বা জাতির সীমালংঘন করে অন্য বর্ণ বা জাতির বৃত্তিগ্রহণ না করে, শাস্ত্র কর্তৃক সে নির্দেশও অতি কঠোরভাবে প্রদত্ত হয়েছে। যথা :

বান্তা শ্যুল্কা মুখঃ প্রেতো
বিপ্রো ধর্ম্মাৎ স্বকাচ্চ্যুতঃ

- মনুসংহিতা ১২ অঃ ৭১ শ্লোক

অর্থাৎ— ব্রাহ্মণ স্বকর্ম-ভ্রষ্ট হইলে (মৃত্যুর পরে) ছর্দিত ভক্ষক উল্কামুখ প্রেত অর্থাৎ আলেয়া হয়।

শুধু মৃত্যুর পরে বা পারলৌকিক জীবনেই নয়, ইহজীবনেও যে স্বকর্মভ্রষ্ট ব্যক্তিকে জাতিচ্যুত অর্থাৎ পতিত ও ঘৃণার পাত্র হতে হবে, শাস্ত্র কর্তৃক বারবার সেকথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

এখানে একটি কথা না বলা হলে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থেকে যাবে! তাই বলতে হচ্ছে :

আমরা জানি, সমাজের সকল মানুষের প্রজ্ঞা, প্রতিভা, কর্মশক্তি, পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতি সমান বা একই রূপ হয় না। ফলে সকলের পক্ষে সকল কাজ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর তা করা হলে সমাজে যে নানারূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে থাকে তার বাস্তব অভিজ্ঞতাও আমাদের রয়েছে।

সে কারণেই সমাজে কর্ম-বিভাগের প্রয়োজন হয়ে থাকে। আসলে আর্যদের এই 'বর্ণ-বিভাগ' 'কর্ম-বিভাগ' ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না।

এমন বহু প্রমাণই বিদ্যমান রয়েছে যে, বর্ণ-বিভাগের পর উক্ত চারটি বর্ণের মানুষই অবস্থার প্রেক্ষিতে নিজ বর্ণের কাজ পরিত্যাগ করে ভিন্ন বর্ণের বৃত্তিগ্রহণ করেছেন। এভাবে অনেক ব্রাহ্মণ যে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি নিম্নবর্ণের এমনকি কোনও কোনও শূদ্রও যে নিজ নিজ যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার বলে উচ্চবর্ণে উন্নীত হয়েছেন তেমন প্রমাণেরও অভাব নেই।

এদিক দিয়ে বিচার-বিবেচনা করলে আর্যদের এই বর্ণ-বিভাগ যে খুবই যুক্তিসঙ্গত ছিল সেকথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

কিন্তু অতীব দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, পরবর্তীকালে নিজেদের প্রভুত্ব ও প্রাধান্য স্থায়ী ও নিরঙ্কুশকরণ অথবা অন্য যে কোনও অভিপ্রায়েই হোক ব্রাহ্মণগণ এই 'বর্ণ-বিভাগ'কে 'জাতি-বিভাগ' বলে চালিয়ে দেন এবং কোনও জাতি কর্তৃক অন্য জাতির বৃত্তিগ্রহণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন।

এতদ্বারা তাঁরা যে নিজেদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে কত বড় সর্বনাশের বীজ বপন করে যাচ্ছেন হয়তো তখন সেকথা ভেবে দেখারও কোনও প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেননি।

এই সর্বনাশের বীজ কিভাবে বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছে এবং পরবর্তী ব্রাহ্মণ সন্তানেরা কিভাবে এই সর্বনাশের করুণ শিকারে পরিণত হয়েছেন এবং হয়ে চলেছেন অতঃপর অতি সংক্ষেপে সেই চিত্রই তুলে ধরা হবে।

(ক) একথা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয় যে, পরবর্তীকালে বংশ-বৃদ্ধির ফলে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে সমাজের ক্ষুদ্র পরিসরে যজন-যাজনরূপ কর্মের সংস্থান অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

(খ) নানা কারণে এই হাজার হাজার ব্রাহ্মণ সন্তানের সকলের পক্ষে যে তাদের বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখে গড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি, সেকথা অনুমান করাও কঠিন হয়। ফলে তাদের পক্ষে যে ব্রাহ্মণের দায়িত্বগ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না সেকথা সহজেই অনুমেয়।

তবে সম্ভবপর না হলেও স্বকর্মভ্রষ্ট হওয়া বা অন্যের বৃত্তিগ্রহণ করার কোনও উপায়ই তাদের ছিল না। কেননা, শাস্ত্র কর্তৃক এরূপ কাজ করা ছিল সম্পূর্ণরূপেই নিষিদ্ধ।

অর্থাৎ ধর্মরক্ষা করতে গেলে না খেয়ে মরতে হয় পছন্দ ও যোগ্যতানুযায়ী কর্ম-সংস্থান করতে গেলে ইহকালে পতিত এবং পরকালে উল্কামুখপ্রেত হয়ে নরকে পঁচতে হয়, এই উভয়সঙ্কটে তাঁরা পড়েছিলেন।

এই উভয়সঙ্কটে পড়ে তাঁদের যে ধর্মীয় বিধান অমান্য করে জীবিকার জন্যে ভিন্ন পথ বেছে নিতে হয়েছিল এবং আজও বেছে নিতে হচ্ছে সেকথা সহজেই অনুমেয়।

আর এ ক্ষেত্রে আন্দাজ-অনুমানের কোনও প্রয়োজনই হয় না। কেননা বাস্তব অবস্থাই আমাদের চোখের সম্মুখে রয়েছে; হাজার হাজার ব্রাহ্মণ কর্তৃক স্বকর্মভ্রষ্ট হয়ে চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য পথে জীবিকার্জনের দৃশ্য অহরহই আমরা দেখে আসছি।

এ থেকে সুনির্দিষ্টরূপেই বলা যেতে পারে যে, ব্রাহ্মণদের শতকরা অন্তত নব্বইজনকেই এই স্বকর্ম ভ্রষ্টতার অপরাধে উল্কামুখপ্রেত হয়ে নরকবাসী হতে হচ্ছে। কথাটা ভাবতেই একটা নিদারুণ বেদনা ও হতাশায় মন অস্থির হয়ে পড়ে।

অথচ এ জন্যে এই প্রেতরূপী নরকবাসীরা নিজেরা মোটেই দায়ী নয়—দায়ী তারাই যাঁরা হাজার হাজার বছর পূর্বে 'বর্ণ-বিভাগ'কে 'জাতি-বিভাগ' বলে চালু করে গিয়েছেন।

আধুনিক ব্রাহ্মণেরা এমনকি তাঁদের নিকটবর্তী পূর্ব-পুরুষেরা যে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং তাঁরা যে একান্তরূপেই সেই সুদূরবর্তী পূর্ব-পুরুষদের ভুল পদক্ষেপের করুণ শিকারে পরিণত হয়েছেন, আশা করি সে সম্পর্কে আর কোনও প্রমাণ দেয়ার প্রয়োজন হবে না।

ইসলাম জীবিকার জন্যে মানুষকে কোনও পন্থা অবলম্বন করতে বলে, প্রসঙ্গের সাথে সঙ্গতি রাখার জন্যে এখানে সে সম্পর্কে কিছুটা আভাস দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, জীবিকার জন্যে যাবতীয় বৈধ পন্থাকেই ইসলাম প্রতিটি মানুষের

জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। নিজ নিজ যোগ্যতা এবং পছন্দ অনুযায়ী যেকোনও মানুষ তার যেকোনও পন্থা গ্রহণ করতে পারে।

তবে কঠোরভাবে মনে রাখতে হবে যে, যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানই প্রতিটি মুসলমানের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য, অতএব তাঁর অসন্তুষ্টির সামান্যতম কারণও ঘটতে পারে, কোনও অবস্থায়ই তেমন কিছু করা চলবে না।

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে ইহকালই হলো পরকালের ভিত্তিভূমি বা কর্মক্ষেত্র। অতএব এখানে যা আবাদ করা হবে পারলৌকিক জীবনে হুবহু তার ফল ভোগ করতে হবে।

উপসংহারে শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হচ্ছি যে, জীবনযাত্রার পথ যত বন্ধুর, যত কঠোর এবং যত দুর্যোগপূর্ণই হোক, আর এ পথের প্রতিযোগিতা যত তীব্র, যত আবেগপূর্ণ এবং যত লোভনীয়ই হোক, ন্যায়-নিষ্ঠা, ধৈর্য ও সততার সাথে সে পথ অতিক্রমের শিক্ষাই ইসলাম দিয়ে থাকে। অন্য কথায়, অন্যায় অধর্মের সাথে কোনওরূপ আপোস বা সহ-অবস্থানের সামান্যতম সুযোগও ইসলাম দেয় না। আর ন্যায় ও সত্যের পথেই যে প্রকৃত কল্যাণ, সেকথাই ইসলাম উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে।

তবে ব্রাহ্মণ্যবাদ সম্পর্কে এ কথা গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে যে, এখন থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে যে পরিবেশ এবং মন-মানসিকতা বিরাজমান ছিল, তা থেকে এর চেয়ে উন্নত ধরনের কিছু আশা করা যেতে পারে কি-না, অথবা পরিবেশের প্রভাবে একান্ত বাধ্য হয়েই তাঁদের এসব বিধি-বিধান এবং অদ্ভুত অলৌকিক কল্প-কাহিনী রচনা করতে হয়েছিল কি না।

আজ এত দূরে বসে তদানীন্তনকালের অবস্থা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। অতএব যারা সেই অবস্থার শিকারে পরিণত হয়েছিলেন অথবা যারা সে অবস্থার সুযোগগ্রহণ করেছিলেন তাদের সম্পর্কে আন্দাজে কোনও মন্তব্য না করাই আমি সঙ্গত মনে করি।

আর যেহেতু পরবর্তী সময়ের ব্রাহ্মণগণ কেউবা সরল বিশ্বাসে, কেউবা পেটের দায়ে, কেউবা পরিস্থিতির চাপে, আর কেউবা 'সেকালের মাথা এবং এ কালের দেহ' নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে ধর্মের নামে রচিত ও প্রচারিত এসব অন্যায় অযৌক্তিক বিধি-বিধান ও কল্প-কাহিনী স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখ-নিসৃত পবিত্র বাণী বলে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। অতএব মূল ঘটনার জন্যে তাদের দায়ী করার কোনও যৌক্তিকতা রয়েছে বলেও আমি মনে করি না।

শুধু তাই নয়, আজ থেকে ৬/৭ হাজার বছর পূর্বে রচিত বেদের অধিকাংশ মন্ত্রের ছন্দ, বাক্য-বিন্যাস, শব্দ-যোজন, ভাবের গভীরতা প্রভৃতির কথা চিন্তা করে বিস্ময়ে হতবাক হই এবং রচয়িতাদের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাও বোধ করি। আজ থেকে ৬/৭ হাজার বছর পূর্বে যাঁরা বেদের মত গ্রন্থ রচনা করতে

পেরেছিলেন, প্রতিভা এবং পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে তাঁরা যে কত উচ্চ পর্যায়ের ছিলেন, সেকথা ভেবেও শ্রদ্ধায় আপ্লুত হই। কিন্তু তাই বলে তাঁদের রচিত বেদ যে অভ্রান্ত এবং অপৌরষেয় সেকথা মেনে নিতে পারি না।

আর সাথে সাথে একথাও বলতে চাই যে, এইসব অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কল্প-কাহিনী এবং যুগের অনুপযোগী বিধি-বিধানসমূহ দেখে কেউ যদি হিন্দুধর্মকে মিথ্যা এবং শুধু কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসের আস্তানা বলে মনে করেন তবে তিনি প্রচণ্ড ভুল করবেন।

তাঁদের মধ্যেও যে সত্যিকারের মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তাঁরা যে সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, আর সে সত্য যে মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি-সঞ্জাত বা নিছক কল্পনা-প্রসূত ছিল না বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে এবং সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে তা লাভ করা গিয়েছিল পরবর্তী আলোচনা থেকে সেকথা জানতে পারা যাবে।

তবে বলে রাখা ভাল যে, সত্য এসেছিল ঠিকই। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী কৌটিল্য এবং কূপমণ্ডুকতা বেদের একত্ববাদী মন্ত্রগুলোর মত সে সত্য বিকৃত করেছে এবং মিথ্যার ধুম্রজাল সৃষ্টি করে সে সত্যের প্রচার-প্রতিষ্ঠা ব্যর্থ-ব্যাহত করেছে।

আলোর রূপালী রেখা

পৈতা বা উপনয়নের পরে শ্রদ্ধেয় জ্যাঠা-মহাশয় যখন সন্ধ্যা-আহ্নিকের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন, তখন প্রয়োজনীয় মন্ত্রগুলো মুখস্থ করার জন্যে আমাদের প্রত্যেককে একখানা করে 'বিশুদ্ধ ত্রি-বেদীয় সন্ধ্যাবিধি' নামক বই দেয়া হয়েছিল।

বেদ চারখানা, অতএব বইটিতে অথর্ববেদ বাদ দিয়ে সাম, ঋক এবং যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাবিধি লিখিত রয়েছে দেখে স্বভাবতই মনে কিছুটা খট্‌কার উদ্রেক হয়েছিল। তবে ধারণা করে নিয়েছিলাম যে, স্থানাভাববশত অথবা অনাবশ্যক বোধে অথর্ববেদ বাদ দেয়া হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে 'হিন্দুসর্ব্বস্ব', 'পুরোহিতদর্পণ', 'নিত্যকর্মপদ্ধতি' প্রভৃতি নামকরা এবং বৃহৎ আকারের বইগুলো খুঁজে যখন অথর্ববেদীয় সন্ধ্যা-তর্পণাদির মন্ত্র এবং নিয়ম-কানুন, এমনকি উক্ত বেদেরই কোনও উল্লেখ দেখতে পাইনি তখন বিস্মিত হয়ে ঠাকুরদাদার কাছে এর কারণ জানতে চেয়েছিলাম।

খুব সম্ভব পরবর্তী প্রশ্ন এড়ানোর জন্যেই ঠাকুরদাদা সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়েছিলেন যে, 'আমাদের দেশে অথর্ববেদীয় ব্রাহ্মণই নেই, সুতরাং তাদের সন্ধ্যা-আহ্নিকাদির কথা লেখার প্রয়োজন হয়নি।'

আমাদের দেশে অথর্ববেদীয় ব্রাহ্মণ না থাকার কারণ কি এবং কোন দেশে তারা রয়েছে সেকথা জানতে চাওয়ায় ঠাট্টা করে ঠাকুরদাদা পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, 'এত খোঁজ-খবর নেয়ার কারণ কি, ওদের মেয়ে বিয়ে করবি

নাকি?' একথা শুনে লজ্জায় সরে যেতে হয়েছিল এবং লজ্জা পেতে হবে আশঙ্কায় ঠাকুর দাদার কাছে আর কোন দিনই এ সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করিনি।

মেঝো কাকাবাবু শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্যের বিশিষ্ট বন্ধু এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বাবু নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। হঠাৎ একদিন চোখে পড়লো যে, আমাদের পৈতার তুলনায় তাঁর পৈতা বেশ কিছুটা খাটো। প্রশ্ন করে জানতে পেরেছিলাম যে, তাঁরা যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ এবং যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণদের পৈতা অতটুকু হওয়াই শাস্ত্রের নির্দেশ।

ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণদের পৈতার দৈর্ঘ্য যে তাঁদের পৈতার চেয়েও খাটো, কথা প্রসঙ্গে নিবারণবাবু সেকথাও বলেছিলেন। সাধারণ ঔৎসুক্যবশত 'অথর্ববেদীয় ব্রাহ্মণদের পৈতা কত বড় হয়ে থাকে এবং আমাদের দেশে ঐ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নেই কেন, নিবারণবাবুর কাছে সেকথা জানতে চেয়েছিলাম। উত্তরে তিনি যেসব কথা বলেছিলেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে তার সার-সংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

রন্তীদেবের যজ্ঞে অল্পসংখ্যক গো-হত্যা করা হয়েছিল বলে নিজেদের দলভুক্ত মানুষদের ভাগে গো-মাংসের পরিমাণ কম হওয়ার আশঙ্কায় অথর্ব ঋষি বেশ কিছুটা গো-মাংস চুরি করে সরিয়ে রেখেছিলেন।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ভুক্ত গরুগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হন এবং এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে চুরির রহস্য জানতে পারা যায়। কিন্তু ইত্যবসরে সুযোগ বুঝে অথর্ব ঋষি তার দলবল নিয়ে সরে পড়েন। শুধু তাই নয়, চুরি করা মাংস এবং অথর্ববেদখানাও তিনি নাকি সাথে নিয়ে যান। যেহেতু হৃত মাংসটুকু ফিরিয়ে পাওয়া সম্ভব হয়নি। অতএব, সেই থেকে ভুক্ত গরু পুনরুজ্জীবিত করার সুবিধাটুকু নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সেই থেকে যজ্ঞ, অতিথি আগমন, মধুপর্ক ও উৎসবাদিতে গো-হত্যা এবং গো-মাংসের ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হয়।

এই ঘটনা বিবৃত করার পর নিবারণবাবু বেশ দৃঢ় কণ্ঠে মন্তব্য করেছিলেন যে, যে-ব্যক্তি কর্তৃক মাংস চুরির ফলে এত সব কাণ্ড ঘটলো সমাজে তার স্থান হতে পারে না এবং যে-বেদ চুরি করে নিয়েছে সমাজ কর্তৃক সে-বেদও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না।

কি জানি কেন ঘটনাটি আমি সরলভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিলাম না এবং নিবারণবাবুকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, মুনি-ঋষিরা যদি গরু খেয়ে পুনরায় সেগুলো জীবিত করতে পারতেন তাহলে মহাদেব স্বয়ং ভগবান হয়েও তাঁর স্ত্রী সতীর মৃতদেহ নিয়ে পাগলের মত ছুটাছুটি করেছিলেন কেন?* স্ত্রীকে পুনরুজ্জীবিত

---

* পদ্মপুরাণ : সৃষ্টি খণ্ড ৫ম অঃ, ৪৪ পৃঃ

করে নিলেই তো পারতেন? মুনি-ঋষিরা যেখানে হজম হয়ে যাওয়া গরুকে পুর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম ছিলেন সেখানে মৃতদেহ জীবিত করাতো মহাদেবের মতো ভগবানের কাছে কঠিন হওয়ার কথা নয়?

স্বাভাবিক কারণেই আমার প্রশ্ন শুনে নিবারণবাবু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, এসব হলো দেবতাদের লীলা-খেলা, এসব নিয়ে যারা মাথা ঘামায় তারা এক শ্রেণীর পাগল। আরে বাপু! এটা হলো স্বয়ং ভগবানের মুখ-নিসৃত বেদের কথা; যজুর্বেদে সুস্পষ্টরূপে এই ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। অতএব এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে যজুর্বেদে এ বর্ণনা আমি দেখেছি। নিবারণবাবু শুধু মাংসের পরিমাণ কম থাকার কথাই বলেছিলেন, নিহত গরুর সংখ্যা যে কত ছিল সেকথা বলেছিলেন না।

'সে সংখ্যা সাঁইত্রিশ হাজার' বেদ থেকে জানতে পেরেছিলাম। আর মনে মনে মাংসের পরিমাণ, অভ্যাগতের সংখ্যা, অথর্ব ঋষির মতো এত বড় নামকরা ঋষির মনে মাংসের লোভ সৃষ্টি ও মাংস চুরি করে দলবলসহ এমনভাবে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব কি-না, যাওয়ার সময় খুঁজে খুঁজে অথর্ববেদখানাকে নিয়ে যাওয়া, এত বড় বিরাট যজ্ঞের বিরাট যজ্ঞবেদীতে উপবিষ্ট আচার্য, অধবর্য্যু হোতা প্রভৃতি মিলে এতগুলো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্য থেকে বেদ চুরি করার সম্ভাব্যতা প্রভৃতি সম্পর্কে একটা আন্দাজে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সফল হতে পারিনি।

সে সময়ে প্রায়ই এখানে সেখানে যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং প্রতিটি যজ্ঞে এমনি ধরনের হাজার হাজার গোহত্যা করা হতো বলে প্রমাণ রয়েছে। অতিথির আগমন ঘটলেই গো-হত্যা করা হতো এবং সেই কারণেই যে অতিথিকে 'গোঘ্ন' বলা হয় তেমন প্রমাণেরও অভাব নেই, অন্যান্য উৎসবাদিতেও গো-হত্যা করা হতো বলে প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে।

আর অথর্ব ঋষির মতো এমন একজন প্রসিদ্ধ ঋষির যে নিমন্ত্রণের অভাব হতো না এবং উদ্যোক্তাদের অনুরোধে অন্যান্যের মতো তাঁকে যে ভুরি-ভোজনই করতে হতো সেকথাও অনায়াসেই ধরে নেয়া যেতে পারে। এমতাবস্থায় অথর্ব ঋষির মনে মাংসের লোভ হওয়া এবং শেষপর্যন্ত মাংস চুরি করে পালিয়ে যাওয়া প্রভৃতির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বহুদিনই চিন্তা করেছি— এর পশ্চাতে কোনও রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে বলেও কোনও কোনও সময় মনে হয়েছে, কিন্তু সে রহস্যটা যে কি, বহু চেষ্টা করেও তা বুঝে উঠতে পারিনি।

এমনি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছি, এমন সময় একদিন হঠাৎ মনে হলো— বেদকে চার ভাগ করে প্রতিটি ভাগের ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখা হয়েছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে জানতে পেরেছিলাম—

ঋগ্বেদ— সূর্য, অগ্নি, উষা, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থের উদ্দেশ্যে রচিত প্রার্থনা-বাণীসমূহের যেগুলো গদ্য-ছন্দে রচিত, প্রধানত সেগুলো এই বেদে স্থান পেয়েছে। গদ্য-ছন্দে রচিত বাক্যকে ঋক বলা হয় বলে এই বেদের নাম দেয়া হয়েছে 'ঋগ্বেদ'।

সামবেদ— সাম অর্থ গান। সাধারণত যেসব ঋক বা মন্ত্র সুরসহযোগে পাঠ করা হয় সেগুলো এই বেদে সন্নিবেশিত হয়েছে বলে এর নাম হয়েছে 'সামবেদ'।

যজুর্বেদ— যজন অর্থ পূজার্চনা, যোগ-যজ্ঞ প্রভৃতি। অতএব যজন-যাজনাদি সম্পর্কীয় মন্ত্রগুলোকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে বলে এ বেদের নাম দেয়া হয়েছে 'যজুর্বেদ'।

অথর্ববেদ— থর্ব অর্থ সচল; আর অথর্ব্ব অর্থ অচল। পৃথিবীর সর্বত্র অচল-অবিচল এবং হ্রাসবৃদ্ধিহীন অবস্থায় বিরাজমান পরমাত্মার অস্তিত্ব ও পরিচয়সূচক মন্ত্রসমূহ এই বেদে রয়েছে বলে এর নাম 'অথর্ববেদ' রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মনে মনে এমনি একজন প্রভুর সন্ধানে রত ছিলাম বলে, অথর্ববেদের এই পরিচয় আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত ও আশান্বিত করে তুলেছিল।

বলা আবশ্যক যে, দেব-দেবীদের পূজা করতে বসে এক পর্যায়ে নির্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করতে প্রথম উদ্দিষ্ট দেবতার আবাহন এবং পরে অঙ্গুলি দ্বারা মূর্তির বক্ষস্থল স্পর্শ করে ওঁ আং ঋং ক্লিং প্রভৃতি মন্ত্রে মূর্তির মাঝে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হয়। প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরেই পাদ্য অর্ঘ্য-ভোগ-নৈবেদ্য প্রভৃতি নিবেদন করার নিয়ম। কেননা প্রাণহীন মূর্তিকে ওসব নিবেদন করা অর্থহীন।

পূজার শেষে মূর্তিকে কিছুটা নাড়া দিয়ে বলতে হয়— 'গচ্ছ দেবী (অথবা দেবঃ) যথেচ্ছায়া।' অর্থাৎ 'হে দেবী! তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর।' পূজায় বসে এসব করতে গিয়ে প্রায়ই মনে হয়েছে— এ আমি কি করে চলেছি! যিনি সকল সময়ে সর্বত্র বিরাজমান রয়েছে তাঁর আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, বিসর্জন প্রভৃতি কি করে সম্ভব?

বলাবাহুল্য, এই কারণেই অথর্ববেদে একজন সর্বময় প্রভুর পরিচয়সূচক মন্ত্র বিদ্যমান রয়েছে জানতে পেরে বিশেষভাবে আশান্বিত হয়ে উঠেছিলাম আর সাথে সাথে এ প্রশ্নও মনের মাঝে প্রকট হয়ে উঠেছিল যে, অথর্ব ঋষির মাংস চুরি করে পালিয়ে যাওয়া যদি সত্যই হয় তবে তিনি বেদ নিয়ে যাবেন কেন? মাংস চোরের আবার বেদের কি প্রয়োজন থাকতে পারে? আর যে বেদে এসব অদ্বিতীয় এবং সর্বত্র বিরাজমান বিশ্বপ্রভুর পরিচয়সূচক মন্ত্রসমূহ রয়েছে তিনি বেছে বেছে সেই অথর্ব বেদখানাইবা নিয়ে যাবেন কেন?

শিখোপনিষৎ-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, পিপ্পলাদ, সনৎকুমার এবং অঙ্গিরা নামক তিনজন ঋষি 'ভগবান' অথর্ব ঋষির সন্নিধানে আগমন করে 'প্রকৃত ধ্যেয়' বা ধ্যানযোগ্য দেবতা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, উল্লিখিত তিনজন ঋষিই প্রোথিতযশা এবং বহুসংখ্যক বেদমন্ত্রের রচয়িতা। এহেন তিনজন ঋষিই 'প্রকৃত ধ্যেয়' সম্পর্কে জানার জন্যে যাঁর কাছে যান, তিনি যে কত উচ্চস্তরের ঋষি এবং তাঁর মর্যাদা যে কত বেশি, সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ করে অথর্ব ঋষির নামের পূর্বে 'ভগবান' শব্দের ব্যবহার থেকেও তাঁর যোগ্যতা এবং মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

প্রোথিতযশা এবং বহুসংখ্যক বেদ-মন্ত্রের রচয়িতা ঋষিদের 'প্রকৃত ধ্যেয়' সম্পর্কে শিক্ষাদানের যোগ্যতাসম্পন্ন এবং পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠাশীলতায় 'ভগবান' বলে আখ্যাপ্রাপ্ত এই অথর্ব ঋষির মনে কি করে সামান্য মাংসের লোভ হতে পারে, আর কি করেইবা তিনি মাংস চুরি করে 'দলবলসহ' পালিয়ে যেতে পারেন সেকথা বহু চেষ্টা করেও বুঝে উঠতে আমি সক্ষম তো হই-ইনি, ওপরন্তু কোনও হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যেই যে এমন একটি মিথ্যা ঘটনা তাঁর ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল বার বার সেকথাই আমার মনে হয়েছে।

প্রকৃত ঘটনা যাই হোক, যেহেতু অথর্ববেদের মধ্যে 'প্রকৃত ধ্যেয়' বা সর্বময় প্রভুর পরিচয়সূচক মন্ত্র রয়েছে। অতএব তা সংগ্রহের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। বাড়িতে তালপাতা, ভুর্জপত্র এবং কাগজে লিখা গাদা গাদা ধর্মগ্রন্থ ছিল, ছিল না শুধু অথর্ব বেদখানা। অগত্যা বহু চেষ্টার পরে কলকাতা থেকে তার কিছু অংশ সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম; বর্তমানে তা আমার কাছেই রয়েছে। এখানে বেদ সম্পর্কে কিছুটা আভাস দিয়ে রাখা প্রয়োজন। অন্যথায় অনভিজ্ঞদের পক্ষে বিষয়টি বুঝতে পারা কঠিন হবে।

উল্লেখ্য, বেদের চারটি ভাগ রয়েছে, যথা : সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষৎ। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগ হলো কর্মকাণ্ড সম্পর্কীয়, আর আরণ্যক ও উপনিষৎ ভাগে রয়েছে জ্ঞানকাণ্ড সম্পর্কীয় মন্ত্রসমূহ।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, উপনিষৎই হলো বেদের অন্ত বা সারভাগ এবং সেকারণেই একে বেদান্ত বলা হয়ে থাকে। সৌভাগ্যের বিষয়, অথর্ববেদের সেই উপনিষৎ ভাগটিই আমি সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। এ ভাগে কয়েকখানা উপনিষৎ রয়েছে। তন্মধ্যে অল্লোপনিষৎ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চিন্তাশীল পাঠকবর্গের ভেবে দেখার জন্যে নিম্নে উক্ত অল্লোপনিষৎ-এর কয়েকটি সূত্র উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

হ্রং হোতার মিন্দ্রো হোতা ইন্দ্রো রামা হাসুরিন্দ্রাঃ
আল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রাহ্মণ অল্লাম ॥ ৫ ।

—অল্লোপনিষৎ ৫ম সূক্ত

উল্লেখ্য, ১৩৩৩ সালে শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং বসুমতী সাহিত্যমন্দির কর্তৃক প্রকাশিত কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় 'শেতাশ্বতরো উপনিষৎ'-এর Voll-II-তে অথর্ববেদীয় শিরোউপনিষৎ, নিরালম্বোপনিষৎ, শিখোপনিষৎ, অল্লোপনিষৎ প্রভৃতি কয়েকখানা উপনিষৎকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থ থেকে ওপরোদ্ধৃত সূক্তটির হুবহু বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

'সেই অল্ল, অর্থাৎ পরমাত্মারূপী ইন্দ্র, ঈশ্বর অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ, অল্লকে গ্রহণ করা ঈশ্বরকে গ্রহণ করা অপেক্ষা কল্যাণকর। কারণ ঈশ্বরও তৎসকাশে পরিমাণে ক্ষুদ্র পরামাত্মা নিত্যপূর্ণ; এই হেতু তিনি ঈশ্বরেরও জননী।

— ঐ ২৯ পৃষ্ঠা

হ্রাং অল্লোহ রসুল মহমদ রকং বরস্য অল্লো অল্লাং
আদলাবুক মেককং অল্লাবুকং নিখাতকম্॥ ৬।

—অল্লোপনিষৎ, ৬ষ্ঠ সূক্ত

উল্লেখ্য, ওপরোদ্ধৃত সূক্তটির বঙ্গানুবাদে 'অল্লোহ', 'রসুল', 'মহমদ' প্রভৃতি শব্দগুলোকে সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবেই বাদ দেয়া হয়েছে অথবা মনগড়া অর্থ করা হয়েছে।

এই একত্ববাদী সূক্তটির বঙ্গানুবাদ করতে বসে অনুবাদক মহোদয় যে তাঁর অন্তরের বহুত্ববাদী ধ্যান-ধারণা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন বঙ্গানুবাদের এক স্থানে 'পরমাত্মাই মায়া পরবশ হইয়া অসংখ্য হইয়াছিলেন' বাক্যটি থেকে সেকথা পরিষ্কাররূপে বুঝতে পারা যায়।

পরমাত্মা যে স্বাধীন, সার্বভৌম, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অন্য-নিরপেক্ষ সুতরাং তিনি যে মায়া বা আর কারো 'পরবশ' হতে পারেন না আর যেহেতু তিনি ইচ্ছা করা মাত্রই সবকিছু হয়ে যায়, অতএব তাঁর নিজের পক্ষে যে 'অসংখ্য হওয়া'র প্রয়োজন হয় না, এমন সহজ কথাটাও অনুবাদক মহোদয়ের ভেবে দেখার অবকাশ হয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে একান্ত বাধ্য হয়েই অনুবাদের এক স্থানে 'তথাপি তিনি যে পরমাত্মা সেই পরমাত্মাই ছিলেন' এ সত্যটুকু তিনি স্বীকার করেছেন।

ইল্ললে বরুণো রাজা পুনস্তং দুধ্যু
ইল্লল্লে কবর ইল্লাং কবর ইল্লাং ইল্লেতি ইল্ললে ॥ ৮ ।

অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি আকাশ যাবৎ নিখিল দ্যোতমান বস্তুই অল্ল কর্তৃক সৃষ্ট, কিন্তু ঐরূপে সৃষ্ট হইয়াও নিজ নিজ-স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয় নাই অর্থাৎ অল্ল তাহাদের রূপশূন্যতাদি স্বরূপ বিনষ্ট করেন নাই। কেননা তিনি ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া ব্যাপকরূপে শোভা পাইয়াছিলেন। এই কারণেই ঐ সমস্ত দ্যোতমান দিব্য বস্তুসমূহ তাঁহাকে আসক্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। পরন্তু হিরণ্যগর্ভ যাহাতে অনায়াসে অল্লের স্বরূপ নিরীক্ষণে সমর্থ হন তদ্রূপ অবসর প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনিও দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন।

যাহার দ্বারা পরমাত্মাস্তুতি পঠিত হয় পরমাত্মা যেসব ব্যক্তিবৃন্দকে উপাসনোচিত শক্তি প্রদান করেন। তিনি হৃদয়ে বিরাজমান বলিয়া ঐ হৃদয়কে তাঁহার করিয়াই লইয়া থাকেন। তাঁহাকে যিনি এক দেখেন, সাধক তাহাকে এক দেখিলেই অভিন্ন হওয়া যাইতে পারে। —ঐ ৩৩ পৃঃ

হবয়ামি মিত্রো ইল্লা কবর ইল্লাং
রসূল মহমদ রকং বরস্য অল্লে অল্লো-পুনস্তং দুধ্যু ॥ ৯ ।

— অল্লোপনিষৎ ৯ম সূক্ত

উল্লেখ্য, এই সূক্তটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, অহংতে মিত্রঃ স্নেহ 'কর্তাহস্মি' শ্রোতাব্যা মে বচ ইতি। ...... সততং চিন্তয় ইল্লাং প্রাপক গ্রহং করে সুখময়ে পরেশে, আনন্দময়ঃ পরমাত্মেব কামং প্রাপয়িষ্যতিতি। রসূলং রসং বলয়ন্তং..... ।

বঙ্গানুবাদে বলা হয়েছে, তুমি নিয়ত চিন্তা কর। আনন্দময় পরেশই তোমার কাম পূরণ করবেন ইত্যাদি।

লক্ষণীয়, (ক) মূলে অল্লো শব্দ থাকলেও বঙ্গানুবাদে বলা হয়েছে 'পরেশ'। (খ) ব্যাখ্যায় 'কবরে সুখময়ে পরেশে' বলা হলেও বঙ্গানুবাদে 'কবর' শব্দের উল্লেখ করা হয়নি। (গ) মূলে পরিষ্কারভাবে 'রসূলং মহমদ' থাকলেও ব্যাখ্যায় শুধু রসূলং রাখা হয়েছে এবং বঙ্গানুবাদে রসূলংকেও বাদ দেয়া হয়েছে।

অতঃপর আর একটি মাত্র সূক্তের উদ্ধৃতি দেয়া যাচ্ছে। সূক্তটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং পরবর্তী আলোচ্য বিষয়ের সাথে এর বিশেষ একটি যোগসূত্র রয়েছে। সুতরাং এই সূক্তের তাৎপর্যটুকু স্মৃতিতে জাগরুক রাখার জন্যে সহৃদয় পাঠকমণ্ডলীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে রাখছি।

অল্লা ইল্লাল্লা অনাদি স্বরূপায় অথর্ব্বনীংশাখাং হ্রীং জনানাম
পশু সিদ্ধান্ জলচরান্ উদৃষ্টং কুরু কুরু ফট্ ॥

অসুর সংহারিণীং হ্রুং অল্লোহ রসূল মহমদ রকং বরস্য
অল্লো-অল্লাং ইল্লল্লেতি ইল্লল্লাঃ । ১০ ।

অর্থাৎ 'অথর্ব ঋষি যে বেদশাখা দর্শন করিয়া ছিলেন তাহারই একদেশ এই উপনিষৎকে, জগতের বীজভূতা মায়া, জন্মাদাত্রী, অল্লা, মানববৃন্দের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ আবির্ভাব করিয়া দেবার বাসনায় উক্ত ঋষিকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন ।

সেই আমি অথর্ব ঋষি এই উপনিষৎ দেখিয়া প্রার্থনা করিতেছি, যে অল্ল! তুমি মানববৃন্দকে স্থলে, সর্বভুতের সমীপে স্বাধীনতা দাও; জলে ও শূন্যে সর্ব্বত্রই স্বাধীনতা প্রদান কর, স্বাধীনতা প্রদান কর .... ।'

লক্ষণীয় যে, বঙ্গানুবাদের সময়ে মূলে বিদ্যমান অল্লোহ রসূল মহমদ রকং বরস্য-অল্লো-আল্লাং ইল্লল্লাঃ' প্রভৃতি শব্দের কোনও কোনওটিকে বাদ দেয়া হয়েছে । আবার কোনও কোনওটির মনগড়া অর্থ করা হয়েছে ।

অতঃপর এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে যা মনে না রাখা হলে বক্ষ্যমাণ আলোচনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । বিষয়টি হলো, বেদে যে হাজার হাজার মন্ত্র রয়েছে, সেগুলো রচনার সময়ে কোন ঋষি কর্তৃক কোন মন্ত্র রচিত হয়েছে, কোন ছন্দে পাঠ করতে হবে, মন্ত্রটির উদ্দিষ্ট দেবতা কে অর্থাৎ কোন দেবতাকে লক্ষ্য করে মন্ত্রটি রচনা করা হয়েছে এবং মন্ত্রটিকে কোন কাজে ব্যবহার করতে হবে প্রভৃতি বিষয়সমূহ প্রতিটি মন্ত্রের প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে ।

উদাহরণস্বরূপ একটি মন্ত্রের উদ্ধৃতি দেয়া যাচ্ছে :

ওঁ কারস্য ব্রাহ্মণঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ ।

অর্থাৎ ওঁকার মন্ত্রের ঋষি (রচয়িতা) ব্রহ্মা, ছন্দ-গায়ত্রী, দেবতা, অগ্নি এবং সকল-কার্যের প্রারম্ভে প্রয়োগ হয় ।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, একমাত্র অথর্ববেদের বেলায়ই এই নিয়মের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় । অর্থাৎ অন্যান্য বেদের সূক্ত বা মন্ত্রের মত এর সূক্ত বা মন্ত্রের প্রণেতা বা প্রণেতাগণের নাম, উদ্দিষ্ট দেবতা, পাঠনীয় ছন্দ প্রভৃতির কোন উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না; এমনকি কেউ যে এর রচয়িতা ছিল তেমন কথাও কুত্রাপি বলা হয়নি ।

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক এবং বিখ্যাত সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ বাবু যোগেশচন্দ্র ঘোষ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রীও তাঁর লিখিত 'আমরা কোন পথে' নামক গ্রন্থের ৩১৮ পৃষ্ঠায় অথর্ববেদের কোনও প্রণেতা বা রচয়িতা না থাকার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন ।

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, এই ব্যতিক্রমের কারণ কি? বলা আবশ্যক, এই প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট সূক্তটির মধ্যেই রয়েছে। কিভাবে রয়েছে দেখুন, (ক) অথর্বঋষি বেদ শাখা দর্শন করিয়াছিলেন এবং (খ) জগতের বিজ্ঞতা জন্মদাত্রী 'অল্লা' মানববৃন্দের নিত্য সিদ্ধিস্বরূপ আবির্ভাব করিয়া দিবার বাসনায় যে অথর্বঋষিকে এই বেদ শাখা দেখাইয়া দিয়াছিলেন এবং (গ) সেই আমি অথর্বঋষি এই উপনিষৎ দেখিয়া প্রার্থনা করিতেছি, হে অল্ল, ... ইত্যাদি বাক্য থেকেই অথর্বঋষি বা অন্য কেউ যে এই বেদ শাখাটি রচনা করেনি এবং অল্ল কর্তৃক প্রদর্শিত হয়েছিলেন সেকথা সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে জানতে পারা যাচ্ছে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোনও মুনি-ঋষি কর্তৃক রচিত হলে অপরিহার্যরূপেই অন্যান্য বেদ-মন্ত্রের মত অথর্ববেদীয় মন্ত্র বা সূক্তগুলোর প্রথমেই মন্ত্রের রচয়িতারূপে কোনও ঋষির নাম এবং উদ্দিষ্ট দেবতারূপে ইন্দ্র বরুণাদির উল্লেখ অবশ্যই দেখতে পাওয়া যেতো।

০ অতএব 'অল্ল, রসূল, মহমদ, কবর, ইল্লল্লেতি ইল্লল্লাঃ' প্রভৃতি শব্দ ও বাক্যের সাথে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অগ্নি, সূর্য প্রভৃতির উপাসক অর্থাৎ তদানীন্তন কালের মুনি-ঋষিদের সে সামান্যতম পরিচয়ও ছিল না এমনকি থাকা যে সম্ভবই ছিল না, সেকথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

০ এমতাবস্থায় স্বয়ং অল্ল কর্তৃক প্রদর্শিত না হলে (ওপরোক্ত ১০ম সূক্তটির অনুবাদ দ্রষ্টব্য) অথর্বঋষির পক্ষে এসব শব্দ এবং বাক্য জানা যে কোনওক্রমেই সম্ভব ছিল না সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

০ এ থেকে সুস্পষ্টরূপেই বুঝতে পারা যায় যে, অল্ল বা অল্লা নামটি মনুষ্য রচিত নয় এবং নামের অধিকারীই স্বয়ং এ নামটি অথর্বঋষিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে এই নামটি ব্যতীত ভগবান, ঈশ্বর, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি যেসব নাম বিশ্বপ্রভুর নাম হিসেবে বেদমন্ত্রে দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো বেদমন্ত্রের মতই মুনি-ঋষিদের রচিত।

আশা করি, এ থেকেই বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী বুঝতে পারছেন যে, প্রভু-সন্ধানের আশায় বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের সাথে আমার পরিচয় যতই বাড়িয়ে চলেছিলাম, ততই প্রভুর সংখ্যা বৃদ্ধি আর তাদের অদ্ভুত অলৌকিক জন্ম-বৃত্তান্ত ও লীলা কাহিনীর ধুম্রজাল ঘনীভূত হয়ে যখন আমার মনের আকাশ হতাশার অন্ধকারে ভরে তুলছিল, ঠিক এমনি সময়েই একান্ত অপ্রত্যাশিতরূপে 'অল্ল' নামটি পথ প্রদর্শক ধ্রুবতারার ন্যায় আমার মনের দিগন্তে ভাস্বর হয়ে ওঠে।

তাছাড়া 'অল্লা কর্তৃক অথর্বঋষিকে বেদ শাখা প্রদর্শন' সম্পর্কীয় ওপরোদ্ধৃত কতিপয় বাক্যের দ্বারা 'স্বয়ং অল্ল কর্তৃক যে ধর্মীয় বিধান প্রদত্ত হয়ে থাকে' এই মহা-সত্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও আমি লাভ করি।

আর 'অল্লা' কর্তৃক অথর্বর্বঋষিকে বেদ শাখা প্রদর্শিত হওয়াই যে ইন্দ্র, বরুণাদি উপাসকদের ক্রোধ সঞ্চারের কারণ এবং সেই কারণেই যে তাঁর ওপর মাংস ও বেদ চুরির মিথ্যা অপবাদ চাপানো হয়েছিল এই ঘটনা থেকে সেকথাও আমার কাছে দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, অথর্ববেদের যে অংশটুকু আমি সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম, প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল একান্তরূপেই অকিঞ্চিৎকর। তাছাড়া একমাত্র অল্লোপনিষৎ ব্যতীত এই অথর্ববেদেরই আমার সংগৃহীত অন্যান্য উপনিষৎগুলো ছিল দেব-দেবীদের স্তবস্তুতিতে পরিপূর্ণ।

বলাবাহুল্য, এই ব্যতিক্রম আমাকে বিশেষভাবে চিন্তান্বিত করে তুলেছিল। কেননা, অল্লোপনিষদের ওপরোদ্ধৃত সূক্তগুলো থেকে আমি এই ধারণাই করে নিয়েছিলাম যে, যেহেতু অথর্ব বেদখানা স্বয়ং অল্ল কর্তৃক অথর্বঋষিকে প্রদর্শিত হয়েছে অতএব অন্যান্য বেদ-মন্ত্রের মত তা মুনি-ঋষিদের রচিত নয়, আর মুনি-ঋষিদের রচিত নয় বলেই এতে দেব-দেবীদের উল্লেখ থাকতে পারে না।

অতএব একান্ত বাধ্য হয়েই এই ব্যতিক্রমের কারণ জানতে চেষ্টা করি এবং জানতে পারি যে, কোনও প্রকার পরিবর্তন ছাড়া ১৪৩টি এবং পরিবর্তনান্তর বহুসংখ্যক ঋগ্বেদীয় সূক্তকে অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছে।* খুব সম্ভব অথর্ববেদ বিশেষ করে অল্লোপনিষৎ-এর মৌলিকতা সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই সুপরিকল্পিতভাবে এটা করা হয়েছিল। বলাবাহুল্য, আমার সংগৃহীত অথর্ববেদের অন্য উপনিষৎগুলো দেব-দেবীদের স্তবস্তুতিতে পরিপূর্ণ হওয়া এই অন্তর্ভুক্তেরই ফল।

শুধু অথর্ববেদই নয়, অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে অন্যান্য বেদের বর্তমান অবস্থার যে পরিচয় পেয়েছিলাম তার কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে :

ঋগ্বেদের ২১টি শাখা ছিল। বর্তমানে মাত্র ৫টি শাখা রয়েছে।
সামবেদের ১০টি শাখা ছিল। বর্তমানে মাত্র ৮টি শাখা রয়েছে।
যজুর্বেদের ৮৬ বা ১০০টি শাখা ছিল। বর্তমানে মাত্র ২টি শাখা রয়েছে।
অথর্ববেদের ১২,৩৩৩টি সূক্ত ছিল। বর্তমানে মাত্র ৫,৮৩৩টি সূক্ত রয়েছে।

— পৃথিবীর ইতিহাস— (দুর্গাদাস লাহিড়ী কৃত)

---

* পূর্বোল্লেখিত "আমরা কোন পথে" নামক গ্রন্থের সুবিজ্ঞ লেখক কর্তৃক উক্ত গ্রন্থের ৩১৭ পৃষ্ঠায় এ অন্তর্ভুক্তির কথা স্বীকৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য, বেদের এই অঙ্গহানিকে মোটেই স্বাভাবিক বলা যেতে পারে না। কেননা এখন থেকে প্রায় ৬-৭ হাজার বছর পূর্বে বেদ-রচনার কাজ শুরু হয়েছিল।

এই সুদীর্ঘকালে বহু দুর্যোগ-দুর্বিপাক সংঘটিত হওয়া ছাড়াও একটি বিশেষ মহলকর্তৃক বেদকে ভীষণভাবে কুক্ষিগত করে যেসব কারসাজি চালানো হয়েছিল, তাতে আজও যে বেদ টিকে রয়েছে সেটাই আশ্চর্য।

সে যাহোক, যেহেতু অধিকাংশ বেদমন্ত্রই মুনি-ঋষিদের রচিত আর হেতু প্রাচীনদের জন্যে এই শিক্ষাই যুগের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে এবং চন্দ্র-সূর্য-অগ্নি-উষা প্রভৃতিকে উপাস্য জ্ঞানে পূজা করার দিনও বহু পূর্বেই বাসি হয়ে গিয়েছে। অতএব তার অঙ্গহানিকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয়ার কোনও প্রয়োজন আমি বোধ করিনি। কিন্তু যখন জানতে পেরেছিলাম যে, এইসব বেদমন্ত্রের সাথে সাথে 'অল্ল কর্তৃক অথর্বঋষিকে প্রদর্শিত' অথর্ব বেদখানার ১২,৩৩৩টি সূক্তের মধ্যে ৬,৫০০টি সূক্তও উধাও হয়ে গিয়েছে বা উধাও করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৫,৮৩৩টি সূক্তের প্রায় সবগুলোই ঋগ্বেদের সূক্ত। তখন হতাশায় আমার বুক ভরে উঠেছিল। বলাবাহুল্য, এতগুলো সূক্তের উধাও হয়ে যাওয়া এবং অথর্ববেদের মধ্যে ঋগ্বেদীয় সূক্তের অনুপ্রবেশ ঘটানোকে উদ্দেশ্যমূলক ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না। আর অথর্ববেদের ধ্বংস সাধনই যে এই উদ্দেশ্য, সেকথাও খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

যেহেতু একমাত্র অল্লোপনিষৎ ব্যতীত মূল অথর্ববেদের আর কোনও অংশ উদ্ধার করা সম্ভব নয়। অতএব সেই অল্লা বা বিশ্বপ্রভু কর্তৃক অন্য কোনও মহাপুরুষকে প্রদর্শিত আর কোনও ধর্মীয় বিধান আছে কি-না, অতঃপর একান্ত বাধ্য হয়েই তার খোঁজ-খবর নেয়ার কাজে আমাকে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল।

সন্ধান লাভ

উল্লেখ্য, পড়াশোনার জন্যে তখন কলকাতায় থাকি। সুতরাং অন্য ধর্ম সম্পর্কে জানা বিশেষ কোনও অসুবিধা ছিল না। 'রাজার জাতের ধর্ম' হিসেবে প্রথমে খৃস্টধর্ম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।

জনৈক খৃস্টান বন্ধুর পরামর্শে সে সময়ে ইন্টালি এলাকায় বসবাসকারী রেভারেন্ড জন ফেইতফুল সাহেবের বাসায় যাই; প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা হয়। তাঁর পরামর্শে কয়েকটি রোববার গীর্জায়ও যাই।

একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে সূর্য এবং তার আলো ও তাপের উপমা দিয়ে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, ত্রিত্ববাদ বিশ্বাস করা ছাড়া ঈশ্বরকে জানা সম্ভব

নয় এবং যীশুর পবিত্র রক্ত অর্থাৎ তিনি যে খৃস্টান-জগতের সকল পাপ নিজের স্কন্ধে নিয়ে ক্রুশে প্রাণ দিয়েছিলেন, একথা বিশ্বাস না করা পর্যন্ত কোনও মানুষেরই মুক্তি সম্ভব নয়।

চন্দ্র-সূর্যাদি এবং নর-পূজা থেকে মুক্তি লাভই ছিল আমার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তাছাড়া ত্রিত্ববাদের হেঁয়ালির সাথেও আমি অপরিচিত ছিলাম না। এমতাবস্থায় জন ফেইতফুল সাহেবের সাথে ঐকমত্যে উপনীত হওয়া যে আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না সেকথাই সহজেই অনুমেয়।

তাছাড়া, নব-দীক্ষিত বিশেষ করে কালো মানুষদের সাথে সাদা-মানুষদের ব্যবহার, ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের বিবাদের কারণ, বাইবেলের পরিবর্তন সাধন, অতীতের পাদ্রী-পুরোহিতগণ কর্তৃক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় প্রচণ্ড ধরনের বাধাসৃষ্টি ও বিজ্ঞান-সাধকদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানো প্রভৃতি বিষয়গুলোও ক্রমে ক্রমে এবং বিভিন্নভাবে আমি জানতে পারি। ফলে প্রভুর সন্ধান পাওয়ার জন্যে অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভব হতে থাকে।

এখানে খৃস্টধর্মের প্রায়শ্চিত্তবাদ বা Doctrine of atonement সম্পর্কে দু'কথা বলার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। অতএব বলতে হচ্ছে যে, এই নিখিল বিশ্বের যিনি স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং পরিচালক, যাবতীয় প্রভুত্ব এবং কর্তৃত্বের মালিকও যে একমাত্র তিনিই, খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিরা পুরাপুরিভাবে একথা বিশ্বাস করেন না। আর করেন না বলেই যীশুখৃস্টকে তাঁরা মানুষের ত্রাণকর্তা বলে থাকেন; বিশ্বাস থাকারও দাবি করেন।

যীশুখৃস্টের এই 'ত্রাণকর্তা' হওয়ার সমর্থনে যে যুক্তি তাঁরা পেশ করেন, তাহলো, খৃস্টানজগতের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ বিসর্জন করে দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, এটাই হলো খৃস্টানদের বহু বিঘোষিত প্রায়শ্চিত্তবাদ বা Doctrine of atonement.

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এই প্রায়শ্চিত্তবাদে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নিজেকে খৃস্টান বলে দাবি করতে পারেন না।

প্রায়শ্চিত্তবাদ-এর এই কল্পনা যে কত ভ্রান্ত এবং অযৌক্তিক তা বোঝার জন্যে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয় না। সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি—

খৃস্টান-জগত যে এই প্রায়শ্চিত্তবাদ-এর প্রতি বিশ্বাসী নন এবং বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাঁরা যে মুখে মুখে এ বিশ্বাসের দাবি করেন এবং তার বহু প্রত্যক্ষ প্রমাণই আমাদের কাছে রয়েছে। এ সম্পর্কে এখানে একটি মাত্র উদাহরণ তুলে ধরা যাচ্ছে।

উদাহরণটি হলো : তাঁরা যদি প্রকৃতই বিশ্বাস করতেন, যীশুখৃস্ট খৃস্টানদের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছেন, তাহলে দণ্ডবিধি আইন প্রণয়ন ও বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের দেশের চোর, ডাকাত, খুনী, প্রতারক প্রভৃতির বিচার তাঁরা করতেন না, শাস্তিও দিতেন না।

যেহেতু ওসব চোর, ডাকাত, খুনী, প্রতারক প্রভৃতির যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত যীশুখৃস্ট করে গিয়েছেন। ফলে যত পাপই তারা করুক তাদের পাপী বলা এবং শাস্তি দেয়ার অর্থই হলো যীশুখৃস্ট কর্তৃক প্রায়শ্চিত্ত করে যাওয়াকে অস্বীকার করা।

মুখে বলা হবে যীশু সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছেন। আবার কার্যত পাপীদের পাপী সাব্যস্ত করে শাস্তি প্রদান করা হবে। এটাকে স্ববিরোধিতা অথবা মতলব হাসিল ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

যীশু কর্তৃক খৃস্টানদের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার থিওরিটাই যে এতদ্বারা নির্ঘাৎ মাঠে মারা যাচ্ছে খৃস্টান-জগত সেকথা ভেবে দেখবেন, এটাই তাঁদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।

আমি কেন খৃস্টানধর্মগ্রহণ করিনি আশা করি সে সম্পর্কে আর বেশি কিছু লেখার প্রয়োজন হবে না। প্রিয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে বলা প্রয়োজন যে, আমি কেন ইহুদী, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতির কোনওটাকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করিনি 'আমি কেন খৃস্টধর্মগ্রহণ করলাম না' নামক পুস্তকে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

স্বাভাবিক কারণেই অতঃপর আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করতে হয়। আমার এ কাজে যাঁরা অতি মূল্যবান উপদেশ এবং প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, দুঃখের বিষয় আজ তাঁদের একজনও বেঁচে নেই। তবে তাঁদের স্মৃতি অমর হয়ে রয়েছে। বিশ্বপ্রভু আল্লাহ তাঁদের রুহের প্রতি অবিরল ধারায় শান্তি বর্ষণ করুন! বহুজনের মতো আমিও কায়মনোবাক্যে এই দোয়াই করি। একাজে যাঁদের সর্বাধিক সাহায্য এবং সহযোগিতা আমি পেয়েছি তাঁদের মধ্যে পরম শ্রদ্ধেয় মরহুম মাওলানা আকরম খাঁ সাহেব, খানবাহাদুর আলহাজ্জ আহসান উল্লাহ এম. এ. এম. আর. এ. আই. এস; এফ. সি. ইউ এবং খানবাহাদুর সৈয়দ হাতেম আলী সাহেবের (প্রখ্যাত কবি ও চিন্তাবিদ ফররুখ আহমদের পিতা) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বলা আবশ্যক যে, খানবাহাদুর আহসান উল্লাহ সাহেব একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, কামেল পীর, বহু গ্রন্থপ্রণেতা, আহসান উল্লাহ বুক হাউজের প্রতিষ্ঠাতা এবং সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। খানবাহাদুর সৈয়দ হাতেম আলী সাহেব

ছিলেন একজন নামকরা পুলিশ অফিসার, অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি; তাছাড়া ইসলাম সম্পর্কেও তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আর সর্ব-পরিচিত মাওলানা আকরম খাঁ সাহেবের যোগ্যতা সম্পর্কে নতুন করে কিছু লেখার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

বলাবাহুল্য, ইসলাম সম্পর্কে জানতে হলে সর্ব প্রথমেই আল্লাহ্ সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হয়ে থাকে। অবশ্য অথর্ববেদীয় অল্লোপনিষৎ-এর 'অল্লা' নামটির সাথে ইসলাম ঘোষিত 'আল্লাহ্' নামের সাদৃশ্য থাকা সম্পর্কে একটা ধারণা আমার ছিল।

ওপরোক্ত ব্যক্তিদের সাথে আলাপ-আলোচনা এবং ইসলাম সম্পর্কীয় বই-পুস্তকাদি পাঠে আল্লাহ এবং ইসলাম সম্পর্কে যেটুকু জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তা যথেষ্ট না হলেও মোটামুটি একটা ধারণায় উপনীত হওয়ার উপযোগী ছিল। ভালভাবে জানার জন্যে পরবর্তী সময়ে মাদরাসায় পড়াশোনা এবং কতিপয় যোগ্য আলেমের সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন যে হয়েছিল সেকথা সহজেই অনুমেয়।

ইসলাম সম্পর্কে আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা পরবর্তী নিবন্ধগুলোতে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। সুতরাং আল্লাহ্ নামটির কতিপয় বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে ধরে প্রসঙ্গের ইতি টানতে হচ্ছে।

উল্লেখ্য, নাম রাখার সাধারণ নিয়ম হলো, নাম বস্তুর এবং বস্তু নামের উপযোগী ও অর্থপূর্ণ হওয়া। অর্থাৎ নামটি শ্রবণের সাথে সাথে শ্রোতা যেন বস্তুটির গুণ বা আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে একটা নির্ভুল ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম হয়। মনে রাখতে হবে যে, 'কাঁঠালের আম স্বত্ত্ব', 'সোনার পাথরের বাটি'— ধরনের নাম শুধু অর্থহীনই নয়— ভীষণভাবে বিভ্রান্তিকরও।

বস্তু সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং নামকরণের যোগ্যতা রয়েছে এমন ব্যক্তিমাত্রের পক্ষেই বস্তুর নামকরণ সম্ভব। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সীমাবদ্ধ জ্ঞান-প্রজ্ঞা দিয়ে সসীম বস্তুর নামকরণ সম্ভব হলেও অসীম অনন্ত বিশ্বপ্রভুর নামকরণ সম্ভব হতে পারে না।

আর পারে না বলেই মানুষ তার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বপ্রভুর যত নামই রেখেছে সেগুলোর কোনওটার মাধ্যমেই তাঁর অসীমত্তকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

উল্লেখ্য, এতদ্বারা আমি গুণ-বাচক নামের কথা বলছি না। কেননা, সামান্য জ্ঞানবুদ্ধি থাকলেই ওধরনের নাম রাখা সম্ভব; আমি ব্যক্তি-বাচক বা আসল নামের কথা বলছি যে নাম তিনি না জানানো পর্যন্ত কোনও মানুষের পক্ষেই জানা সম্ভব নয়।

ঈশ্বর, ভগবান, গড, পরমাত্মা, পরমব্রহ্ম প্রভৃতি নামগুলো যে মানব-রচিত এবং বিশ্বপ্রভুর আসল নাম নয়, আশা করি নিম্নের আলোচনা থেকে তা বুঝতে পারা যাবে।

ভগবান : ভগবান শব্দের অর্থ হলো 'ভগযুক্ত' বা 'ভগের' অধিকারী। আর 'ভগ' শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে ব্যাকরণ এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের অভিমত হলো :

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্যবীর্যস্য যশশঃ শ্রেয়ঃ
জ্ঞানং বৈরাগ্যায়াশ্চৈব যন্নাং ভগ ইতিঙ্গনা ॥

অর্থাৎ ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রেয়তা, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই ছয়টি গুণের নাম 'ভগ'।

অতএব কোনও নর বা নারী এই ছয়টি গুণের অধিকারী হলে তাকে যথাক্রমে ভগবান বা ভগবতী বলা হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, এই ছয়টি গুণের অধিকারী হিসেবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, ইন্দ্র, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী প্রভৃতিই শুধু যথাক্রমে ভগবান এবং ভগবতী বলে অভিহিত হয়ে আসছেন না, অনেক মুনিঋষি এবং তাদের পত্নী-কন্যা প্রভৃতিরাও ভগবান-ভগবতী বলে অভিহিত হয়ে আসছেন।

তাছাড়া ভয়, ভক্তি, ভাব-প্রবণতার কারণে উল্লেখিত ছয়টি গুণ থাক আর না থাক, রাজা, পুরোহিত, আচার্য, গুরুদেব, সাধু-সন্যাসী প্রভৃতিকে যে ভগবান বলা হয়েছে তেমন প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

এমনকি শিবের ষাঁড়কেও যে ভগবান বলা হয়ে থাকে তার শাস্ত্রীয় প্রমাণও ইতোপূর্বে আমরা পেয়েছি। অতএব ছয়টি গুণে সীমাবদ্ধ যে নাম, আর মানুষ তো বটেই ষাঁড়কে পর্যন্ত যে নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে, তাকে অসীম অনন্ত বিশ্বপ্রভুর আসল নাম তো নয়ই এমনকি গুণ-বাচক নাম বলে মেনে নেয়া হলেও যে তাঁর মর্যাদা ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন করা হয় সেকথা বুঝবার জন্যে অনেক বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

মোটকথা, ভগবান শব্দের দ্বারা বিশ্বপ্রভুর অসীমত্বকেই-মাত্র ছয়টি গুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়নি— তাঁকে মানুষ, গরু, প্রাকৃতিক পদার্থ, প্রভৃতির পর্যায়ভুক্ত করে তাঁর মর্যাদাও ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে এবং হয়ে চলেছে।

আর যেহেতু এই নাম এবং নামের সংজ্ঞা এ উভয়ই মানুষের কল্পনা ও জ্ঞান বুদ্ধি-প্রসূত, অতএব কেউ যদি একে বিশ্বপ্রভুর আসল নাম বলে চালিয়ে যেতে চান তবে তিনি মস্তবড় ভুল করবেন।

ঈশ্বর : ঈশ্বর অর্থ প্রভু, কর্তা, অধিপতি, অধিকারী প্রভৃতি। উল্লেখ্য, বেদ-পুরাণাদির বর্ণনানুযায়ী ভগবান এবং ঈশ্বর এ দু'টি নামই যে সমার্থবোধক সেকথা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে।

ব্যবহারিকদিক দিয়ে দিল্লীশ্বর—দিল্লীশ্বরী, বঙ্গেশ্বর—বঙ্গেশ্বরী, ভারতেশ্বর—ভারতেশ্বরী, ইংলন্ডেশ্বর—ইংলন্ডেশ্বরী, প্রাণেশ্বর—প্রাণেশ্বরী, জীবিতেশ্বর—জীবিতেশ্বরী প্রভৃতির প্রচলন রয়েছে।

বলা আবশ্যক, প্রাণেশ্বর-প্রাণেশ্বরী এবং জীবিতেশ্বর-জীবিতেশ্বরী প্রভৃতি শব্দগুলো সাধারণত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো—স্বামী যদি স্ত্রীর প্রাণের ঈশ্বর হয় তবে আসল ঈশ্বর যিনি তিনি কিসের ঈশ্বর? বা কোথাকার ঈশ্বর?[১]

অনুরূপভাবে বঙ্গের ঈশ্বর, ভারতের ঈশ্বর, ইংলন্ডের ঈশ্বর প্রভৃতি অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতিটি দেশকে যদি এক একজন ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত বলে দাবী ও বিশ্বাস করা হয় তবে আসল ঈশ্বরের অধিকারটা রইলো কোথায়?

ইতিহাস এই নিষ্ঠুর সত্যই আমাদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরে যে, সেই আদিম যুগ থেকে 'লাঠির জোরে মাটি দখল করে নিয়ে' এক একজন নিজেকে দখলীকৃত এলাকার ঈশ্বর, অধিশ্বর, মালিক, প্রভু, দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বা একচ্ছত্রাধিপতি বলে ঘোষণা করেছে এবং ঈশ্বরের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে নিজের ইচ্ছা ও অভিলাষ জোর করে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া পুরাণ ভাগবতাদি ধর্মশাস্ত্রের ঈশ্বর-ঈশ্বরীদের সম্পর্কে যেসব বর্ণনা রয়েছে তা থেকে তাঁদের মধ্যে নানা ধরনের কোন্দল, কোলাহল, হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকার কথাও আমরা জানতে পারি।

দিল্লীর বাদশাহকে 'জগদীশ্বর' বলে আখ্যায়িত করার কথাও আমাদের অজানা নয়; বেদ-পারগ ব্রাহ্মণমাত্রকেই যে সর্ব-জগতের ঈশ্বর বলে ঘোষণা করা হয়েছে ধর্মীয় বিধানের উদ্ধৃতি থেকে ইতোপূর্বে সেকথাও আমরা জানতে পেরেছি।

যাঁদের ভগবান-ভগবতী বলা হয়েছে আবার তাঁদেরই— ঈশ্বর-ঈশ্বরীও বলা হয়েছে। ভগবান-ভগবতীদের মত ঈশ্বর-ঈশ্বরীদেরও জন্ম-মৃত্যুর অধীন, রিপু-ইন্দ্রিয়ের বশ এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এইসব অন্যায় এবং অপ-প্রয়োগের ফলে ভগবান নামের মত ঈশ্বর নামটিও যে অসীম অনন্ত বিশ্বপ্রভুর আসল নাম তো নয়-ই এমনকি গুণবাচক নামরূপে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলেছে, আশা করি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই তা বুঝতে পারা যাবে।

গড : বাইবেলের মূল ভাষা হিব্রু; ইংরাজিতে অনুবাদ করে তার নাম বাইবেল রাখা হয়েছে। মূল ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা হলে গ্রন্থের

---

১. তাছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র, জগদীশ চন্দ্র, অখিলেশ্বর, নিখিলেশ্বর, সর্বেশ্বর, পরমেশ্বর প্রভৃতি নামের মানুষ প্রায় প্রতিটি ঘরেই বিদ্যমান। বলাবাহুল্য, এতদ্বারা শুধু আসল ঈশ্বরের পরিচয়কেই অস্পষ্ট করে তোলা হয়নি তাঁর মর্যাদাও ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে।

মৌলিকতা যে ক্ষুণ্ন হয়ে থাকে সেথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা জানি, কোনও বাক্যের অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে সাধারণত নাম-বাচক শব্দের রূপান্তর ঘটানো হয় না; কেননা, তাহলে নামটি তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। বাইবেলের অনুবাদ করার সময় এই সাধারণ নীতি উপেক্ষা করে মূল বাইবেলে বর্ণিত বিশ্বপ্রভুর নামটিকে 'গড'-এ পরিণত করা হয়েছে।* এটা যে শহীদুল্লাহকে বলীশ্বর বা বলীরাম বানানোর মতই হাস্যকর এবং তাৎপর্যহীন সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না।

বর্তমানে খৃস্টধর্ম যে ত্রিত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই সেকথা জানা রয়েছে। পিতা (ঈশ্বর স্বয়ং) পুত (যীশু) এবং পবিত্রাত্মা বা হোলিঘোস্ট এই তিনজন স্বতন্ত্র এবং পূর্ণ-ঈশ্বর মিলিতভাবে এক পূর্ণ-ঈশ্বর হওয়াই ত্রিত্ববাদের মূলকথা। এই ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী না হওয়া পর্যন্ত কোনও মানুষের মুক্তি যে সম্ভব নয় খৃস্টান-জগত খুব দৃঢ়ভাবে সেই দাবিই করে থাকেন।

যীশুখৃস্টের অদ্ভুত অলৌকিক জন্ম-বৃত্তান্ত, মৃত্যুর পর আকাশে উত্থান এবং পিতার আসনে তাঁর ডান ধারে উপবেশন, খৃস্টান-জগতের যাবতীয় পাপ-ভার মাথায় নিয়ে যীশুর আত্মদান প্রভৃতির কথা ছেড়ে দিলে বলা যেতে পারে যে, এই ত্রিত্ববাদের মাধ্যমে অর্থাৎ পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা বা পিতৃত্ব এবং পবিত্রত্ব এই তিনটি মাত্র গুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে অসীম অনন্ত বিশ্বপ্রভুর মর্যাদা নিদারুণভাবে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে।

বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী জানা যায় যে, 'গড'-এর নির্দেশে পবিত্রাত্মা বা হোলিঘোস্ট কর্তৃক যীশুর মাতা গর্ভবতী হয়ে যীশুকে প্রসব করেছিলেন।

অথচ এঁরা তিনজনই এক একজন স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ ঈশ্বর। উল্লেখ্য, এই ঘটনাকে বিখ্যাত মাওলানা মরহুম আকরাম খাঁ সাহেব তাঁর মোস্তফা চরিতে অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

তিনি লিখেছেন, 'পিতা একজন সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর, পুত্র যীশু একজন স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ ঈশ্বর এবং পবিত্রাত্মা আর একটি স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ ঈশ্বর। এক নম্বর ঈশ্বরের আদেশ মতে, দুই নম্বর ঈশ্বর পবিত্রাত্মা কর্তৃক মেরী গর্ভবতী হন এবং তিন নম্বর ঈশ্বর অর্থাৎ যীশুকে প্রসব করেন।+

সদাশয় পাদ্রী-পুরোহিতগণ ত্রিত্ববাদের উদ্ভব করে অসীম অনন্ত বিশ্বপ্রভু সম্পর্কে জনমনকে কত বড় বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত করেছেন এ থেকে তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাবে বলে আশা করি।

---

* যথাস্থানে মূল বাইবেলে বর্ণিত নামটির উল্লেখ করা হবে।

+ বিস্তারিত বিবরণের জন্যে মোস্তফা-চরিত ৫৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাছাড়া God শব্দের লিঙ্গ ও বচনের পরিবর্তন অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ এবং বহু বচনে ব্যবহারের রীতি প্রচলিত রয়েছে। দেব-দেবীদেরও God বা Goddess নামে অভিহিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। অতঃপর এই শব্দটিকে আর অসীম, অনন্ত, বিশ্বপ্রভু নাম হিসেবে ব্যবহারের কোনও সুযোগ আছে কি সুধী ব্যক্তিদের সেকথা ভেবে দেখার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

আল্লাহ: অতঃপর ইসলাম বিঘোষিত আল্লাহ নামটি সম্পর্কে আলোচনা করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, নামটির লিঙ্গ বা বচন নেই; ক্রিয়া বিশেষ্য বা গুণবাচক বিশেষরূপেও এটি ব্যবহৃত হয় না। পবিত্র কুরআনে বহু গুণবাচক নামের উল্লেখ থাকলেও এটি-ই তাঁর নিজস্ব এবং প্রকৃত নাম। এজন্যেই এ নামটিকে 'ইসমে আজম' বলা হয়ে থাকে।

ইসলামের দাবি হলো— মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শনের জন্যে সেই আদিকাল থেকেই যুগে যুগে দেশে দেশে আল্লাহর বাণীসহ মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটেছে। যত মহাপুরুষই এসেছেন তাঁদের সকলের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর জন্যে একটি মাত্র মুলনীতিই ঘোষণা করা হয়েছে। আর সেই মূল-নীতিটি হলো— 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ', অর্থাৎ, 'আল্লাহ ব্যতীত আর কোনও ইলাহ নেই।'

এতদ্বারা আমি একথাই বোঝাতে চাচ্ছি যে, তাঁর নাম যে 'আল্লাহ' এই মূলনীতির মাধ্যমে যুগে যুগে তিনি নিজেই বিশ্ববাসীকে সেকথা জানিয়ে দিয়েছেন।

জগতের শেষ এবং শ্রেষ্ঠনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবের মানুষেরা শত শত দেব-দেবীর পূজা করলেও আল্লাহ নামটি যে তাদের অপরিজ্ঞাত ছিল না তার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। তারা যে কোনও দেব-দেবীকে কোনও দিন এবং কোনও অবস্থায়ই এই নামে অভিহিত করেনি। বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধান ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে যে এই সব দেব-দেবীর পূজা করে চলেছে বলে দাবি করতো তেমন প্রমাণেরও অভাব নেই।

মোটকথা কেউ যদি মনে করেন যে, শুধু হযরত মুহাম্মদ (স)ই এই নামটি পরিজ্ঞাত ছিলেন অথবা শুধু পবিত্র কুরআনেই এই নামটি উল্লেখিত রয়েছে তবে তিনি মস্ত ভুল করবেন।

উল্লেখ্য, জমঈতে আহলে হাদিস-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা, প্রখ্যাত বাগ্মী, আলেম এবং চিন্তাবিদ মরহুম মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী সাহেব সুরাতুল ফাতিহার বঙ্গানুবাদে (তর্জুমানুল হাদিস ২০৫ পৃ.) এই নামটি সম্পর্কে নানা তত্ত্ব ও তথ্য তুলে ধরেছেন।

তাঁর তুলে ধরা এসব তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ এতই গুরুত্বপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী যে, সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই তা পড়ে দেখা দরকার। তাই নিম্নে তা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো :

একটি চমৎকার ব্যাপার এই যে, প্রাচীন সেমিটিক, ইব্রিয় (Hebrew), সিরিক (Syric), আরামিক (Aramaec), কলেডিয় (Chaladeau), হামুরাবি (Hammurabi) ও আরবি এবং এরিয়ন সংস্কৃত ভাষাসমূহে সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও উপাস্যের জন্য-অ-ল-হ্ ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন শব্দ দেখতে পাওয়া যায়।

ইব্রিয় (হিব্রু) ভাষায় El 'এল' এলোহিম (Elohim) ও (Eloa) এলোয়া শব্দের অর্থ : God as the all powerful, Elohim Plural Eloah. The true God. The creator and Moral Governor. The Hebrew title of most frequent occurence in the Old Testarment, expressing absolute divine power.[১] El শব্দের অর্থ— সর্বশক্তিমান পরম প্রভু। এলোহিম এলোয়ার বহু বচন, সত্য প্রভু, স্রষ্টা ও নৈতিক শাসনকর্তা। বাইবেলের পুরাতন বিধানে সৃষ্টিকর্তার এই উপাধি বহুলভাবে ব্যবহৃত-অনন্য-সাপেক্ষ স্বর্গীয় মহাশক্তিকে বোঝায়। কলেডিয় ও সিরিক ভাষায় 'এলোহিয়া' শব্দের প্রয়োগ তুল্য অর্থে দেখা যায়।

অতঃপর শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাহেব শব্দ কল্পদ্রুম, ভারতকোষ (বাঙ্গালা ভাষার অভিধান)-এর ১১৫ পৃষ্ঠা থেকে 'অল্ল' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য সম্পর্কীয় বাক্যসমূহ উদ্ধৃত করে উক্ত 'অল্ল' শব্দ দ্বারা যে সর্বজ্ঞ, সর্বগ্রাহী এবং সর্বত্র বিরাজমান বিশ্বপ্রভুকেই বোঝায় সেকথাকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।

উপসংহারে তিনি বলেছেন— 'মোটকথা এই যে, সকল ভাষাতেই পরম প্রভু বিশ্বস্রষ্টার নিজস্ব নাম আল্লাহ এবং ইতিহাসের সূচনা থেকে তিনি এই নামেই সকল জাতির নিকট পরিচিত।'

অতঃপর অন্যতম বিশ্বস্ত ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, ক্রুশে আবদ্ধ হওয়ার সময়ে মৃত্যু আসন্ন জেনে যীশুখৃস্ট আকুল কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন— ايلى! ايلى! لما سيفتى؟

অর্থাৎ— 'হে এলি! হে এলি! তুমি আমাকে কেন পরিত্যাগ করিলে, অতএব জীবনের এই সর্বাধিক সংকট মুহূর্তে যীশুখৃস্ট যে বিশ্বপ্রভুকে 'এলি' নামে সম্বোধন করেছিলেন, বাইবেলের এ বর্ণনা থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

---

১. Standard Dictionary

এবার পবিত্র কুরআনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেও আমরা দেখতে পাবো যে, বিশ্বপ্রভুর প্রকৃত নাম যে 'আল্লাহ' স্বয়ং বিশ্বপ্রভু নিজেই সেকথা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছেন।

অতএব এই আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, বেদ, বাইবেল এবং কুরআন পৃথিবীর এই সর্বাধিক বিশ্বস্ত ও সর্বাধিক জন-সমর্থিত তিনখানা ধর্মগ্রন্থই বিশ্বপ্রভুর আসল নাম হিসেবে যথাক্রমে অল্ল (অল্লো, অল্লোহ), এলি এবং আল্লাহ্ শব্দের উল্লেখ করেছে। তাছাড়া পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাসমূহে বিদ্যমান এল, এলোহিম, এলোয়া, এলোহিয়া, অল্ল, অল্লা প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সেই অতীতকাল থেকেই সর্বশক্তিমান এবং অসীম অনন্ত বিশ্বপ্রভুকে বোঝানো হয়ে আসছে। বলাবাহুল্য অল্ল, অল্লা, অল্লোহ, এলি, আল্লাহ, এল, এলোহিম, এলোয়, এলোহিয়া প্রভৃতি শব্দগুলো শুধু একই মূল ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন নয়— সমার্থবোধকও।

ইতোপূর্বে আল্লাহ শব্দটির তাৎপর্য সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। অতঃপর উক্ত শব্দের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে।

০ এই নামটির লিঙ্গ এবং বচন নেই। অর্থাৎ— অন্য কোনও লিঙ্গে এবং বহুবচনে এর ব্যবহার প্রচলিত নেই; ক্রিয়া বিশেষ্য বা গুণবাচক-বিশেষ্যরূপেও এটি ব্যবহৃত হয় না। কোনও দেব-দেবী বা কোনও মানুষকে কোনওদিন এই নামে অভিহিত করা হয়নি। মোটকথা অনাদি অনন্ত বিশ্বপ্রভুর নাম হিসেবে আবহমানকাল ধরে এর স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হয়েছে।

একমাত্র পবিত্র কুরআনেই এর ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়। বিশ্বপ্রভু যে অসীম এবং অনন্ত তার বিভিন্ন স্থানে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা তো রয়েছেই, তদুপরি প্রায় প্রতিটি বাক্যের মধ্যেই এই অসীম অনন্তের ভাবকে পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছে। মানবীয় চিন্তাধারার স্বাভাবিক প্রবণতা কোনও অবস্থায়ই যাতে সেই অসীম সত্তাকে সীমাবদ্ধ করার প্রয়াস না পায় সে জন্যে তার একাধিক স্থানে সুস্পষ্টরূপে বলে দেয়া হয়েছে। যথা :

"(হে নবী!) আপনি বলুন, সমুদ্রের পানিকে যদি কালিতে পরিণত করা হয় এবং তদ্বারা আমার প্রতিপালক প্রভুর কথা লেখা হয় তবে লেখা শেষ না হতেই কালি নিঃশেষিত হয়ে যাবে। এমনকি, অনুরূপভাবে কালির পরিমাণ যতই বৃদ্ধি করা হোক লেখা শেষ করা যাবে না।" (আল-কুরআন ১৬ : ১৯)

০ উল্লেখ্য, যিনি অজড়, অমর এবং অবিধ্বংসী অর্থাৎ অনন্তকালব্যাপী যাঁর অস্তিত্ব বিরাজমান, তাঁর নামটিও যে তাঁর সত্তার সাথে সাথে অবিধ্বংসীরূপে অনন্তকাল বিরাজমান থাকবে আর তাই যে স্বাভাবিক সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

অতএব যেসব নামকে তাঁর আসল নাম বলে দাবি করা হয়ে থাকে তার মধ্যে যে নামটি অবিধ্বংসী অর্থাৎ কোনও অবস্থায়ই যে নামটি ধ্বংস হবে না, সেটি এবং একমাত্র সেটিই যে তাঁর আসল নাম বলে গৃহীত হতে পারে সেকথা সহজেই অনুমেয়।

এবারে আসুন, নমুনাস্বরূপ আল্লাহর নামের সাথে ওসব দাবিকৃত নামগুলোর যেকোনও একটি বেছে নিয়ে পর্যালোচনার সাহায্যে ওসবের কোন্‌টি অবিধ্বংসী তা লক্ষ্য করি।

'ভগবান' : বলাবাহুল্য শব্দটিতে যথাক্রমে ভ, গ, বা এবং ন এই চারটি অক্ষর রয়েছে। ধরে নেয়া যাক যে, ভুলবশত শব্দটির প্রথম অক্ষর 'ভ' লিখিত হয়নি। অথবা অন্য কোনও কারণে অক্ষরটি বাদ পড়েছে, ফলে শব্দটি 'গবান' এ পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অক্ষরবাদ পড়লে শব্দটি যথাক্রমে 'বান' এ 'ন'-তে পরিণত হবে।

এবার লক্ষণীয়, এই পরিবর্তিত শব্দ অর্থাৎ 'গবান', 'বান' এবং 'ন' এদের কোনওটি দ্বারাই ভগবান বা বিশ্বপ্রভু বোঝায় না। অর্থাৎ একটিমাত্র অক্ষর বাদ পড়ার সাথে সাথে নামটি আর নাম থাকে না— শব্দটিই অকেজো এবং অর্থহীন হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, ঈশ্বর, গড প্রভৃতি অর্থাৎ এ ধরনের যত নামই রয়েছে এভাবে পর্যালোচনা করা হলে তার সবগুলোর একই পরিণতি আমরা দেখতে পাবো।

الله (আল্লাহু) শব্দটিতে একটি ا দু'টি ل এবং একটি ه অক্ষর রয়েছে। ওপরোক্তভাবে ক্রমশ যদি একটি দু'টি করে অক্ষর বাদ দেয়া যায় তবে শব্দটি ক্রমান্বয়ে لله (লিল্লাহে), له (লাহু), ه (হু)তে পরিণত হবে। পবিত্র কুরআনের পাঠক মাত্রেরই জানা রয়েছে যে, লিল্লাহ শব্দের অর্থ— আল্লাহর, বা আল্লাহর জন্য। (যথা লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফীল আরদ। অর্থাৎ আকাশ ও ভূতলে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর।)

লাহু শব্দের অর্থ তাঁর। (যথা লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন কাদির। অর্থাৎ রাজ্য-রাজত্ব এবং যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র তাঁরই এবং তিনিই সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান) আর 'হু' শব্দের অর্থ হলো তিনি বা আল্লাহ (যথা হু আল্লাহুল্লাজি লা-ইলাহা ইল্লাহু। অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ— যিনি ছাড়া আর কোনও উপাস্য নেই)। অতএব এই নামটিই যে অবিধ্বংসী এবং বিশ্বপ্রভুর আসল নাম, এ পর্যালোচনা দ্বারাও সেকথাই প্রমাণিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, পৌরাণিক গ্রন্থসমূহের কোনও কোনওটিতে কোনও ভগবান কর্তৃক হাজার হাজার বছর ধরে যোগ-নিদ্রায় অভিভূত থাকা, কোনও ভগবান কর্তৃক

স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে উন্মাদ হয়ে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করা, প্রশ্রাব করে শ্বশুরের যজ্ঞ ভাসিয়ে দেয়া, গাঁজা-ভাং খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা প্রভৃতির বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়।

আবার কোনও গ্রন্থপাঠে এক ভগবান কর্তৃক নারীরূপ ধারণ করে অন্য ভগবানকে প্রলুব্ধ-প্ররোচিত করা, পর-স্ত্রী দর্শনে কামাতুর হয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, কার্যোদ্ধারের জন্যে ছলনা-প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়া প্রভৃতি নানা ঘটনা জানতে পারা যায়।

তাছাড়া ভগবান কর্তৃক মনুষ্য, মৎস্য, কচ্ছপ, শূকর প্রভৃতিরূপে জন্মগ্রহণ, ভগবানের বিবাহ, সন্তান উৎপাদন, হিংসা, বিদ্বেষে লিপ্ত হয়ে কোন্দল—কোলাহল সৃষ্টি প্রভৃতির কথা তো প্রায় প্রতিটি পাতায়ই লিখিত রয়েছে।

উল্লেখ্য, এসব বিবরণ পাঠ করে লজ্জার সাথে সাথে নিদারুণ বেদনাও বোধ করেছি, বিশ্বপ্রভুর প্রকৃত পরিচয় রয়েছে এমন বিবরণ পাঠ করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। অবশেষে পবিত্র কুরআনে বিশ্বপ্রভুর প্রকৃত পরিচয়-সূচক বিবরণাদি খুঁজে পেয়ে মুগ্ধ-বিমোহিত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি।

মুসলমান মাত্রেরই এসব বিবরণ জানা রয়েছে। অন্যদের অবগতির জন্যে পবিত্র কুরআনের এ সম্পর্কীয় দু'টি মাত্র বাণীর বঙ্গানুবাদ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

সত্যানুসন্ধিৎসা এবং উদার ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে যিনিই এ দু'টি বাণী পাঠ করবেন তিনিই যে আমার মত মুগ্ধ-বিমোহিত হবেন এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন সে সম্পর্কে আমি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি।

বলা আবশ্যক, এই দু'টির একটি 'আয়াতুল কুরসি' এবং অন্যটি সূরা 'ইখ্‌লাস্' নামে পরিচিত। এ সম্পর্কে পটভূমিকাস্বরূপ বলা প্রয়োজন যে, পরম শ্রদ্ধেয় খানবাহাদুর আহসান উল্লাহ সাহেবের সাথে আলোচনাকালে তিনি যে সব বইপুস্তক আমাকে দিয়েছিলেন, তাঁর লিখিত 'কুরআন ও হাদিসের উপদেশাবলী' সেগুলোর অন্যতম।

উক্ত পুস্তকে তাঁর লিখিত সূরা ইখ্‌লাসের ভাবানুবাদটি পাঠ করে সেদিন আমি শুধু মুগ্ধই হইনি বরং এই ছোট্ট সূরাটিতে বিশ্বপ্রভুর সত্যিকারের পরিচয়ও আমার কাছে সুন্দর করে ফুটে উঠেছিল।

সকলের অবগতির জন্যে উক্ত ভাবানুবাদটি এখানে তুলে ধরা না হলে মস্ত বড় অন্যায় করা হবে বলে আমি মনে করি। অতএব প্রথমে উক্ত সূরার বঙ্গানুবাদ এবং পরে ভাবানুবাদটি তুলে ধরা যাচ্ছে।

"আল্লাহ্ ব্যতীত কোনও উপাস্য নেই, তিনি চিরজীবন্ত ও সর্বত্র বিরাজমান। তন্দ্রা অথবা নিদ্রা তাঁকে আকর্ষণ করে না; নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলে যা কিছু

আছে তা একমাত্র তাঁরই .. .. .. তাঁর আসন নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে কণামাত্রও বিব্রত হতে হয় না, তিনি সমুন্নত— মহীয়ান।"

—আয়াতুল কুরসি

"(হে নবী! আপনি বিশ্ববাসীকে) বলুন, আল্লাহ এক এবং একক, আল্লাহ অভাবশূন্য (সুতরাং অপূর্ণতা, অক্ষমতা, পরমুখাপেক্ষিতা প্রভৃতি থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত)। তিনি জনক বা জাত নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

—সূরা ইখ্‌লাস

ভাবানুবাদটি হলো :

চিরসত্য স্বপূর্ণ দৈন্য নাহি।
আদি নাহি তব অন্ত নাহি।
চিরসত্য স্বপূর্ণ দৈন্য নাহি।
পুত্র নাহি তব কন্যা নাহি
চিরবর্তমান তুমি নাস্তি নাহি।
জন্ম নাহি তব মৃত্যু নাহি
চিরএকক মালিক তুল্য নাহি
উপমাহীন তুমি তোমা চাহি।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ

[বইখানা (২য় সংস্করণ) ছাপানোর কাজ বেশ কিছুটা এগিয়েছে। এমন সময়ে জানা গেল যে, জনৈক পুস্তক-প্রকাশক গোপনে গোপনে এই বইখানারই ছাপার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এই অন্যায় কাজ থেকে তাকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে একান্ত বাধ্য হয়েই হঠাৎ খবরের কাগজে বিজ্ঞান ছাপাতে হয়েছিল। আশা ছিল যে, এক সপ্তাহের মধ্যেই ছাপার কাজ শেষ করে গ্রাহকদের চাহিদা মিটানো সম্ভব হবে।

ছাপানোর কাজ শেষ করার জন্যে ব্যস্ত হয়েছি, এমন সময়ে খুলনার জনৈক 'বনচারী'র একখানা পত্র হস্তগত হওয়ায় সাময়িকভাবে ছাপার কাজ বন্ধ রেখে নতুন করে লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়। তবে ইতোমধ্যে যাঁরা বইখানা পাঠানোর জন্যে পত্র লিখেছিলেন অথবা অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে ছিলেন সাথে সাথে তাঁদের জানিয়ে দেয়া হয় যে, 'অনিবার্য কারণবশত বইখানা পাঠাতে বিলম্ব হবে।'

উল্লেখ্য, 'বনচারীর' পত্র পাওয়ার জন্যেই একান্ত বাধ্য হয়ে বইখানার কলেবর যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে হয়েছে এবং কতিপয় প্রশ্নের উত্তর দেয়ার উদ্দেশ্যে বক্ষ্যমাণ নিবন্ধটি লিখতে হয়েছে। তাছাড়া মুদ্রণযন্ত্র বিকল হয়ে পড়ায়ও বেশ কিছুদিন ছাপার কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছে। কোনও অনিবার্য কারণে বইখানা পাঠাতে বিলম্ব হলে আশা করি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ থেকে তা বুঝতে সক্ষম হবেন। পুস্তকের কলেবর বাড়ানোর জন্যে মূল্যও কিছুটা বাড়াতে হয়েছে বলে আমি বিশেষভাবে দুঃখিত।]

বনচারীর প্রশ্নের উত্তর

বনচারী বাবু! আপনার পত্র পেয়েছি। আমার পরম সৌভাগ্য যে, হিন্দুসমাজের ভদ্র, শিক্ষিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সকলেই লোকালয়ে বসবাস করেন। সুতরাং লোকালয়ের আইন-কানুন ও নীতিনিয়ম প্রভৃতি বেশ ভালভাবেই তাঁদের জানা রয়েছে। আর ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার যে প্রতিটি মানুষের জন্মগত সেকথাও তাঁদের অজানা নয়।

আপনার মত দু'চারজন ছাড়া সাধারণ শ্রেণীর হিন্দুরাও সকলেই লোকালয়ে বসবাস করেন, সুতরাং তাঁদেরও লোকালয়ের আইন-কানুন জানতে এবং মেনে চলতে হয়। অন্যথায়, আপনার মত বনচারীর সংখ্যা বেশি হলে কত বিয়ারিং পত্র যে আমাকে পেতে হতো, আর নিজের পয়সা খরচ করে এসব গালি-গালাজ এবং নিন্দা-কুৎসা ও হুমকি-ধমকির কথা হজম করতে হতো তার ইয়ত্তা করা কঠিন।

তবে বনচারী হলেও আপনি যে বেশ চতুর সেকথা স্বীকার করতেই হবে। কেননা, একজন ম্লেচ্ছকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করার মত এমন অশেষ পুণ্য জনক কাজটি বিনা পয়সায় সমাধা করার সুযোগ নেয়ার কথা কোনও বোকার পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব ছিল না।

খুব সম্ভব বনচারী বলেই লোকালয়ের, বিশেষ করে আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পূর্বের মুসলিম অধ্যুষিত লোকালয়গুলোর সাথে আপনার পরিচয় ঘটার সুযোগ হয়নি। সে সুযোগ হলে অবশ্যই জানতেন যে, মুসলমান মেয়েদের অন্য অনেকের মত 'শিকার ধরে' নিজেদের 'আইবুড়ো' নাম ঘোচাতে বা পিতা-মাতাকে 'কন্যাদায়' হতে মুক্ত করতে হয় না। কেননা, মুসলমান মেয়েরা পিতা-মাতা বা সমাজের জন্যে কোন সমস্যা নয়। কৌলিন্য-প্রথার অসহায় শিকারও তাদের হতে হয় না; 'বরপণ' দিয়ে সর্বশান্ত হওয়ার প্রশ্নের মোকাবিলাও তাদের করতে হয় না।

তাছাড়া মুসলমান সমাজটার গঠনটাই এমন যে, পর্দাব্যবস্থার কড়াকড়ি এবং স্বাভাবিক মর্যাদাবোধের প্রশ্নে কোনও মুসলমান মেয়ের পক্ষে নিজেদের অঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা সাক্ষাতের সুযোগই সেখানে নেই। এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা এবং চাল-চুলাহীন কোনও ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রেমে পড়ার সুযোগ তাদের কি করে হতে পারে?

আর এ ব্যাপারে মুসলমানসমাজ শুধু ভীষণভাবে অনুদারই নয়, ভয়ঙ্কর-ভাবে মারমুখোও। অতএব অন্য ধর্মাবলম্বী কোনও মানুষের পক্ষে কোনও মুসলমান মেয়ের সাথে প্রেম করতে যাওয়া কতখানি সম্ভব, সেটা বাস্তবের নিরিখে যাচাই করে দেখা অথবা এসব হীন মন্তব্য থেকে বিরত থাকা আপনার উচিৎ ছিল বলে মনে করি।

তবে কুৎসা রটনাই যাদের অভ্যাস, তাদের কোনও কিছু যাচাই করে দেখার প্রয়োজন হয় না। বিশেষ করে সে রটনার পশ্চাতে যদি কোনও গরজ থাকে তবে তো আর কথাই নেই।

বলা আবশ্যক, পত্রের মাধ্যমে আপনি যেসব হুমকি-ধমকি দিয়েছেন, সেগুলোর সাথে আমি মোটেও অপরিচিত নই। সুদীর্ঘ চল্লিশটি বছর ধরেই আপনার মত 'বনচারীরা' এ কাজ বেশ নিষ্ঠার সাথেই চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া যুক্তির দিকদিয়ে যারা দীন তারা যে শক্তির আশ্রয় নিয়ে থাকে সেকথাও

সকলেরই জানা রয়েছে। আর জানা রয়েছে বলেই শক্তি প্রয়োগের হুমকি উঁচিয়ে রেখে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত থাকার যে উপদেশ আপনি দিয়েছেন, সেটা আমার মনে কণামাত্র ভীতি সঞ্চারেও সক্ষম হয়নি।

আর যেহেতু লেজ-এর অভিজ্ঞতা বনচারীদেরই বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ, অন্তত তাই স্বাভাবিক, অতএব তা নিয়ে আলোচনায় সময়ক্ষেপণ করাকে আমি অনর্থক বলেই মনে করি।

তবে গীতার যে শ্লোকটির কিয়দংশের উদ্ধৃতি দিয়ে আপনি প্রকারান্তরে 'স্বধর্মের' নামে আমাকে 'পৈত্রিক ধর্মে' ফিরে যাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন একান্ত বাধ্য হয়েই সে সম্পর্কে আমাকে দু'কথা বলতে হচ্ছে। অবশ্য আলোচনার শুরুতেই বলে রাখতে হচ্ছে যে, স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল সাধারণ হিন্দুদের ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে আগা-গোড়াই শ্লোকটির তাৎপর্য সম্পর্কে মন-গড়া ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। আর আপনিও সেই ধোকার অসহায় শিকারে পরিণত হয়ে মন-গড়া তাৎপর্যই তুলে ধরেছেন। আপনার অবগতির জন্যে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা থেকে অর্থসহ উক্ত শ্লোকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

শ্রেয়ান স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পর ধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্ম্মে নিধং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

অর্থাৎ— সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা কথঞ্চিৎ অঙ্গহীন স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে থাকিয়া নিধনও ভাল (কারণ তাহাতে স্বর্গাদি প্রাপ্তি হয়), কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ (কারণ উহা নরকপ্রাপক)। —শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ৩য় অঃ, ৩৫ শ্লোক।

লক্ষণীয়, এখানে 'সুন্দর'কে শ্রেষ্ঠ বলা, এই 'অঙ্গহীন' স্বধর্মকে আঁকড়ে থেকে 'নিধন হওয়াকে' ভাল বলা, আর যে ধর্ম অঙ্গহীন এবং যাকে আঁকড়ে থাকার সাথে নিধন হওয়ার প্রশ্ন জড়িত রয়েছে তাকে স্বর্গাদি প্রাপ্তির কারণ বলা প্রভৃতির যৌক্তিকতা নিয়ে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে। কিন্তু স্থানাভাববশত সেসব প্রশ্ন এখানে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে না। অগত্যা শুধু 'স্বধর্ম' শব্দের তাৎপর্যই এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা যাচ্ছে।

বলাবাহুল্য, 'স্বধর্ম' শব্দের অর্থ হলো নিজের ধর্ম। এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, নিজের ধর্ম বলতে কি বোঝায় বা কি বোঝা উচিৎ?

প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল এবং সূক্ষ্ম, সুতরাং দু'চার কথায় এর উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। অথচ বিস্তারিত আলোচনার সুয়োগও এখানে নেই। অগত্যা সহৃদয় পাঠকবর্গের ভেবে দেখার জন্যে মাত্র কয়েকটি দিকের প্রতি আলোকপাত করা যাচ্ছে।

(ক) আমরা জানি, সাধারণত কিছু অর্জন-উপার্জনের দু'টি পথই রয়েছে। তার একটি হলো উত্তরাধিকার সূত্র আর অন্যটি হলো ব্যক্তিগত চেষ্টা-সাধনা।

(খ) যেহেতু ধর্ম অন্যান্য পৈত্রিক সম্পদের মত একটি সম্পদ নয় এবং পৈত্রিক সম্পদ যেভাবে হস্তান্তর করা হয়ে থাকে, ধর্ম সেভাবে হস্তান্তরিত হয় না,

হওয়া সম্ভবও নয়; অতএব উত্তরাধিকার আইনের কুত্রাপি ধর্মকে পৈত্রিক সম্পদের তালিকাভুক্ত করা হয়নি।

(গ) জন্ম-সূত্রে বা রক্তের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে পৈত্রিক সম্পদের অধিকার অর্জিত হয়। সুতরাং শুধু জন্ম-সূত্রে বা রক্তের সম্পর্ক সাব্যস্ত হলেই কোনও চেষ্টা-সাধনা ছাড়াই পৈত্রিক সম্পদ লাভ করা যায়।

(ঘ) পক্ষান্তরে ধর্মের ভিত্তি হলো অন্তরের অটল ও অবিচল বিশ্বাস; আর একমাত্র ব্যক্তিগত চেষ্টা-সাধনা দ্বারাই তা অর্জন করা সম্ভব।

(ঙ) অনেক ধার্মিক ব্যক্তির পুত্রকে চরম অধার্মিক এবং অধার্মিকের পুত্রকে চরম ধার্মিক হতে দেখা যায়। এ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে, উত্তরাধিকার সূত্রে কেউ ধার্মিক বা অধার্মিক হয় না— হওয়া সম্ভবও নয়।

তাছাড়া উত্তরাধিকার আইনে যেসব সম্পদের উল্লেখ রয়েছে, তা লাভের জন্যে পিতার আনুগত্য করতে হয়ে। পক্ষান্তরে ধর্ম নামক সম্পদ লাভের জন্যে আনুগত্য করতে হয় আচার্য, গুরু বা সিদ্ধপুরুষদের। অতএব, শুধু সম্পদ দু'টিই যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এবং তা অর্জনের পথও যে সম্পূর্ণরূপেই ভিন্ন, সেকথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

(চ) ধর্মের মূল লক্ষ্য হলো বিশ্বপ্রভুর নৈকট্য অর্জন বা মানবমনের সাথে তাঁর যোগসূত্র স্থাপন। আর বিভিন্ন ধর্মীয় বিধানে এ নৈকট্য অর্জন বা যোগসূত্র স্থাপনের উপায় বা পথ-পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। ধর্মীয় বিধানের সংখ্যা অনেক; এগুলোর মধ্যে কোনটি সর্বাধিক উপযোগী, সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও সর্বাধিক বাস্তব-সম্মত, তা যাচাই ও গ্রহণ করার দায়িত্ব-মানুষের। কেননা ভাল-মন্দ যাচাই করার যোগ্যতা একমাত্র মানুষকেই দেয়া হয়েছে। আর এ যোগ্যতার জন্যেই সে জীবশ্রেষ্ঠ— আশরাফুল মাখলুকাত।

এ যোগ্যতার অন্যায় ও অপব্যবহারকারীরা যে পশু অপেক্ষাও হীন, এমনকি মানব পদ-বাচ্য হওয়ারই অযোগ্য, ধর্মীয় বিধানসমূহে সেকথা পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে তারা অন্ধ-বিশ্বাসী আর অন্ধ-বিশ্বাসীদের বিবেক যে মৃত সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

(ছ) বিশ্বপ্রভুর নৈকট্য অর্জন বা তাঁর সাথে অন্তরের যোগসূত্র স্থাপনই হলো জীবনের মূল লক্ষ্য। আর ধর্মীয় বিধানে রয়েছে এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথ-নির্দেশ। এ পথ-নির্দেশ বা বিধি-বিধানের কোনটি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তা বিবেকের কষ্টিপাথরে যাচাই হওয়া একান্তরূপে অপরিহার্য। আর এমনিভাবে যাচাই করতে গিয়ে যেটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্তর কর্তৃক গৃহীত ও বিশ্বাসে পরিণত হবে সেটিই হবে তার স্বধর্ম।

(জ) অবশ্য পৈত্রিক ধর্ম যদি উত্তরাধিকার সূত্রে না হয়ে বরং বিবেকের কষ্টিপাথরে যথারীতি যাচাই-বাছাই করে সর্বোত্তম বলে বিবেচিত এবং অন্তর

কর্তৃক স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজস্ব বলে গৃহীত হয়, তবেই কেবলমাত্র এবং একমাত্র সেই অবস্থায়ই তা স্বধর্ম বলে আখ্যায়িত হতে পারে। অন্যথায় কোনওক্রমেই তাকে 'স্বধর্ম' বলা যেতে পারে না।

(ঝ) যেহেতু বিশ্বপ্রভুর নৈকট্য লাভ বা তাঁর সাথে যোগসূত্রে স্থাপনই ধর্মের মূল লক্ষ্য, আর যেহেতু স্বধর্ম ছাড়া অন্য কোনও ধর্মের প্রতি সুগভীর আস্থা পোষণ এবং যথাযোগ্য নিষ্ঠার সাথে তার বিধি-বিধান প্রতিপালন সম্ভব নয়, অতএব একমাত্র স্বধর্মই বিশ্বপ্রভুর নৈকট্য লাভ বা তাঁর সাথে অন্তরের যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হতে পারে। বলাবাহুল্য, এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্মে নিধন হওয়াকে শ্রেয় বলেছেন।

আশা করি, বনচারী বাবুরা অতঃপর স্বধর্মের তাৎপর্য অনুধাবনে সক্ষম হবেন। আর পৈত্রিক ধর্মকে 'স্বধর্ম' বলে মানুষের মনের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা যে কপট-বিশ্বাসী ও অন্ধ-বিশ্বাসীতে গোটা দেশ ভরে তুলেছেন এবং শুধু তাই নয়— এই ব্যবস্থার ফলেই যে অসংখ্য-অগণিত মানুষ ধর্ম, এমনকি বিশ্বপ্রভুর প্রতিও যে আস্থাহীন হয়ে পরেছে সেকথাও তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করবেন।

দেখুন বনচারী বাবু! মতলব সিদ্ধি আর সত্য-নিরূপণ যে এক কথা নয় ইচ্ছে করেই সেকথাটা আপনি এবং আপনারা ভুলে যান। তা না হলে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবানের মুখ-নিসৃত বলে কথিত আরো বহু শ্লোকই তো রয়েছে। আসলে মতলব সিদ্ধির জন্যেই সেগুলোকে আপনি এবং আপনারা পাশ কাটিয়ে চলেন।

০ উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— আমি গুণ এবং কর্মের ভিত্তিতে চারটি 'বর্ণের' উদ্ভব ঘটিয়েছি (ঐ ৩য় অঃ ১৩ শ্লোক) অথচ আপনার 'বর্ণ' শব্দের স্থলে 'জাতি' শব্দ প্রয়োগ করার মাধ্যমে শুধু শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বকেই চ্যালেঞ্জ করেননি— গুণ ও কর্মের পাঠ চুকিয়ে দিয়ে এবং কোটি কোটি মানুষকে দাস ও ছোটজাতে পরিণত করে মানবতার বুকেও ছুরিকাঘাত করেছেন।

তবে এতদ্বারা একটা ভাল কাজ যে আপনারা করেছেন, সেকথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। আর সে ভাল কাজটা হলো 'অন্তরে গভীর বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসানুযায়ী জীবন গঠন না করে কেউ ধার্মিক হতে পারে না'। পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থ এবং বিশ্ব-বিবেকের সর্ব-সম্মত এই রায়কে আপনারা নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

এখন গুণ থাকা এবং কর্ম করার কোনও প্রয়োজনই হয় না। কোনও হিন্দুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করামাত্রই সে হিন্দু হতে পারে— সারাজীবন একটি ধর্মের কাজ না করেও, এমনকি ধর্মের চরম বিরোধিতা করেও সে হিন্দুই থেকে যেতে পারে।

উল্লেখ্য, ধন-সম্পদহীন পিতার পুত্রেরা উত্তরাধিকার সূত্রে ধনী হতে না পারলেও আপনাদের এই ব্যবস্থা দ্বারা আপনারা ধর্মহীন পিতার পুত্র-কন্যাদের জন্মমাত্রই উত্তরাধিকার সূত্রে ধার্মিক শ্রেণীভুক্ত বলে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, ধন না থাকলে ধনী হওয়া যায় না। অথচ ধর্ম না করেও ধার্মিক হওয়ার এহেন অপূর্ব সুযোগ আপনাদেরই মহান অবদান।

০ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে 'সর্ব্বধর্ম্মঃ পরিত্যজ্য মামেকং শরণংব্রজ' অর্থাৎ— সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করতে একমাত্র 'আমাকে আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করা কে' স্বধর্ম বলে বোঝাতে চেয়েছেন, সেখানে আপনারা পৈত্রিক ধর্ম কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হলেও সেটাকেই 'স্বধর্ম' হিসেবে গ্রহণ করে নিধন হওয়াকে শ্রেয় বলে বোঝাতে চাচ্ছেন। শুধু তাই নয় এই তথাকথিত স্বধর্মের বোঝা জোর করে অন্য মানুষের মনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে মানুষকে কপট-বিশ্বাসী, অন্ধ-বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীতে পরিণত হওয়ার সু-বন্দোবস্ত করেছেন।

০ শ্রীকৃষ্ণ দেব-দেবী তথা মূর্তিসমূহকে নশ্বর বা ধ্বংসশীল, তামসিক পূজার্চনাকে পণ্ডশ্রম এবং দেব-দেবীদের পূজকগুলোকে বুদ্ধিহীন বলেছেন। (ঐ ৭ম অঃ ২৩, ২৪ শ্লোক, ১৪ অঃ ১ম শ্লোক) অথচ সেই নশ্বর মূর্তিগুলো নিয়ে আপনারা শুধু মত্ত হয়েই রয়েছেন তা নয়– মূর্তিপূজাকে বুদ্ধিমানের কাজ বলেও চালিয়ে যাচ্ছেন।

উদাহরণস্বরূপ মাত্র এ কয়েকটিরই উল্লেখ করা হলো। এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের এতসব বাণীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে যাদের বিবেকে বাধে না, তাদের ঐ একটি মাত্র শ্লোককে নিয়ে এত টানাটানির উদ্দেশ্যটা কি?

০ এসব তো হলো শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণী! যে বেদকে সর্বাধিক মান্য করেন বলে আপনারা বলে থাকেন, বিশ্বপ্রভুর আসল নাম যে অল্ল বা অল্লোহ উক্ত বেদে সেকথা সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হলেও আপনারা তা গ্রহণ করেননি। যারা বেদের বাণী এমনিভাবে অগ্রাহ্য করে, তাদের গীতার বাণী নিয়ে বেশি মাতামাতি করতে দেখলে সেটাকে মতলব সিদ্ধি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? অতএব বনচারী বাবু! স্বধর্মের তাৎপর্যটা আগে নিজে ভাল করে উপলব্ধি করুন, পরে অন্যকে উপদেশ দিতে আসবেন এটাই সনির্বন্ধ অনুরোধ।

মানবতার আর্তনাদ

'মানুষের চরিত্র-মাধুর্য' মানবতা সমৃদ্ধ-মহামান্বিত করেছে একথা যেমন সত্য, ঠিক তেমনি সত্য যে, এই মানুষেরই ভুল-ত্রুটি এবং জঘন্য কার্যকলাপ মানবতার মর্যাদা ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছে, তার বুকফাটা আর্তনাদের কারণ ঘটিয়েছে।

উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে যে, হাটে-বাজারে গরুছাগলের মত মানুষ বেচা-কেনা, ক্রীতদাস-দাসীদের করুণ কাহিনী, নরবলি ও নরমেধযজ্ঞের লোমহর্ষক বিবরণ প্রভৃতি আজও ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যায়নি, আজও সতীদাহ, গংগাসাগরে কন্যা নিক্ষেপ এবং সেবাদাসী-দেবীদাসীরূপে নারীত্বের চরম অবমাননার কথা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়নি।

আজও পবিত্র ধর্মের নামে বিধবা ও নারী নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। রক্ত, বর্ণ, বংশ, ধার্মিকতা প্রভৃতির দাবিতে কোটি কোটি মানুষকে পশু অপেক্ষাও হীনতর জীবনযাপনে এখনও বাধ্য করা হচ্ছে।

আজও দেশে-দেশে কালো বর্ণের মানুষদের ওপর শুধু-বর্ণ কালো হওয়ার জন্যে সাদা-বর্ণের মানুষদের অমানুষিক নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। আজও স্বৈরাচারী শক্তিসমূহের দম্ভ-অহংকার, শোষণ-নির্যাতন, মারণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা সারা বিশ্বে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে, মানুষে মানুষে, দেশে দেশে, জাতিতে-জাতিতে ঘৃণা-বিদ্বেষ, অনৈক্য-অবিশ্বাস এবং দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টির কূটনীতি মানবতার ধ্বংসকে নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করে চলেছে।

মোটকথা, প্রায় প্রতিটি ধর্মশাস্ত্রেই গাছের গোড়া কেটে ডগায় পানি ঢালার মতো একদিকে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে এবং অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে মানবতার মূলে কুঠারাঘাত করা হচ্ছে। আবার অন্যদিকে 'জীবমাত্রকে শিব' এবং 'নর-মাত্রকে নারায়ণ' বলে ডগায় পানি ঢালার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে বৃহৎ শক্তিবর্গ একদিকে বিশ্ব-বিধ্বংসী মারণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা পূর্ণোদ্যমে চালিয়ে যাচ্ছে। আবার অন্যদিকে বিভিন্ন 'মৈত্রীজোট' গঠন এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে 'মানবাধিকারের মহাসনদ' রচনা ও তা কার্যকরীকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

নিজের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে সীমাহীন অজ্ঞতার জন্যেই অপরকে মর্যাদাহীন করে নিজের মর্যাদা বাড়ানো এবং শোষণ-বঞ্চনায় অপরকে নিঃস্ব কঙ্কালে পরিণত করে নিজের অর্থ ও উদর স্ফীত করার মতো জঘন্য মানসিকতা সৃষ্টি হতে পারে।

তবে বলা আবশ্যক যে, মানুষের এই কার্যক্রম অন্যায় হলেও অস্বাভাবিক নয়। কেননা, মানুষের মধ্যে ভুল-ত্রুটি, পাপ-প্রবণতা প্রভৃতি রয়েছে এবং যত দূরেই হোক তার জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তাশীলতা, প্রজ্ঞা-প্রতিভা প্রভৃতিরও একটা সীমা রয়েছে।

এ ভুল-ত্রুটি এবং সীমাবদ্ধতা নিয়ে সকল সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে মানুষ সমস্যার পাহাড় গড়ে তুলেছে এবং শান্তির নামে অশান্তির দাবানল সৃষ্টি করেছে ও করে চলেছে।

আলোচনা আর দীর্ঘায়িত না করে অতঃপর বলা প্রয়োজন, ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই মানুষের প্রকৃত পরিচয় ও মর্যাদা সার্থকভাবে তুলে ধরেছে, আর সেই মর্যাদা যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্যে যথাযোগ্য পথ-নির্দেশও দিয়েছে।

মনে রাখা প্রয়োজন, এই পথ-নির্দেশ ছাড়া মানবতাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার দ্বিতীয় আর কোনও পথ নেই। এ সম্পর্কে ইসলাম যে নীতিমালা উপস্থাপিত করেছে স্থানাভাববশত তার কয়েকটি মাত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইতোপূর্বে ভারতীয় বিধান-সভা কর্তৃক 'বিধবাবিবাহ', 'অস্পৃশ্যতা বর্জন', 'সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা' প্রয়োজনবোধে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্নকরণ' প্রভৃতি যেসব আইন গৃহীত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো ইসলামেরই আইন; ইসলামই প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে ওগুলোকে আইনরূপেগ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

অতএব একথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না যে, ভারতীয় বিধান-সভাতে শেষপর্যন্ত ইসলামের বিধানই গ্রহণ করতে হয়েছে। অবশ্য সেকথা স্বীকার করার মতো মনোবল তাঁদের নেই। আর নেই বলেই নিজেদের বিধান-সভার বাঁকা পথে সেটা তাঁরা গ্রহণ করেছেন।

অতঃপর মানবতাকে যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ইসলাম যে নীতিমালা উপস্থাপিত করেছে তার কয়েকটি মাত্র নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা হলো :

০ 'মানুষ জন্মগতভাবে পাপী', 'পূর্বজন্মার্জিত', পাপ-পুণ্যের ফলে মানুষ ছোট বা বড় জাত হয়ে জন্মগ্রহণ করে 'অদৃষ্টের লিখনানুযায়ী মানুষ বড় বা ছোট জাত হয়' এই সব বলে মানুষে মানুষে ভেদ-বৈষম্য সৃষ্টি ও শোষণ-নির্যাতন চালিয়ে মানবতাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করার কাজ চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে মানবতার মর্যাদা চিরসমুন্নত করে রাখার জন্যে ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই মানুষকে 'আল্লাহর ভূতলস্থ প্রতিনিধি' বলে ঘোষণা করেছে। বলাবাহুল্য, এতদ্বারা গোটা সৃষ্টির ওপর মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মানুষের জন্যে এর চেয়ে অধিক মর্যাদা আর হতেই পারে না। উল্লেখ্য, 'মানুষ যে আল্লাহর প্রতিনিধি' পৃথিবীর আর কোনও ধর্মে সেকথা বলেনি।

০ মানুষ যে জীবশ্রেষ্ঠ বা সৃষ্টির সেরা জীব, নানাভাবে সেকথা আজ প্রমাণিত হয়েছে। অথচ ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই আবহমানকাল যাবৎ বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্বের কথা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছে।

০ রক্ত, বর্ণ, বংশ প্রভৃতির দাবিতে মানুষে মানুষে ভেদ-বৈষম্য ও ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টির প্রবণতা চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার জন্যে ইসলাম সুস্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেছে, হে মানবজাতি! তোমাদের একই জনক-জননী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব সকল মানুষই পরস্পর ভাই-ভাই। তাছাড়া তোমাদের সকলের সৃষ্টির মূল উপাদানও একটিই; আর তাহলো পা-এর তলার মাটি। অতএব ছোট-বড়, প্রভু-দাস, অভিজাত-অনভিজাত প্রভৃতি বৈষম্য সৃষ্টির কোনও অবকাশ নেই। আসলে তোমরা সকলে আল্লাহর দাস এবং আল্লাহই তোমাদের একমাত্র প্রভু।

০ বাহ্যিক আড়ম্বর এবং মৌখিক দাবিতে ধার্মিক সেজে যারা অপরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করে আসছিল, তীব্র কণ্ঠে তাদের এই কাজের প্রতিবাদ করে ইসলাম ঘোষণা করেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা (পোশাক-পরিচ্ছদাদি)-এর প্রতি লক্ষ্য করেন না। তিনি লক্ষ্য করেন তোমাদের অন্তর এবং তোমাদের কাজের প্রতি।

তাছাড়া, ধার্মিকতার প্রদর্শনী যাদের লক্ষ্য এবং যাদের কথায় ও কাজে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমন মানুষদের ইসলাম সুস্পষ্ট ভাষায় কপট বা মোনাফেক বলে ঘোষণা করেছে এবং কপট বা মোনাফেকরা যে মানবতার চরম শত্রু ও অভিশপ্ত পুনঃ পুনঃ সেকথাও বলে দিয়েছে।

০ মানুষের অন্তরকে আল্লাহর আরশ বলা হয়েছে এবং একথাও বলা হয়েছে যে, একটি অন্তরকে খুশি করা হাজার বার হজ্জ করার চেয়েও পুণ্য-জনক। পক্ষান্তরে, অন্যায়ভাবে কারো অন্তরে সামান্যতম আঘাত দেয়াও অমার্জনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

০ বিশেষভাবে উল্লেখ্য, হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হকের পরেই হক্কুল ইবাদ বা মানুষের হককে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং কঠোরভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, যদি কোনও ব্যক্তির হক আদায় না করা হয় তবে সে-ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়ে মার্জনা না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ সে-পাপ মার্জনা করবেন না।

উল্লেখ্য, এমনি ধরনের বহু উদাহরণই দেয়া যেতে পারে। মোটকথা, লাঞ্ছিত এবং আর্তনাদ-মুখর মানবতাকে যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইসলামবিঘোষিত ব্যবস্থার চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং কার্যকরী কোনও ব্যবস্থা হতে পারে কি না বা হওয়া সম্ভব কি না, গভীরভাবে সেকথা ভেবে দেখার জন্যে সুধী পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

সত্য সমাগত

একথা প্রায় সকলেরই জানা রয়েছে যে, সত্য যা তা সনাতন, চিরন্তন এবং সর্বজনীন। সময়, ভৌগোলিক সীমারেখা, ভাষা ও জাতীয়তার গণ্ডি প্রভৃতি কোনও কিছুই সত্যের গতিকে রোধ করতে পারে না।

ধর্মও একটি সত্য ব্যতীত নয়। তাছাড়া সকলের নিজ নিজ ধর্মকে সত্য, সনাতন এবং বিশ্বপ্রভুর নিকট থেকে সমাগত বলে দাবি করে থাকেন। এখন প্রশ্ন হলো—

বিশ্বপ্রভু একজন, সকল মানুষও একই উপাদানে গড়া মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য একটিই। এমতাবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন এতগুলো ধর্মের কি প্রয়োজন থাকতে পারে?

সকল ধর্মই বলে, বিশ্বপ্রভু সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান এবং ধর্মের উদ্ভাবকও তিনিই। এমতাবস্থায় অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী এবং সর্বশক্তিমান হয়েও তিনি আজ এক দেশের জন্যে এক ধর্ম কাল অন্য দেশের জন্যে অন্য ধর্ম, পরশু আর এক দেশের জন্যে আর এক ধর্মের উদ্ভব ঘটাবেন এটাইবা কি করে সম্ভব হতে পারে?

ধর্মগ্রন্থগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এক ধর্মে যাকে খাদ্য বলা হয়েছে অন্য ধর্মে তাকে অখাদ্য বলেছে, এক ধর্মে যা পাপ-জনক অন্য ধর্মে তা-ই পুণ্য-জনক, কোনও ধর্ম একজন উপাস্যের কথা বলে, কোনও ধর্ম বলে তিনজন উপাস্যের কথা, কোনও ধর্ম আবার বহু উপাস্যের কথা বলে। অনুরূপভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে উপাসনা পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন, আচার-অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন, প্রত্যয়সংক্রান্ত বিষয়বস্তুও ভিন্ন ভিন্ন।

বলাবাহুল্য, এইসব ভিন্নতার জন্যেই মানবজাতি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের অনুসারী হবার সুযোগ পেয়েছে, এক ভাই অন্য ভাইয়ের শত্রুতে পরিণত হয়ে হিংসা-বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আকাশ বাতাস বিষাক্ত বেদনার্ত করে তুলেছে।

এখন কথা হলো বিশ্বপ্রভুর মতো সুমহান সত্তার পক্ষে এরূপ পরস্পর-বিরোধী ধর্মীয় বিধানের প্রবর্তন, মানুষে মানুষে অনৈক্য, অবিশ্বাস ও ঘৃণা

বিদ্বেষের সৃষ্টি এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণ ঘটানো সম্ভব কি না? কোনও বিবেকবান ব্যক্তিই এটাকে সম্ভব বলে মেনে নিতে পারে না।

প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, জড়-অজড় নির্বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় এবং ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতির অসংখ্য জীব-জন্তু প্রভৃতিরা আবহমানকাল যাবৎ একই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে অতীব সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

এমতাবস্থায় অর্থাৎ যিনি একটি মাত্র নিয়মের অধীনে গোটা বিশ্বজগত পরিচালনায় সক্ষম, তিনি একই জাতীয়, একই আকৃতি-প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং একই উদ্দেশ্যে সৃষ্ট মানুষের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় বিধানের প্রবর্তন করবেন কেন? আর তার প্রয়োজনইবা কি? সকল সৃষ্টির জন্যে যেরূপ একটি মাত্র প্রাকৃতিক বিধান রয়েছে, ঠিক তেমনি সকল মানুষের একটি মাত্র ধর্মীয় বিধান থাকাই তো স্বাভাবিক।

যেহেতু সত্য যা তা সর্বজনীন এবং সর্বকালীন; অতএব ধর্ম যদি সত্য হয় তবে তাকেও সর্বজনীন হতেই হবে। একথা সহজে অনুমেয় যে, একদেশ বা এক মানবগোষ্ঠীর জন্যে যা সত্য, অন্য দেশ বা অন্য মানবগোষ্ঠীর জন্যে তা মিথ্যা হয়ে যেতে পারে না। এমতাবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন মানবগোষ্ঠীর জন্য সত্য বা ধর্ম যে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে না অর্থাৎ হওয়া যে সম্ভবই নয় সেই কথা বুঝবার জন্যে অনেক বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

আলোচনা আর না বাড়িয়ে অতঃপর বলা আবশ্যক যে, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে এসব প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে গিয়ে আমাকে শুধু নিদারুণভাবে হতাশই হতে হয়নি; নানারূপ জটিলতার আবর্তেও জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। স্থানাভাববশত এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। অগত্যা বাধ্য হয়ে সংক্ষেপে বলতে হচ্ছে :

০ সারা বিশ্বের তথা গোটা মানবজাতির জন্যে ধর্ম যে একটি-ই, মহান আল্লাহ সেকথা সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন। যথা :

"নিশ্চিতরূপে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন (ধর্ম, জীবন-বিধান)।"

কুরআন ৩ : ১৮

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ইসলাম শব্দের মর্মার্থ শান্তি, যা সকল মানুষের এমনকি সকল জীবেরই একমাত্র কাম্য। চূড়ান্ত পর্যালোচনায় এটা নিশ্চিতরূপে জানা গিয়েছে যে, মানুষ যা কিছু করে তার মূল্য লক্ষ্য থাকে শান্তি লাভ। অর্থাৎ মানুষের প্রতিটি কাজই অন্তত তার নিজের জীবনে শান্তি লাভের উদ্দেশ্যেই করে থাকে।

অথচ ভুলক্রটির জন্যে অনেক কাজেই শান্তির পরিবর্তে অশান্তি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। একমাত্র ধর্মীয় বিধানানুযায়ী পরিচালিত হলেই ভুলক্রটি এড়ানো এবং প্রকৃত শান্তিকে স্থায়ী ও সুনিশ্চিত করা সম্ভব। বলাবাহুল্য, সেই কারণেই আল্লাহ্প্রদত্ত ধর্মের নাম রাখা হয়েছে 'ইসলাম বা শান্তি; অন্য কথায় 'শান্তির ধর্ম'। ধর্মের যে এর চেয়ে সুন্দর, সার্থক, সাবলীল এবং তাৎপর্যপূর্ণ নাম আর হতে পারে না সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না।

সকল মানুষ যে একই জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ যে সকলের একমাত্র প্রভু এবং প্রতিপালক সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা "আর (দেখ, তোমাদের এই জাতিগুলি মূলত একই জাতি এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক প্রভু)। সুতরাং (আমারই অর্চনার পথে তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও এবং) একমাত্র আমাকেই ভয় করে চল এবং সৎকার্যে তৎপর থাক।"

—কুরআন ২৩ : ১৫

"বাস্তবিক এই-তো তোমাদের জাতি, একমাত্র জাতি এবং আমি তোমাদের একমাত্র প্রতিপালক, অতএব আমারই উপাসনা কর!" —কুরআন ২১ : ৯২

পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল মানবগোষ্ঠীর কাছেই যে ইসলামের বার্তারহ প্রেরিত হয়েছে সে সম্পর্কে ইসলামের ঘোষণা :

"পৃথিবীর এমন কোনও (ক্বওম) মানব-সম্প্রদায় নেই যার কাছে আল্লাহর প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত কোনও সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।" —কুরআন ৩৫ : ২৪

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে একজন প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত প্রেরিত পুরুষ থাকে। যখন তিনি আবির্ভূত হন, তখন সব সমস্যা ও বিরোধের মীমাংসা করা হয়।"

—কুরআন ১০ : ৪৭

"(হে রাসূল!) আপনি সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নন, প্রত্যেক (ক্বওম) মানব-সম্প্রদায়ের জন্য একজন পথ-প্রদর্শক থাকে।" —কুরআন ১৩ : ৭

"আর সন্দেহ নেই যে, আমি পৃথিবীর সকল মানব-সম্প্রদায়ের কাছেই আমার বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি (যাদের শিক্ষা এই ছিল যে) যেন একই উপাস্যের আরাধনা করে এবং তাগুত, অর্থাৎ অকৃতজ্ঞত পাপাচারী স্বেচ্ছাচারী ও সীমালংঘনকারীর কবল থেকে রক্ষা পায়।" —কুরআন ১৬ : ৩৬

মানুষেরাই যে ধর্মকে পৃথক পৃথক এবং গণ্ডিভুক্ত করে নিয়েছে সে সম্পর্কে ইসলামের ঘোষণা :

"হে নবীগণ! পবিত্র দ্রব্য আহার করুন এবং সৎকার্য সাধনে তৎপর থাকুন। আপনারা মূলত একই দলভুক্ত আর আমি আপনাদের একমাত্র প্রভু। সুতরাং আমাকে ভয় করে চলুন। কিন্তু পরবর্তীকালে মানুষেরা পরস্পরের মতানৈক্য

করে নিজেদের ধর্মকে পৃথক পৃথক করে নিয়েছে এবং তাতেই তারা পরিতুষ্ট (বোধ করছে)।"

—কুরআন ২৩ : ৪১-৫২

"যারা একই ধর্মকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন দল বা জাতি গঠন করেছে তাদের সঙ্গে (হে নবী!) আপনার কোনও সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহর হাতেই ছেড়ে দিন। তাদের কাজের যা পরিণাম, আল্লাহ্-ই তাদের তা জানাবেন।"

—কুরআন ৬ : ১৬

"অতঃপর মানুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করল। প্রত্যেক দলই নিজেদের যা আছে তাহা নিয়ে খুশি। অর্থাৎ সত্যানুসন্ধিৎসা এবং সত্য গ্রহণ করার মানসিকতা হারিয়ে তারা মিথ্যে নিয়ে খুশি রয়েছে।"

—কুরআন ২৩ : ৫৩

উল্লেখ্য, একই ধর্মকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও গণ্ডিভুক্ত করা এবং ভিন্ন ভিন্ন দল বা ভিন্ন ভিন্ন জাতি গঠন সম্পর্কীয় পবিত্র কুরআনের এই বাণী যে কত সত্য, ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের প্রতি লক্ষ্য করলে সেকথা অনায়াসে বুঝতে পারা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে :

হিন্দুধর্ম (হিন্দু শব্দটি ফার্সি ভাষার একটি শব্দ। এর অর্থ 'গোলাম'। আসলে বেদ-পুরাণাদিতে 'হিন্দুধর্ম' বলতে কোনও ধর্মের উল্লেখ নেই। কোনও কোনও ধর্মগ্রন্থের মতে এ ধর্মের নাম 'বর্ণাশ্রম ধর্ম'। অথচ বহুকাল যাবত 'বর্ণ' শব্দের পরিবর্তে 'জাতি' শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং আশ্রম-ব্যবস্থাও বহুকাল পূর্বেই পরিত্যক্ত হয়েছে। এমতাবস্থায় অর্থাৎ বর্ণ এবং আশ্রমই যেখানে নেই সেখানে ধর্মের নাম 'বর্ণাশ্রম' কি করে থাকতে পারে সেকথা বুঝতে পারা কঠিন) বলতে হিন্দু নামে আখ্যাত একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মকেই বোঝায়। অনুরূপ-ভাবে বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, খৃস্টধর্ম প্রভৃতি নাম রাখা হয়েছে ধর্ম প্রচারকের নামানুসারে। ফলে নাম শ্রবণের সাথে সাথেই তা যে এক একটি দলের নিজস্ব ধর্ম সেকথাই প্রকট হয়ে ওঠে।

অথচ ইসলামকে কোনও ব্যক্তি বা দলের নামের সাথে যুক্ত করা হয়নি। আবহমানকাল ধরে লক্ষ লক্ষ নবী কর্তৃক এর প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার কাজ চলে আসলেও তাঁদের কারো নামের সাথে এর সম্পর্ক জুড়ে দেয়া হয়নি।

বলাবাহুল্য, এর একটি মাত্র কারণই রয়েছে। আর তা হলো যেহেতু ইসলাম সত্য এবং সত্যমাত্রই সর্বজনীন ও সর্বকালীন, অতএব তা কোনও ব্যক্তি বা দলের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে কিংবা স্থান বা কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ হতে পারে না।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, নিজ নিজ ধর্মকে সত্য-সনাতন বলা হবে, আবার সূচিতা রক্ষার নামে তা নির্দিষ্ট সীমার সুনির্দিষ্ট কক্ষে অর্গলাবদ্ধ করে রাখা হবে

এমন উদ্ভট, অযৌক্তিক এবং স্ববিরোধী কাজ অন্তত ইসলামবিঘোষিত আল্লাহ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হতে পারে না।

পরিশেষে বলা আবশ্যক, মানবজাতির শৈশবকাল থেকে শুরু করে যুগে যুগে যখন যেখানে এবং যেভাবে যতটুকু প্রয়োজন, ইসলামরূপ সত্য সমাগত হয়ে মানবজাতিকে প্রয়োজনীয় পথ-নির্দেশ দিয়েছে। অন্যায় অসত্যের কলুষ-কালিমা থেকে মুক্ত এবং প্রাণবন্ত করে তুলেছে। অবশেষে জাতীয় জীবনের পূর্ণ পরিণত অবস্থায় সে সত্য বিশ্বের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী (স)-এর মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে বিশ্ববাসীর দুয়ারে সমাগত হয়েছে, আর উদাত্ত কণ্ঠে, ঘোষণা করা হয়েছে :

{হে নবী (স)! আপনি বিশ্ববাসীকে} বলুন, সত্য সমাগত মিথ্যা পরাভূত নিশ্চয়ই মিথ্যার পরাভব অবশ্যম্ভাবী। —কুরআন ৭ : ৮১

পবিত্র কুরআনের এই বাণীর যথার্থতা অর্থাৎ সত্য যে সমাগত সে সম্পর্কে বহু উদাহরণই রয়েছে। মোটামুটি একটা ধারণায় উপনীত হওয়া, বিশেষ করে সে সত্যকে যথাযথভাবে গ্রহণ না করার ফলে যেসব ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার কিছুটা আভাস দেয়ার জন্যে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা হলো :

(ক) চন্দ্র-সূর্যাদি যে মানুষের উপাস্য হতে পারে না এবং এই বিশ্বের সৃষ্টি এবং পরিচালনার পশ্চাতে যে প্রাকৃতিক নিয়ম বিদ্যমান রয়েছে, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সুদীর্ঘকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বিশেষ করে চন্দ্রে মানুষের অবতরণের পর সে সত্য আমরা জানতে পেরেছি।

অথচ হাজার হাজার বছর ধরে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে এ সত্য সমাগত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে যে সময় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূচনাই হয়নি এবং পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র শুধু মহা ধুমধামের সাথে চন্দ্র-সূর্যাদির পূজাই প্রচলিত ছিল না : কোনও দেশ সূর্য জনৈক মুনি ঠাকুরের ঔরসজাত পুত্র, কোন দেশের মানুষ তাদের দেশের রাজাকে সূর্যের বংশধর, কোনও দেশের মানুষ চন্দ্রের যক্ষা থাকা, আর কোনও দেশের মানুষ নক্ষত্রকে নিজেদের ভাগ্য-বিধাতা প্রভৃতি বলে বিশ্বাস পোষণ করতো।

তেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনে ইসলামের নবী হযরত ইব্রাহীম (আ) এ সবের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যেকথা বলেছিলেন, পবিত্র কুরআনের ভাষায় তা এই ছিল যে, ইন্নি ওয়াজ্জাহ ওয়াজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফাঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকিন। অর্থাৎ "নিশ্চিতরূপে আমি আমার

মুখমণ্ডল (মনোযোগ) একনিষ্ঠভাবে (সেই) আল্লাহর প্রতি নিবন্ধ করলাম যিনি প্রাকৃতিক নিয়মে আকাশ ও ভূতলের সৃষ্টি করেছেন। —কুরআন ১৩ : ৩২-৩৩

লক্ষণীয় যে, মূলে 'ফাতারা' শব্দটি রয়েছে। সাধারণত 'সৃষ্টি করেছেন' বোঝাতে 'খালাকা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে 'ফাতারা' শব্দটি ব্যবহারের কারণ হলো, তা দিয়ে নব-সৃষ্টি বা প্রথম সৃষ্টি বোঝায়; যা উপকরণ-উপাদান ছাড়াই করা হয়েছে। তাছাড়া, 'ফিতরাত' শব্দের অর্থ হলো প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক নিয়ম। সুতরাং এখানে 'ফাতারা' শব্দ দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টি হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

বলাবাহুল্য, প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সমাগত এই সত্য যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরা হলে বহু পূর্বেই চন্দ্র-সূর্যাদি পূজার অবসান ঘটতো এবং প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব উদ্ভাবনেও এত বিলম্ব হতো না। ফলে প্রভূত পরিমাণ অর্থ, সময় এবং শ্রমের অপচয় থেকে রক্ষা পাওয়া যেত।

(খ) সুদূরের সেই অতীতকাল থেকে রাজতন্ত্রের অভিশাপ জনগণকে নিপিষ্ট নিপীড়িত করে এসেছে। অথচ এই সেদিনও আমরা কেউবা স্বেচ্ছায় আর কেউবা বাধ্য হয়ে 'ভাগ্যবিধাতা' 'জনগণ মন-অধিনায়ক' প্রভৃতি বলে রাজতন্ত্রের স্তুতি-বন্দনা গেয়েছি, তার লেজুরবৃত্তি করেছি। সে যাহোক, রাজতন্ত্র যে একটি অভিশাপ অতিসম্প্রতি সেকথা বুঝতে পেরে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানো হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। এই আন্দোলনের পুরোধাগণ আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে রয়েছেন।

অথচ আমরা অনেকেই জানি না, নবী-রাসূলগণই হাজার হাজার বছর পূর্বে এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। কেননা, তাঁরা ছিলেন আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রচারক। পরে স্বাভাবিকভাবেই তথাকথিত রাজত্বের 'মালিক' এবং প্রজাসাধারণের 'দণ্ডমুণ্ডের কর্তারূপী' রাজা-বাদশাহদের দাবিকৃত সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে তাঁদের আন্দোলন করতে হয়েছে।

উল্লেখ্য, তদানীন্তন রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অপরাধেই হযরত ইবরাহীম (আ) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত এবং হযরত মূসা (আ) দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন।

অতএব একথা বেশ দৃঢ়তার সাথেই বলা যেতে পারে যে, হাজার হাজার বছর পূর্বে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে সমাগত এই সত্য এবং তাঁদের আদর্শ যথাসময়ে ও যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরা হলে বহু পূর্বেই রাজতন্ত্রের অবসান ঘটানো সম্ভব হতো। ফলে বিশ্ববাসীকেও এত দীর্ঘকাল ধরে এমন বিপুল পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি ও নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করতে হতো না।

(গ) অনুরূপভাবে ছোট বড় নির্বিশেষে প্রতিটি বস্তুই যে মানবকল্যাণে সৃষ্টি হয়েছে বহুদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং ব্যয়-বহুল পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে অতি সম্প্রতি সেকথা আমরা জানতে পেরেছি। আর একথাও জানতে পেরেছি যে, যত বেশিসংখ্যক বস্তুর ব্যবহার সম্ভব করে তোলা যাবে উন্নতি-অগ্রগতিও ততই সহজ, সম্ভব ও ত্বরান্বিত হবে— মানবকল্যাণেও ততই তৎপরতা গ্রহণ করা যাবে।

অথচ, এখন থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে যখন ওসব কথা মোটেই জানা ছিল না, এমনকি যেকোনও দিক দিয়ে আপনাপেক্ষা শক্তিশালী বিবেচিত হলেই উপাস্য জ্ঞানে তার উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত করা হতো, সেই অন্ধকার যুগে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে এই সত্য সমাগত হয়েছিল যে, "চন্দ্র-সূর্য পাহাড়-সাগর নির্বিশেষে আকাশ ও ভূতলের ছোট বড় যাবতীয় পদার্থ মানুষের আয়ত্তাধীন ও ব্যবহারোপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে।" —কুরআন ৬ : ৬০

উল্লেখ্য, মূলে 'সাখ্খারা' শব্দটি রয়েছে। আর 'তাসখীর' শব্দের অর্থ হলো কারো উদ্দেশ্যে কোনও কিছু ব্যবহারোপযোগী করে রাখা। অতএব নির্দ্বিধায় একথা স্বীকার করে নিতে হয় যে, এখন থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে সমাগত এই সত্যকে যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরা হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি সাধনে এত বিলম্ব হতো না; চন্দ্রলোকে বিচরণ, সূর্যরশ্মি কাজে লাগানো, অণুর আবিষ্কার প্রভৃতি কাজও বহু পূর্বেই সমাধা করা সম্ভব হতো।

(ঘ) আজ এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, শিখতে পারা এবং শেখাতে পারা বা শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান এ দু'টি কাজ যে মানুষ এবং যে জাতি যত বেশি করে এবং যত বেশি নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে ধরেছে সে মানুষ এবং সে জাতিই তত বেশি উন্নতি-অগ্রগতি সাধনে এবং সুখ ও সম্মান অর্জনে সক্ষম হয়েছে। অথচ অল্পদিন পূর্বেও এ সত্য আমাদের জানা ছিল না।

এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, হাজার হাজার বছর পূর্বে অবতীর্ণ যবুর, তওরাত, ইঞ্জিল এবং সর্বশেষে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে এই সত্য সমাগত হয়েছে। সকলের অবগতির জন্যে পবিত্র কুরআনের এ সম্পর্কীয় বর্ণনাকে তুলে ধরা যেতে পারে। এ বর্ণনা থেকে জানা যায়, মানবের আদি পিতা হযরত আদম (আ)-কে আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীতে পাঠানোর প্রস্তুতি-পর্বে 'আসমা' অর্থাৎ বস্তুবিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছিল এবং পরে তিনি তা ফেরেশতাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর সে জন্যে তিনি ফেরেশতাদের সম্মান লাভে সক্ষম হয়েছিলেন।

এ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে, জন্মগতভাবেই মানুষকে এ দু'টি গুণের অর্থাৎ 'শিখতে পারা' ও 'শেখাতে পারা'র যোগ্যতা দেয়া হয়েছে এবং এই

যোগ্যতাদ্বয়ের সার্থক রূপায়নের মাধ্যমে ফেরেশতাদের মতো মর্যাদাসম্পন্ন সত্তার সম্মানও সম্ভব হয়ে থাকে।

অতএব একথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে সমাগত এই সত্য যথাসময়ে এবং নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করা হলে অশিক্ষিত মানুষের সংখ্যা এমন শোচনীয়ভাবে বেড়ে যেতো না এবং শিক্ষাব্যবস্থাও এমন এলোমেলো ও অনুন্নত থাকতো না।

(ঙ) ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণবিহীন বিজ্ঞান যে সর্বনাশা হয়ে থাকে একথা অবর্ণনীয় ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে আজ আমরা জানতে সক্ষম হয়েছি। অথচ আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে এই সত্য সমাগত হয়েছিল যে, মানুষের আদি পিতা হযরত আদম (আ)-কে আসমা অর্থাৎ বস্তু-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার পরে তাঁকেও এমনি অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং এ থেকে বাঁচার জন্যে পরে তাঁকে 'কালেমা' বা ধর্মজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়। এ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে, বিজ্ঞানকে কল্যাণমুখী করার জন্যে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অপরিহার্য।

বলাবাহুল্য, পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে সমাগত এই সত্য যথাসময়ে গ্রহণ করা হলে বিজ্ঞান এমন বিকারগ্রস্থ হতে পারতো না, বিশ্ববাসীও বহু ক্ষয়-ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতো।

(চ) জ্ঞান যে মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ সেকথা মানুষের জানা ছিল না, জ্ঞান অর্জনে সকল মানুষের জন্মগত অধিকার থাকার কথাও জানা ছিল না। অজ্ঞতার অহমিকায় একটি বিশেষ শ্রেণী মেতে উঠেছিল, ধর্মের নামে তথাকথিত ছোটজাত এবং নারীসমাজের জন্যে জ্ঞান অর্জনকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করে কোটি কোটি মানুষকে সীমাহীন অজ্ঞতার পঙ্কে নিমজ্জিত করার সুবন্দোবস্তও করা হয়েছিল। জ্ঞানের নামে অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারের বিষ ছড়ানোর কাজও ওপরোক্ত শ্রেণীটি কর্তৃক অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

এই চরম দুর্দিনে মানবতাকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দানের মহাসত্য সমাগত হয়েছিল একমাত্র পবিত্র কুরআনের মাধ্যমেই এবং ঘোষণা করা হয়েছিল— 'নর-নারী নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলমানের জন্যে জ্ঞান অর্জন একান্তরূপেই অপরিহার্য।' (মুসলমান নর-নারী বলে সুনির্দিষ্ট করে দেয়ার কারণ এই ছিল যে, অমুসলমানগণ অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ নন, তাদের দ্বারা এই আদেশের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার আশা করা যেতে পারে না। তাছাড়া এ ধরনের মানুষদের দ্বারা জ্ঞান অর্জিত হলে তা নানা

দিক দিয়ে ক্ষতিজনক হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে)। 'শহীদের রক্ত অপেক্ষা আলেমের কালির মর্যাদা অধিক। 'সারা রাত্রি ইবাদত করা অপেক্ষা রাতে কিছুক্ষণ জ্ঞানালোচনা করা উত্তম' ইত্যাদি। —১-৩ আল-হাদিস

ভেবে আশ্চর্যান্বিত না হয়ে পারা যায় না যে, লেখাপড়ার গুরুত্ব এবং কলমের ব্যবহার যেদিন প্রায় সকল মানুষেরই অপরিজ্ঞাত ছিল, সেদিন পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম বাণীটি এই ছিল যে, "তোমার প্রতিপালক প্রভুর নামে পড় বা পাঠ কর। এবং অজানাকে জানার জন্যে শিক্ষা লাভ করতে হয় আর তা করতে হয় কলমের সাহায্যে।"

—কুরআন ৩০ : ১৮, এর প্রথম পাঁচটি আয়াত রাসূল (স)-এর প্রতি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়।

(ছ) "খালাকা লাকুম মা ফিল আরদে জামিআ"। অর্থাৎ 'পৃথিবীতে বিদ্যমান যাবতীয় পদার্থ তোমাদের (মানবমণ্ডলীর) জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।' পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে সমাগত এই সত্যকে যথাসময়ে গ্রহণ করা হলে তৈল, গ্যাস, কয়লা প্রভৃতি সম্পদের সন্ধান ও আহরণে এত বিলম্ব হতো না— মানুষকেও এত দীর্ঘকাল দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ ভোগ করতে হতো না।

উল্লেখ্য, মূলে 'ফি' শব্দটি রয়েছে। এর অর্থ 'মধ্যে'। বলাবাহুল্য 'মধ্যে' বলতে শুধু ওপরিভাগকেই বোঝায় না অভ্যন্তর ভাগকেও বোঝায়।

(জ) 'মানুষ সৃষ্টির সেরাজীব, মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়েছে' 'তোমরা আল্লাহর চরিত্র অনুসরণ কর' নিজদের আল্লাহর রং-এ রঞ্জিত কর' পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে সমাগত এসব সত্য যথাযথভাবে গ্রহণ করা হলে মানবচরিত্রে এমন দেউলিয়াত্ব সৃষ্টি হতো না। বেহায়াপনাও এমন ব্যাপক হয়ে ওঠার সুযোগ পেতো না।

(ঝ) 'মানবজাতিকে একই উপাদান অর্থাৎ মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, একই জনকজননী হতে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, সুতরাং সকল মানুষই পরস্পর ভাই ভাই, রক্ত, বংশ বা ধার্মিকতার মৌখিক দাবি নয় বরং আল্লাহর প্রতি অটল-অবিচল বিশ্বাস ও সৎকার্যশীলতাই সম্মান এবং মর্যাদা লাভের চাবিকাঠি', পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে সমাগত এই সব সত্য গ্রহণ করা হলে মানুষে মানুষে এমন অসমতা সৃষ্টি হতো না। একে অপরের স্বার্থ নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলাও জমে উঠত না। অন্ত্যজ, অচ্ছুৎ এবং ছোটজাত বলে কোটি কোটি মানুষকে পশু অপেক্ষাও হীনতর জীবনযাপনে বাধ্য করার মানসিকতাও গড়ে উঠতো না। ফলে মানবাধিকার আদায়ের জন্যে জাতিসংঘের মাধ্যমে বছরের পর বছর বাকযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ারও প্রয়োজন পড়বে না।

(ঞ) ধার্মিকতার প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো আল্লাহর প্রতি অটল ও অবিচল বিশ্বাস। আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্বশ্রোতা এবং সর্বত্র বিরাজমান। নিদ্রা-তন্দ্রা তাঁকে আকর্ষণ করে না। তিনি মানুষের ধমনী অপেক্ষা নিকটবর্তী, সকলের অন্তরে বিরাজিত, সকলের স্রষ্টা এবং প্রতিপালক; তাঁকে ফাঁকি দেয়ার কণামাত্র অবকাশও নেই এবং 'তিনি ছোট-বড় প্রতিটি কাজের হিসেবগ্রহণ করবেন।'

বলাবাহুল্য, পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে সমাগত এই সব সত্যকে গ্রহণ করা হলে বহু পূর্বেই হাতে গড়া পুতুল, প্রাকৃতিক পদার্থ, ইতর জীবজন্তু প্রভৃতি পূজার মতো জঘন্য এবং হীন কাজের অবসান ঘটতো, অপরিমেয় অর্থ মূল্যবান সময় ও শ্রমের অপচয় রোধ করা সম্ভব হতো। মানুষেরাও নিজদের আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতো।

পূর্বেই বলা হয়েছে, এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে 'কুরআনে বিজ্ঞান'[১] নাম দিয়ে একখানা বই লিখে রেখেছি। যদি ছাপানো সম্ভব হয় তবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সহৃদয় পাঠকদের উপহার দেয়া সম্ভব হবে। পুস্তকের কলেবর বেড়ে যায় বলে এ তথ্যগুলোও এখানে তুলে ধরার উপায় ছিল না। কি জানি 'কুরআনে বিজ্ঞান' ছাপানোর পূর্বেই আমার দিন শেষ হয়ে যায়, তাই উপায় না থাকা সত্ত্বেও এই তথ্যগুলো এখানে তুলে ধরা হলো। আশা করি এ থেকেই সত্য সমাগত হওয়া সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণায় পৌঁছানো সম্ভব হবে।

এই প্রসঙ্গের উপসংহারে বলা আবশ্যক যে, প্রচীনত্ব, শত্রুর আক্রমণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি নানা কারণে প্রায় প্রতিটি ধর্মগ্রন্থই কম-বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিবর্তন, পরিবর্ধনাদির ফলে এসবের মৌলিকতাও ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। বর্তমানে পবিত্র কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা বিশ্ববাসীর কাছে সম্পূর্ণ অক্ষত, অবিকৃত এবং অপরিবর্তিত অবস্থায় বিদ্যমান।

মিথ্যার প্রাবল্যে দিশেহারা বিশ্ববাসী আজ মুক্তির জন্যে অধীর হয়ে উঠেছে। সত্যের যথার্থ বাস্তবায়নই মিথ্যাকে পরাভূত করার একমাত্র পথ। আর সে সত্যের পয়গাম ও তা বাস্তবায়নের পথ-নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কুরআনে।

অতএব আসুন, আজ সকলে মিলে সকল বাধা, সকল গোঁড়ামি এবং সকল দুর্বলতা ঝেড়েমুছে ফেলে পবিত্র কুরআন আঁকড়ে ধরি— মিথ্যার পরার্ভব সুনিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করে তুলি।

---

১. বইটির পাণ্ডুলিপি লেখকের ইন্তেকালের পর পাওয়া যায়নি।

আমরা কোন পথে চলছি?

প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, প্রত্যেক ধর্মেরই কোনও না কোনও মূলনীতি রয়েছে, যাকে ধর্মের ভিত্তি বলা হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, কোনওভাবে, কোনও অবস্থায় এবং কোনও কারণে এই নীতিকে ক্ষুণ্ন-ক্ষতিগ্রস্ত করা হলে ধর্মের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। সুতরাং ধর্মের দৃষ্টিতে এটা অতি জঘন্য ধরনের পাপ।

অথচ নানাভাবে এই মূলনীতিকে ক্ষুণ্ন-ক্ষতিগ্রস্ত করার কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং হয়ে চলেছে, তবে কেউ জেনে শুনে এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবেই এটা করে চলেছেন আর কেউবা অজানা অবস্থায় বা সরল মনে এ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। সরল মনে গরল খেলে পাপ না হতে পারে, কিন্তু পরিণাম যেমন ঠেকানো যায় না, ঠিক তেমনই ধর্মের মূলনীতি সরল মনে ক্ষুণ্ন-ক্ষতিগ্রস্ত করায় এরা পাপী না হতে পারেন, কিন্তু এ কাজের ফলে ধর্মের ভিত্তি যতখানি দুর্বল হওয়া স্বাভাবিক ঠিক ততখানিই হয়ে চলেছে।

উল্লেখ্য, নানাভাবেই একাজ করা হচ্ছে। ধর্মবিশ্বাসের স্থান হলো মানুষের মন। আর যেহেতু সেই মনেই ভাবের উদয় হয়ে থাকে এবং ভাব প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক শক্তিশালী মাধ্যম হলো মানুষের ভাষা; অতএব সেই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক শক্তিশালী মাধ্যমটি দ্বারা ধর্মের যেসব ক্ষতি করা হচ্ছে নমুনাস্বরূপ তার কয়েকটি মাত্রকে পৃথক পৃথক শিরোনাম দিয়ে নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ভাষা হলো ভাবের বাহন। অতএব এখানে ভাবই মুখ্য। সহজে এবং সার্থকভাবে ভাব প্রকাশের জন্যে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম হলেও নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে তা অচল, অথচ মানুষের কর্মক্ষেত্র এবং ভাবের রাজ্য এ উভয়ই আজ বিরাটভাবে সম্প্রসারিত হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় শুধু মাতৃভাষার ওপর নির্ভর করে চলা সম্ভব নয়। তাছাড়া, সকলের মাতৃভাষা শব্দ-সম্ভারে সমৃদ্ধ বা স্বয়ংসম্পূর্ণও নয়। বাংলাভাষা সেগুলোর অন্যতম। পরবর্তী আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্যে একথাগুলো গভীরভাবে মনে রাখা প্রয়োজন।

পূজা ও ইবাদত

বিষয়টি বেশ জটিল বিধায় পটভূমিকাস্বরূপ বলতে হচ্ছে যে, পূজা একান্তরূপেই হিন্দুদের নিজস্ব ব্যাপার। পূজার তাৎপর্য বুঝতে হলে তাঁদের এ ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর সাথে মোটামুটিভাবে পরিচিত হওয়া দরকার। পূজা ব্যতীত সন্ধ্যা, আহ্নিক, তর্পণ, জপ, যজ্ঞ, হোম, স্তব-স্তুতি পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলোও তাঁরা প্রতিপালন করে থাকেন। মোটামুটিভাবে বলা যায় :

(ক) প্রত্যহ প্রত্যুষে, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী জপ ও সূর্য-বরুণাদির উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট বেদমন্ত্র পাঠ করাকে সন্ধ্যা বা আহ্নিক অথবা একত্রে সন্ধ্যা-আহ্নিক বলা হয়।

(খ) সাধারণত প্রাত-সন্ধ্যার পরে মৃতব্যক্তিদের তৃপ্তির জন্যে নির্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করে তিল-জলাদি উৎসর্গ করাকে তর্পণ বলা হয়ে থাকে।

(গ) সময়-সুযোগ মত নির্দিষ্টসংখ্যক বার নিজ নিজ ইষ্টদেবতার নাম উচ্চারণ করাকে 'জপ' বলা হয়।

(ঘ) প্রয়োজনবোধে বা ইচ্ছানুযায়ী সাধারণত স্নানের পর সূর্য, গঙ্গা, লক্ষ্মী, কালী প্রভৃতি এক বা একাধিক দেব-দেবীর প্রশংসাসূচক মন্ত্রপাঠ করাকে 'হোম' বলা হয়ে থাকে।

(ঙ) বৃহৎ আকারের হোমকে বলা হয় 'যজ্ঞ'।

(চ) পক্ষান্তরে ঘট বা মূর্তি অথবা উভয়কে সম্মুখে রেখে ফুল, চন্দনাদি সহযোগে নির্দিষ্ট মন্ত্রপাঠ করে মূর্তির উদ্দেশ্যে পাদ্য-অর্ঘ্য ভোগ-নৈবেদ্য প্রভৃতি নিবেদন করাকে পূজা বলা হয়ে থাকে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, সন্ধ্যা, আহ্নিক, তর্পণ প্রভৃতি সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। পূজার সাথে ওগুলোর কোনও সম্পর্ক নেই এবং ওগুলোতে মূর্তি, ফুল চন্দন বা ভোগ-নৈবেদ্যের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ওগুলোকে পূজা বলাও হয় না। মোটকথা ঘট বা মূর্তি ছাড়া এবং ভোগ-নৈবেদ্যাদি ব্যতিরেকে পূজা হতেই পারে না। বিশেষ করে পুরোহিত ছাড়া পূজা যে হতেই পারে না সেকথাও প্রায় সকলেরই জানা রয়েছে। কেননা, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কারো পূজা করার অধিকার নেই।

পক্ষান্তরে ইবাদত শব্দের মোটামুটি তাৎপর্য হলো 'উবুদিয়াত' বা দাসত্ব করা। আর তা করতে হয় ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মুসলমানকে। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে জীবনের প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি কাজ এমনকি প্রতিটি পদক্ষেপকে তাঁর দেয়া জীবনবিধানের আলোকে পরিচালিত করার নাম হলো 'ইবাদত'। এমতাবস্থায় পূজা এবং এবাদত সমার্থবোধক হতে পারে কিনা সেকথা ভেবে দেখার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে রাখছি।

উল্লেখ্য, বৈদিক যুগের বহু পরে হিন্দুদের বিভ্রান্ত করে নিজেদের অর্থাগম ও আদিপত্য বজায় রাখার জন্যে তদানীন্তন ব্রাহ্মণগণ যে এসব মূর্তি এবং এ ধরনের পূজার উদ্ভব ঘটিয়ে ছিলেন সেকথা ইতোপূর্বে যথাস্থানে বলা হয়েছে।

হাতে গড়া পুতুলকে উপাস্য জ্ঞানে পূজা করা যে অন্যায় এবং পূজকেরা যে বুদ্ধিহীন ও পাপীষ্ঠ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থেও সেকথা পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে; মানুষের সাধারণ বিবেক বুদ্ধিও সেকথাই বলে।

বিশেষ করে ইসলামের দৃষ্টিতে তা যে অতি জঘন্য ধরনের পাপ, ইসলামের সাথে সামান্য পরিচয় রয়েছে এমন ব্যক্তিরাও সেকথা জানেন।

অথচ ভেবে আশ্চর্যান্বিত এবং বেদনার্ত না হয়ে পারা যায় না যে, কতিপয় প্রখ্যাত আলেম পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ করতে গিয়ে নামায এবং ইবাদত শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে এই কুখ্যাত 'পূজা' শব্দের ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে সূরা ফাতিহার 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই সাহায্য চাই' বাক্যটির 'আমরা তোমারই পূজা করি এবং তোমারই সাহায্য চাই' বলে বঙ্গানুবাদ করার ফলে উক্ত সূরার বৈশিষ্ট্য এবং মর্যাদা ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাছাড়া এতদ্বারা হিন্দুদের মূর্তিপূজা এবং মুসলমানদের ইবাদতের মধ্যে যে কোনও পার্থক্য নেই জনমনে এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়ারও যথেষ্ট সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। অথচ যারা এটা করেছেন তাঁরা ইসলামের সামান্যতম ক্ষতি হোক অন্তর দিয়েই তা চান না। এমনকি প্রয়োজন হলে ইসলামের জন্যে জীবন দিতেও তাঁরা প্রস্তুত রয়েছেন বলে আমি মনে করি।

অনুরূপভাবে মরহুম ইসমাঈল হোসেন সিরাজী সাহেব 'ইমাম হোসেনের সংকল্প' নামক কবিতার একস্থানে লিখেছেন 'পূজ্যপাদ আলীজাদা ইমাম হোসেন।' বলাবাহুল্য, 'পূজ্যপাদ' শব্দ দ্বারা তিনি ইমাম হোসেন (রা)-এর মর্যাদা তুলে ধরতে চেয়েছেন। অথচ মুসলমানেরা কোনও ব্যক্তির 'পদপূজা' করতে পারে না এবং ইসলামের দৃষ্টিতে এটা নর-পূজা। আর নর-পূজাকে ইসলাম হারাম বা অতি জঘন্য ধরনের পাপ বলে ঘোষণা করেছে। সুতরাং কবিতাটি লেখার সময়ে তিনি যে এসব কথা চিন্তা করেননি অনায়াসেই তা বুঝতে পারা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, এমননি ধরনের বহু উদাহরণই তুলে ধরা যেতে পারে। বাহুল্য বোধে সেগুলো পরিত্যক্ত হলো।

স্বর্গ ও জান্নাত

মানবের আদি পিতা হযরত আদম (আ)-কে যে তাঁর সহধর্মিনীসহ জান্নাতে অবস্থান করতে বলা হয়েছিল মুসলমানমাত্রেরই সেকথা জানা রয়েছে।

পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ করতে গিয়ে কতিপয় প্রখ্যাত আলেম জান্নাতের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'স্বর্গোদ্যান' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

অথচ বেদ-পুরাণাদিতে স্বর্গের যে বিবরণ পরিলক্ষিত হয় তার সাথে জান্নাতের কোনও তুলনাই হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় :

(ক) মহাভারতের বর্ণনায় প্রকাশ : কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অবসান হলে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির জীবিতাবস্থায়, সশরীরে এবং পদব্রজে স্বর্গে গমন করেন, এমনকি একটি কুকুরও তিনি সাথে নিয়ে যান।

(খ) রামায়ণের বর্ণনায় দেখা যায় : রাবণ মৃত্যুকালে শ্রীরাম চন্দ্রকে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে একথাও ছিল যে, 'হে রাম! সৎকার্য কখনও ফেলে রাখবে না। সকল মানুষই যাতে সহজে এবং পদব্রজে স্বর্গে যেতে পারে, সেজন্য আমি স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে পথ-নির্মাণের ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু আজ-কাল করে করে ফেলে রাখার জন্যে সে সাধ আমার পূরণ হলো না।'

(গ) বিভিন্ন পুরাণ-ভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা থেকে জানা যায় :

স্বর্গে উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি নামে বহুসংখ্যক বেশ্যা রয়েছে। দেবতাদের মনোরঞ্জন ছাড়াও তাদের কাজ হলো : স্বর্গগমনেচ্ছায় অসুর অর্থাৎ সুর বা দেবতা নয় এমন কোনও ব্যক্তি সৎকাজ বা তপস্যায় রত হলে তাকে ভ্রষ্ট এবং চরিত্রহীন করে তার স্বর্গগমনের পথ রোধ করা।

তাছাড়া স্বর্গে বসবাসকারী দেব-দেবীদের যেসব লীলাকাহিনী ওপরোক্ত ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত রয়েছে, তা যদি সত্য হয় তবে সে জায়গাটাকে কোনওক্রমেই সৎসাধু মানুষের বসবাসযোগ্য বলে মনে করা যায় না।

উল্লেখ্য, স্বর্গ সম্পর্কে বেদ-পুরাণাদিতে এমনি ধরনের বহু ঘটনাই বর্ণিত রয়েছে, বাহুল্য বোধে সেগুলোকে তুলে ধরা হলো না। তবে একান্ত বাধ্য হয়েই একথা বলতে হচ্ছে যে, পবিত্র কুরআনের এই সব অনুবাদকদের উদ্দেশ্য যত সৎ এবং মহৎই হোক, আসলে তাঁদের এই কাজের ফলে জান্নাতের তাৎপর্য সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি তো হয়েছেই, তদুপরি জান্নাতের গুরুত্ব এবং মর্যাদাও ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে।

পরিশেষে সশরীরে এবং পায়ে হেঁটে যে-স্বর্গে যাওয়া যায় আর যে-স্বর্গের সাথে মর্ত্যের পথ নির্মাণ সম্ভব অন্তত সে-স্বর্গ এবং জান্নাত এক হতে পারে কি না সেকথা ভেবে দেখার অনুরোধ জানিয়ে প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

আল্লাহ ও ঈশ্বর

আমাদের পরম স্নেহ-ভাজন কিশোর-তরুণ এবং শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবীদের বেশ কিছুসংখ্যক কর্তৃক আল্লাহ শব্দের পরিবর্তে ঈশ্বর শব্দটি চালু করার প্রচেষ্টা গৃহীত

হয়েছে। বলাবাহুল্য, অগ্রপথিক হিসেবে তাঁরা নিজেরা বেশ কিছুদিন যাবৎ অতীব উৎসাহের সাথে এই শব্দটি ব্যবহারও শুরু করে দিয়েছেন।

যতদূর জানা যায়, এই প্রচেষ্টাগ্রহণের কারণ হলো, উপরোক্ত মহল মনে করেন যে, আল্লাহ নামটি শুধু সাম্প্রদায়িকই নয় আমদানিও করা হয়েছে সুদূরের সেই আরব দেশ থেকে। পক্ষান্তরে ঈশ্বর শব্দটি আমাদের মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা-ভাষারই একটি বিশেষ শব্দ; তাছাড়া নামটিও একান্তরূপেই অসাম্প্রদায়িক।

অথচ একটু খোঁজ-খবর নিলে তাঁরা অবশ্যই জানতে পারতেন যে, এই শব্দটি বাংলাভাষার শব্দ নয়, অসাম্প্রদায়িকও নয়। তাছাড়া বাংলাদেশ এমনকি ভারতবর্ষের মাটিতেও এর জন্ম হয়নি।

খোঁজ-খবর নিলে একথাও জানতে পারতেন যে, আর্য নামক সংস্কৃতভাষী একটি মানবসম্প্রদায় সুদূরের সেই মরু প্রদেশে বসবাসকালে এই সংস্কৃত শব্দটি জন্ম দিয়ে তা বেদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন।

কষ্ট করে একটু খোঁজ-খবর নিলে তাঁরা একথাও জানতে পারতেন যে, বাংলা-ভারতে বসবাসকারী একমাত্র হিন্দুসম্প্রদায় ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের কোনও মানবসম্প্রদায়ই বিশ্বপ্রভুর নাম হিসেবে 'ঈশ্বর' শব্দের ব্যবহার করেন না। এমনকি তাদের অনেকেরই এ নামটির সাথে সামান্যতম পরিচয়ও নেই।

কেননা, তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় বিশ্বপ্রভুর নাম হিসেবে এল, এলোহিম, এলোয়া, এলোহিয়া, আল্লাহ, গড, যেহোবা, যোব, ফারাতারা, আমিসাআসপাতন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামের উল্লেখ রয়েছে এবং বহুকাল যাবৎ তা চালুও রয়েছে। অতএব ঈশ্বর শব্দ জানা বা তা ব্যবহারের কোনও প্রশ্নই তাদের মনে উঠতে পারে না।

পক্ষান্তরে (ক) বেদ, বাইবেল এবং কুরআনের মত বিশ্ববিখ্যাত এবং সর্বাধিক জন-সমর্থিত তিন তিনখানা ধর্মগ্রন্থে বিশ্বপ্রভুর আসল নাম হিসেবে যথাক্রমে অল্ল (অল্লা, আল্লোহ, এলি এবং আল্লাহ) শব্দের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

(খ) তাছাড়া ঈশ্বরকে গ্রহণ করা অপেক্ষা আল্লাহকে গ্রহণ করা কল্যাণ কর। কেননা ঈশ্বর তৎসকাশে পরিমাণে ক্ষুদ্র বেদের এই সুস্পষ্ট ঘোষণা দ্বারা অল্ল বা অল্লোহ শব্দের প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

(গ) পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাসমূহে বিদ্যমান এল, এলোহিম, এলোয়া, এলোহিয়া প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সুদূরের সেই অতীতকাল থেকে সর্বশক্তিমান বিশ্বপ্রভুকেই বোঝানো হয়ে আসছে। ইতোপূর্বে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও আমরা করেছি।

এমতাবস্থায় ওপরোক্ত কিশোর-তরুণ এবং বুদ্ধিজীবীরা কি করে এই নামটির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খুঁজে পেলেন, একটি মাত্র সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত ঈশ্বর নামটি তাঁদের কাছে কি করে অসাম্প্রদায়িক বলে বিবেচিত হলো আর কি করেইবা সুদূর মেরুপ্রদেশ হতে আমদানিকৃত বিশুদ্ধ বাংলাভাষার একটি শব্দ বলে তাঁরা ভাবতে পারলেন সেকথা বুঝতে পারা কঠিন।

সে যাহোক, এই শব্দটি নিয়ে ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গভীর মনোযোগের সাথে তা পাঠ করা হলে; প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে বলে আশা করি।

সংশ্লিষ্ট কিশোর-তরুণ এবং বুদ্ধিজীবীদের আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করতে চাই যে, সমাজের কোটি কোটি মানুষ আপনাদের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। সুতরাং হুজুগের মাথায় কিছু করে গোটা সমাজের জন্যে নতুন করে আর কোনও সর্বনাশ ডেকে আনবেন না।

পরিশেষে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে যে, পুরাণ, ভাবগত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থসমূহে ঈশ্বর-ঈশ্বরীদের লীলা এবং কাজ-কারবারের যেসব কাহিনী বর্ণিত রয়েছে তা পাঠ করে প্রতিটি রুচিবান মানুষকেই যেখানে ঈশ্বর এই নামটি উচ্চারণ করতেও লজ্জা, দুঃখ এবং ক্ষোভে অভিভূত হতে হয় সেখানে আমাদের ওপরোক্ত কিশোর-তরুণ এবং বুদ্ধিজীবীরা কি করে ঈশ্বর শব্দের ব্যবহারকে প্রগতিবাদিতা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বলে সাব্যস্ত করবেন সেকথা বুঝতে পারাও আমাদের মত অজ্ঞ-অভাজনদের পক্ষে কোনওক্রমেই সম্ভব হয়ে উঠছে না। তবে তাঁরা যদি সকলপ্রকার ভাবপ্রবণতার ঊর্ধ্বে উঠে নিবিষ্ট মনে এসব বিষয় চিন্তা করতেন তবে তাঁরা যে এমন সরলভাবে গরল খাওয়ার কাজ করতেন না, সেকথা আমরা বেশ দৃঢ়তার সাথেই বলতে পারি।

জাতীয় সঙ্গীত

মানুষ মরে যায়, জাতি বেঁচে থাকে। অতএব জাতীয় পর্যায়ের কোনও কার্যক্রমগ্রহণ করতে হলে প্রথমেই তার বিভিন্ন দিক গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বলাবাহুল্য, জাতীয় সঙ্গীতের নির্বাচন তেমনি ধরনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

অথচ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচনের সময় দেশের অবস্থা এমনই সঙ্কটপূর্ণ এবং বিশৃংখল ছিল যে, সে অবস্থায় কোনও কিছু গভীরভাবে ভেবে দেখা সম্ভবই ছিল না।

একথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে জাতির অন্তরে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তার শিরায় শিরায়

এমনকি প্রতিটি রক্তকণায় দেশ এবং জাতিকে আদর্শরূপে গড়ে তোলার দুর্জয় প্রেরণা সৃষ্টির উপাদানও তাতে থাকা প্রয়োজন।

অথচ আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করার মত কিছুটা উপাদান থাকলেও এতে অন্য উপাদানের একান্তই অভাব বিদ্যমান।

অন্তত সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি জাতিকে গড়ে তোলার মত উপাদান যে এতে নেই, সঙ্গীতটি যিনি পাঠ করেছেন তিনি একথা স্বীকার না করে পারেন না।

এসব অভাব দৃষ্টে জাতীয় সঙ্গীতরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এটি রচিত হয়েছিল কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

উল্লেখ্য, এসব ত্রুটি এমন সাংঘাতিক ধরনের নয়, যে জন্যে একে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে না। আর এসব ত্রুটিকে তুলে ধরার জন্যে বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের অবতারণাও করা হয়নি। আসলে এর মাঝে এমনই প্রচণ্ড ধরনের একটি খুঁৎ বিদ্যমান রয়েছে যাকে অন্তত তৌহিদবাদী মুসলমানদের পক্ষে উপেক্ষা করা কোনওক্রমেই সম্ভব হতে পারে না।

আর সে খুঁৎটি হলো এর একস্থানে বলা হয়েছে, 'ওমা! তোর চরণেতে দিলাম মাথা পেতে।' বলাবাহুল্য 'চরণে মাথা পেতে দেয়ার' একটিমাত্র অর্থই হতে পারে, আর তা হলো— প্রণিপাত' বা 'সিজদা' করা ইসলামের দৃষ্টিতে যা অংশীবাদিতা অর্থাৎ অমার্জনীয় অপরাধ।

উল্লেখ্য, ইসলাম জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা পোষণকে 'ঈমানের অঙ্গ' বলে ঘোষণা করেছে। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানই অন্তত নিজ নিজ ঈমান রক্ষার্থে দেশকে না ভালোবেসে পারে না। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, শুধু জন্মভূমিকে ভালোবাসাই মুসলমানদের জন্যে যথেষ্ট নয়! আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা থাকার নিদর্শন স্বরূপ মুসলমানদের আল্লাহর সৃষ্ট গোটা বিশ্বকে ভালোবাসতে হয়। মুসলমানেরা জানে গোটা বিশ্ব আল্লাহর পরিবার। যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবারকে যত বেশি ভালোবাসে স্বয়ং আল্লাহও সেই ব্যক্তিকে তত বেশি ভালোবাসেন (হাদিস)। তাছাড়া 'দেশ মাতা'র চরণে মাথা পেতে দিয়ে (শোনা যায় সঙ্গীতটি গাওয়ার সুবিধার জন্যে অধুনা কেউ কেউ বলেন, 'তোর চরণে ঠেকাই মাথা' বলাবাহুল্য, 'চরণে মাথা ঠেকানো' এবং প্রণিপাত করা' একই কথা) ভালোবাসা দেখানোতে কোনও সার্থকতা আছে বলে ইসলাম বিশ্বাস করে না। বরং তাকে অতীব নিষ্ঠার সাথে গড়ে তোলা ও দেশবাসীর কল্যাণে নিয়োজিত করাকেই তার প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা থাকার পরিচায়ক বলে বিশ্বাস করতে ইসলাম শিক্ষা দেয়।

পরিশেষে আবার আমাকে বলতে হচ্ছে,, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচন এমন সময়ে এবং এমনই তাড়াহুড়ার সাথে করতে হয়েছিল যে, বিজ্ঞ নির্বাচকমণ্ডলীর পক্ষে এসব কথা ভেবে দেখার মত কোন সুযোগই তখন ছিল না। এখন পরিস্থিতির যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। ভেবেচিন্তে কাজ করার সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে।

বলাবাহুল্য, নির্বাচকমণ্ডলীর বিজ্ঞতা এবং ঈমানদারী সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। একটু চিন্তা করলেই এর মাঝে যেসব ত্রুটি এবং অভাব রয়েছে তা যে তাঁরা অনায়াসেই ধরতে পারবেন সে সম্পর্কে আমার কণামাত্র সন্দেহও নেই।

অতএব বিনীত অনুরোধ, অন্তত বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ জন অধিবাসী তৌহিদবাদী মুসলমানকে দেশ মাতৃকার চরণে প্রণিপাত করার এই জঘন্য পাপ থেকে রক্ষা করুন, তাদের মাথাগুলোকে নিষ্ঠার সাথে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করার মাধ্যমে দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা দেখানোর সুযোগ সৃষ্টি করুন এবং তারা যাতে একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে মাথা পেতে দিতে পারেন তেমন পরিবেশ গড়ে তুলুন।

বেদীর ইতিবৃত্ত

উল্লেখ্য, যজ্ঞ-কুণ্ডের নিকটে ভূপৃষ্ঠ থেকে কিছুটা উঁচু করে বাঁধানো আয়তকার স্থানকে 'বেদী বলা হয়ে থাকে। আচার্য, অধবুর্য, ঋত্বিক প্রভৃতিরা তার ওপর উপবেশন করে অগ্নিতে আহুতি প্রদান এবং সাথে সাথে 'বেদমন্ত্র' পাঠ করতেন বলে নাম 'বেদী' রাখা হয়েছিল।

বৈদিক যুগের পরবর্তী সময় থেকে এ যাবত পূজার মূর্তি এবং ঘট স্থাপনের জন্যে বেদীর ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। বলাবাহুল্য, এটা সংস্কৃতভাষার একটি বিশেষ শব্দ এবং বেদ-পুরাণাদির বহু স্থানেই এই 'বেদী' শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

অতএব বেদী যে মূর্তিপূজারই অঙ্গবিশেষ এবং একান্তরূপেই হিন্দুদের ধর্মীয় বিষয়, সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ কোনওরূপ বিচার-বিবেচনা না করেই আমাদের কিছুসংখ্যক কিশোর-তরুণ এবং বুদ্ধিজীবী বাংলা-ভাষা ও বাঙালি ঐতিহ্যের নামে অন্যান্য কতিপয় শব্দের ব্যবহার শুরু করেছেন।

সর্বাধিক দুঃখজনক হলো, এই বেদী শব্দের সাথে শহীদ শব্দের সংযোগ ঘটিয়ে তাঁরা আমাদের অতি শ্রদ্ধাভাজন শহীদদের মর্যাদা ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছেন। জানি, আমার এ কথা পাঠ করে তাঁরা ভীষণভাবে মনোক্ষুণ্ন হবেন। কেউ কেউ ক্রুদ্ধও হতে পারেন। অতএব তাঁদের অবগতির জন্যে বলতে হচ্ছে, যেহেতু শহীদমিনারের চত্বরে বসে যজ্ঞে আহুতি দেয়া বা বেদপাঠ করা হয় না,

পূজার ঘট বা মূর্তিও সেখানে স্থাপন করা হয় না। অতএব সে চত্বরের নাম বেদী অর্থাৎ শহীদবেদী রাখাটা শুধু বিভ্রান্তিকরই নয় একান্তরূপে সংগতিবিহীনও বটে।

মনে রাখা প্রয়োজন, 'অর্ঘ্য', 'অঞ্জলি', 'আলপনা' প্রভৃতি শব্দ মূর্তি এবং নরপূজার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছে এবং বহুকাল ধরে হিন্দুসমাজ কর্তৃক সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সুতরাং ওগুলো যে মূর্তি এবং নরপূজার সাথেই একান্তরূপে সংশ্লিষ্ট সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পক্ষান্তরে ইসলামের সাথে মূর্তি এবং নরপূজার সামান্যতম সম্পর্কও নেই, থাকতে পারে না। তা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মাতৃভাষা প্রভৃতি যেকোনও ছদ্মাবরণেই অনুষ্ঠিত হোক না কেন।

এমতাবস্থায় 'আলপনা 'অঙ্কন' 'শহীদবেদী'তে 'অঞ্জলি প্রদান', 'শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন' প্রভৃতি দ্বারা শুধু ইসলামের মধ্যে মূর্তি এবং নর-পূজার অনুপ্রবেশই ঘটানো হচ্ছে না— আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন শহীদদের প্রচ্ছন্নভাবে মূর্তিরূপে ব্যবহার করে তাঁদের মর্যাদা ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন করার কাজও চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আরবী 'শহীদ' শব্দের সাথে সংস্কৃত 'বেদী' শব্দের এই গোঁজামিল কিভাবে শহীদদের মর্যাদা ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণ ঘটিয়েছে অতঃপর ধর্মশাস্ত্রের একটি বর্ণনা তুলে ধরে তা দেখানো যাচ্ছে।

প্রজাপতি দক্ষের একশত পাঁচটি কন্যার মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠা সতীর বিবাহ হয়েছিল শূলপানি (শিব-মহাদেব)-এর সাথে। ব্রহ্মা, বিষ্ণুসহ প্রায় সকল দেবতাই এই বিয়ে উপলক্ষে হাটকেশ্বর তীর্থে সমবেত হয়েছিলেন এবং দক্ষের অনুরোধে ব্রহ্মা বিয়েতে পৌরহিত্যে করেছিলেন।

যজ্ঞানুষ্ঠানকালে বেদীতে উপবিষ্ট অবগুণ্ঠনবতী (ঘোমটা দেয়া) সতীর প্রতি ব্রহ্মার দৃষ্টি পতিত হলে চতুরানন (চারটি মুখবিশিষ্ট) ব্রহ্ম সকলের অজ্ঞাতে সর্বশরীর দর্শন করেন। কিন্তু অবগুণ্ঠনের জন্যে মুখমণ্ডল দর্শনে ব্যর্থ হন। কৌশলে কার্যোদ্ধারের জন্যে তিনি যজ্ঞ-কুণ্ডে কাঁচা কাষ্ঠ নিক্ষেপ করতে থাকেন। ফলে প্রচণ্ড ধোঁয়ায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং বেদীর ওপর উপবিষ্ট সকলে ধোঁয়া থেকে নিরাপদ থাকবার জন্যে চোখ বন্ধ করেন।

বলাবাহুল্য, ব্রহ্মা এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। সুতরাং সুযোগ বুঝে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে তিনি সতীর মুখমণ্ডল দর্শন করেন।

উল্লেখ্য, 'সর্বাঙ্গ' দর্শন করেই তিনি কামাতুর হয়ে পড়েছিলেন। এখন মুখমণ্ডল দর্শনে অবস্থা চরমে উপনীত হওয়ায় বীর্যস্খলিত হয়ে বেদীর ওপর

পতিত হয়। ব্রহ্মাও সাথে সাথে বালি দ্বারা বীর্যগুলো ঢেকে ফেলেন। কিন্তু বর মহাদেবের দিব্যদৃষ্টির কাছে তা গোপন থাকে না।

নিজের স্ত্রীর ওপর ব্রহ্মার এই কামাতুর দৃষ্টি স্বাভাবিকরূপেই মহাদেবকে ক্রোধান্বিত করে তোলে। তিনি অভিশাপ দিতে উদ্যত হন। অবশেষে ব্রহ্মার ক্ষমা প্রার্থনায় ক্রোধ প্রশমিত হয়। তবে নিজের স্ত্রীর ওপর কামাসক্ত অবস্থায় স্খলিত ব্রহ্মার এই বীর্য ব্যর্থ হতে না দিয়ে তৎসংশ্লিষ্ট বালিসমূহ তিনি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ (বৃদ্ধাঙ্গুলির সমান) 'মুনি'তে পরিণত করেন।

এইরূপ প্রতিটি বালিকণা থেকে এক এক করে মোট অষ্টাশিতি সহস্র মুনির উদ্ভব ঘটে এবং বালি থেকে উদ্ভূত বিধায় তাঁদের নাম রাখা হয় 'বালখিল্য মুনি'।

— স্কন্দ পুরাণ, নাগর খণ্ড, ৭৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

উল্লেখ্য, বেদীর ওপর সংঘটিত এমনি ধরনের বহু ঘটনার কথাই পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থসমূহে লিখিত রয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, বেদীর সাথে এসব ন্যাক্কারজনক ঘটনা জড়িত থাকার কথা জানার পরও কোনও বিবেকবান ব্যক্তি আমাদের ঐতিহ্যবাহী শহীদমিনারের চত্বরকে 'শহীদবেদী' বলে আখ্যায়িত করতে পারেন কি না এবং তদ্বারা পরম শ্রদ্ধাস্পদ শহীদদের মর্যাদা ধূলায় লুটিয়ে দেয়া হয় কিনা?

পৌরহিত্য সমাচার

বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ না থাকায় মোটামুটিভাবে বলা যাচ্ছে যে, পবিত্র ধর্মের নামে জনসাধারণকে অজ্ঞতা, পশ্চাৎমুখিতা, কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসের নাগপাশে বন্দী করে আধিপত্যবিস্তার ও শোষণ-নির্যাতন চালিয়ে যাওয়াই যে পৌরহিত্যবাদের মূল লক্ষ্য সেকথা আজ প্রায় সর্বজনবিদিত। ইউরোপের জ্ঞান-সাধকদের ওপর পাদ্রী-পুরোহিতদের অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে যাওয়ার ঘটনাও ইতিহাসের পাঠকমাত্রেরই জানা রয়েছে।

ভারতীয় পুরোহিতগণ কর্তৃক হীনমন্যতার অভিশাপ চাপিয়ে দিয়ে কোটি কোটি মানুষকে বংশানুক্রমিকভাবে দাস ও ছোটজাতে পরিণত করা, হাতেগড়া পুতুল, প্রাকৃতিক পদার্থ এবং ইতর জীব-জন্তুদের পূজার নামে সুকৌশলে নিজেদের পেটের পূজা চালিয়ে যাওয়ার ঘটনাও কারো অবিদিত নয়।

সজাগ-সতর্ক এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষমাত্রের কাছেই ধিক্কারের বস্তুতে পরিণত হওয়ায় পৌরহিত্যবাদের আজ যে নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়েছে সেকথা আজ আর প্রমাণসাপেক্ষ নয়।

পুরোহিত বলতে যে একমাত্র যাজক শ্রেণী বা ধর্ম ব্যবসায়ীদেরই সুনির্দিষ্টরূপে বোঝানো হয়ে থাকে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ সেকথাই জেনে এসেছে।

এমতাবস্থায় অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতিটি সভ্য দেশ যে-সময় এই জঘন্য পৌরহিত্যবাদ ধ্বংস করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে, সে-সময় বাংলাদেশী মুসলমানদের বেশ কিছুসংখ্যক হঠাৎ পৌরহিত্যের প্রতি এত আকৃষ্ট হলেন কেন, আর কেনইবা এ কাজটি তাঁরা সম্মান ও গর্বের বিষয় বলে বেছে নিলেন, অন্তত আমার মত ক্ষুদ্র-বুদ্ধির মানুষের কাছে বোধগম্য নয়।

উল্লেখ্য, কোনও জনসভা এবং কোনও কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর কোনও কোনও সংবাদপত্রের পরিবেশিত খবরে যখন জানতে পারি যে, কোনও প্রখ্যাত মুসলমান উক্ত অনুষ্ঠানে 'পৌরহিত্য' করেছেন, তখন বিস্মিত হয়ে নতুন করে ভাবতে ইচ্ছা হয়, পৌরহিত্যের এমন জম-জমাট ব্যবসাটা ছেড়ে এসে আমি ভুল করেছি কি না।

তাছাড়া একমাত্র মূর্তিপূজা এবং তাও যখন কোনও যজমানের পক্ষ থেকে করা হয় তখনই পৌরহিত্য শব্দটি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। কেননা, কোনও পুরোহিত যখন ব্যক্তিগত পূজার্চনা করেন তখন তিনি পুরোহিত বলে অভিহিত না হয়ে 'পূজক' বলে অভিহিত হয়ে থাকেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, একমাত্র মূর্তিপূজাকেই 'পূজা' বলা হয়ে থাকে। পুরোহিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের অনুষ্ঠেয় অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান যথা : সন্ধ্যা, আহ্নিক, গায়ত্রী পাঠ, জপ-তপ, তর্পণ, স্তব-কবচ পাঠ, শ্রদ্ধানুষ্ঠান প্রভৃতির কোনওটাই পূজা বলে অভিহিত হয় না।

যেহেতু কোনও সভা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিশ্চিতরূপেই মূর্তিপূজা নয়, অতএব নিশ্চিতরূপেই ওতে পৌরহিত্য করার প্রশ্ন উঠতে পারে না। আর যেহেতু পুরোহিত বলতে একমাত্র ব্রাহ্মণ বা যাজকশ্রেণীর মানুষদেরই সুনির্দিষ্টরূপে বুঝিয়ে থাকে, অতএব কোনও মুসলমানের পক্ষে পৌরহিত্য করা শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিতেই বিসদৃশ নয়, অপরের অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপও।

আমি অন্তরের সাথে বিশ্বাস পোষণ করি যে, সকল কথা ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা না করেই পৌরহিত্য শব্দটির ব্যবহার শুরু করা হয়েছে। আশা করি, এ সম্পর্কে ভেবে দেখা হবে।

লগ্ন-মহিমা

আমরা যে যুগকে বর্বর যুগ বলি, সেই যুগের মানুষেরা বিশ্বাস করতো যে, গ্রহ-নক্ষত্রাদির সন্তুষ্টির ওপর মানুষের ভাল-মন্দ এবং সুখ-দুঃখ একান্তরূপেই নির্ভরশীল, অজ্ঞতার জন্যেই যে তারা এটা করতো সেকথাও আমরা বলে থাকি।

প্রাকৃতিক নিয়মেই যে গ্রহ-নক্ষত্রাদির উদয়াস্ত হয়ে থাকে, আজ সেকথা আমরা জেনেছি। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এটাও জানা গেছে যে, গ্রহ নক্ষত্রাদি প্রাণহীন জড়পদার্থ বিশেষ। অতএব ওসবের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলতে কিছু নেই— থাকতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মে ওসব আবর্তিত হয় এবং এই অবস্থায় একটির বিদায় ও অন্যটির উদয় এই সন্ধিক্ষণকে বলা হয় লগ্ন।

বলাবাহুল্য, দিন-রাত্রির সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক নিয়মে। আর প্রকৃতির স্রষ্টা হলেন আল্লাহ। তাছাড়া লগ্ন, ক্ষণ, মাস, পল, অনুপল, মিনিট প্রভৃতি মানুষেরই সৃষ্ট। মানুষ তার সুবিধার জন্যে অনন্তকালকে ক্ষুদ্র-বৃহৎ ভাগে ভাগ করে নিয়েছে।

অতএব গ্রহ-নক্ষত্রের পরিক্রমণ ও লগ্নের উদ্ভব একান্তরূপেই প্রাকৃতিক ব্যাপার; মানুষের সুখ-দুঃখ, ইষ্টানিষ্ট প্রভৃতির সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। তবে অনেকে মনে করেন যে, রুগ্ন এবং দুর্বল ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যের ওপর কোনও কোনও লগ্নে কোনও কোনও গ্রহ-নক্ষত্রের কিছুটা প্রভাব পতিত হয়ে থাকে। এটা যে ঐ প্রাণহীন গ্রহ-নক্ষত্রদের ইচ্ছায় নয় বরং প্রাকৃতিক কারণেই ঘটে থাকে, বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অবশ্যই সেকথা জানা রয়েছে। আর একথাও জানা রয়েছে যে, গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা করে নয়, বরং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম মেনেই ওসব প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

উন্নত দেশসমূহ বহু পূর্বেই লগ্ন-মহিমার অসারতা বুঝতে পেরে মোহমুক্ত হয়েছে। অনুন্নত দেশসমূহ বিশেষ করে ভারতীয় হিন্দুদের অনেকে এখনও লগ্নের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

তবে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণই যে সাধারণ মানুষদের লগ্নের মোহে মগ্ন রেখে নিজেদের কাজ বাগিয়ে চলেছেন, আজ অনেকের মনেই এ বিশ্বাস বেশ দানা বেঁধে উঠেছে।

সহৃদয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে লগ্ন-মহিমা সম্পর্কে আমার কতিপয় বাস্তব অভিজ্ঞতাকে এখানে তুলে ধরছি।

(ক) আমার ঠাকুরমা (পিতামহী) শুভলগ্নে পিত্রালয়ে যাওয়ার সময় নৌকাডুবে আমার ছোটকাকার মৃত্যু হয়।

(খ) শুভলগ্নে বিয়ে দেয়ার পরও আমার এক পিশিমা এবং তিন খুড়িমা বাল্যবয়সে বিধবা হন, ইসলামগ্রহণের পূর্বে এক পরিসংখ্যানে দেখেছিলাম যে, সে সময় ছোটবড় মিলে হিন্দুসমাজে বিধবার সংখ্যা ছিল প্রায় চার কোটি। বলাবাহুল্য, এদের সবাইকে পাঁজি দেখে শুভলগ্নেই বিয়ে দেয়া হয়েছিল।

(গ) বরপক্ষ কর্তৃক কনের পিতাকে লগ্নের ফাঁকে ফেলে সর্বস্বান্ত করে বরপণ আদায়ের বহু মর্মান্তিক দৃশ্য আমার স্বচক্ষে দেখেছি।

(ঘ) পূজা-পার্বণ, স্নান, দান প্রভৃতি লগ্নের মধ্যে সম্পন্ন করার অজুহাতে যজমানদের কিভাবে শোষণ করা হয় সে দৃশ্যও আমি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখেছি।

(ঙ) শুভলগ্নে যাত্রা করার জন্যে যাত্রা বিলম্বিত হওয়ায় যুদ্ধে পরাজয়বরণের ইতিহাস পাঠ করেছি।

(চ) পিশিমা, খুড়িমা প্রভৃতির বৈধব্য-দশার জন্যে গুরুজনদের কখনও যমরাজা, আবার কখনও অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে শুনে অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছি : যমরাজার পক্ষপাতিত্ব অথবা অদৃষ্টের বিরূপতাই যদি বৈধব্যের কারণ হয়, তবে শুভলগ্নে বিয়ে দেয়ার কি তাৎপর্য থাকতে পারে?

বলাবাহুল্য, কোনও দিনই এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পাইনি। এমনি ধরনের বহু উদাহরণই রয়েছে। বাহুল্যবোধে পরিত্যক্ত হলো। উল্লেখ্য, লগ্নের এই মোহপাশ থেকে মানুষকে মুক্তিদানের জন্যে ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই এগিয়ে এসেছে এবং ঘোষণা করেছে : সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে কাজ শুরু কর, আল্লাহ নির্দেশিত পথে অগ্রসর হও, নির্ভুল পদক্ষেপগ্রহণ কর, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হও, নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাও। আর মানবীয় দুর্বলতা ও ভুলক্রটির জন্যে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর।[১]

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে, যেহেতু লগ্ন বুঝে কাজ করা একান্তরূপেই হিন্দুদের নিজস্ব ব্যাপার। এমতাবস্থায় বাংলাদেশী মুসলমান, যাদের ধার্মিকতার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি রয়েছে তাদের কাছে এসব বলার কি প্রয়োজন থাকতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর হলো : ধার্মিকতার প্রসিদ্ধিসম্পন্ন এই বাংলাদেশী মুসলমানদের দ্বারা যত্রতত্র লগ্ন শব্দের ব্যবহার এবং কাজেকর্মে লগ্ন মেনে চলার একটা বাতিক শুরু হয়েছে। কাজেই তাদের লগ্নের মহিমা অবহিত করার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। অন্যথায় অন্য অনেকের মত তাদের পক্ষেও লগ্নের মোহে মগ্ন হয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করা মোটেই বিচিত্র নয়।

লক্ষ্মীমাহাত্ম্য

লক্ষ্মী বলতে সাধারণত ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বোঝায়। এই দেবীকে সন্তুষ্ট রাখা হলে ধন-সম্পদে স্বচ্ছলতা আসে আর তিনি বিরূপা হলে দারিদ্র্য-বরণ করা ছাড়া কোনও গত্যন্তর থাকে না— এটাই হিন্দুদের বিশ্বাস।

লক্ষ্মীপূজার দিন আলপনা এঁকে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়ে থাকে এবং বহিরাঙ্গন থেকে ধনভাণ্ডার বা গোলাঘরের দিকে একটির পর একটি করে

---

১. কুরআন ও হাদীসের ছায়া-অবলম্বনে লিখিত। — লেখক

পদচিহ্ন আঁকা হয় এর উদ্দেশ্য হলো লক্ষ্মীদেবী যাতে ভুল করে অন্য ঘরে বা অন্যদিকে না গিয়ে পদচিহ্নের ওপর পা রেখে সোজা ধনভান্ডার বা গোলাঘরে গিয়ে উপনীত হন!

মজার ব্যাপার হলো, এ পদচিহ্নগুলো আঁকা হয় একমুখী করে। বিপরীত মুখী কোনও পদচিহ্ন এ জন্যেই আঁকা হয় না যে, তাহলে ধনভাণ্ডার বা গোলাঘরে প্রবেশ করার পর লক্ষ্মীদেবী আর ফিরে যেতে পারবেন না, চিরদিনের জন্যে ওখানেই অচলা হয়ে বিরাজ করতে থাকবেন— দিনে দিনে ধনভাণ্ডারও স্ফীত হয়ে উঠতে থাকবে। এখন কথা হলো, বিষ্ণুর স্ত্রী হিসেবে বিষ্ণুলোকস্থ স্বামীগৃহ অথবা শিব-দুর্গার কন্যা হিসেবে শিবলোক বা কৈলাশ পর্বতস্থ পিতৃগৃহ যেখান থেকেই তিনি আসুন, এতদূর পথ যিনি পদচিহ্ন ছাড়া আসতে পারলেন, তিনি পদচিহ্ন ছাড়া ধনভাণ্ডার বা গোলাঘর থেকে ফিরে যেতে পারবেন না, এটাইবা কি করে হতে পারে?

তাছাড়া লক্ষ্মীর বাহন হলো পেঁচা। বাহন ছাড়া দেব-দেবীরা কোথাও গমন করেন না। এমতাবস্থায় মানুষের পদচিহ্ন না এঁকে পেঁচার পদচিহ্ন আঁকাই তো হতো বুদ্ধিমানের কাজ। বাহনরূপী পেঁচাকে বাইরে রেখে পদচিহ্ন ধরে ধরে তিনি ধনভাণ্ডার বা গোলাঘরে গিয়ে আটকে পড়বেন, ও-দিকে পেঁচা বেচারা যুগযুগান্তর তাঁর প্রতীক্ষায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে এটাইবা কি করে হতে পারে?

অতএব এসব যে নিছক কল্প-কল্পনা এবং কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাস ব্যতীত অন্য কিছু নয়, সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এর পরও কথা থেকে যায় যে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীদেশ আমেরিকার মানুষেরা লক্ষ্মীপূজা না করেও সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হতে পারলো; লক্ষ্মীপূজার ধারে কাছে না গিয়েও আরবের মানুষেরা তরল সোনার অধিকারী হলো, আর হাজার হাজার বছর লক্ষ্মীপূজা করে এমনকি লক্ষ্মীদেবীকে ধনভাণ্ডারে আটকে রেখেও অনেক হিন্দুর দারিদ্র্য ঘুচলো না! এমতাবস্থায় লক্ষ্মীমাহাত্ম্য যে কতটা সত্য অথবা মোটেই সত্য কি না সেটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন হয় না।

উল্লেখ্য, ইসলাম যুগে যুগে বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে কঠোর ভাষায় এই অন্ধবিশ্বাসের প্রতিবাদ করেছে। এ সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ হলো, ধনরত্নাদি যাবতীয় সম্পদের স্রষ্টা এবং একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ। অন্য কোন সত্তার এতে কোনও অংশ বা অধিকার থাকার কল্পনা শুধু ভ্রমাত্মকই নয় জঘন্যভাবে পাপজনকও।

ধন লাভের উপায় হিসেবে বলে দেয়া হয়েছে "পৃথিবীতে চেষ্টা সাধনা এবং ধৈর্য ও অধ্যবসায় ব্যতীত তোমাদের জন্যে কিছুই রাখা হয়নি।"

— কুরআন ২ : ২৮৬

"আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে নিরলসভাবে ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাও। মনে রাখবে ফযরের পরের ফরযই হলো হালাল জীবিকার সন্ধান।"

— বায়হাকি, মেশকাত

"নামায শেষ হলে ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তালাশ করে নাও।"

—কুরআন ৬২ : ১৩

"পৃথিবীতে মানুষের যে অংশ রয়েছে তাকে (কোনও অবস্থায়ই) পরিত্যাগ করো না।"

—কুরআন ২৭ : ৭৭

"কর্মের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি সেই মোমেন, যে ইহকাল-পরকাল উভয়ের জন্যেই পরিশ্রম করে।"

— ইবনে মাজা

"আল্লাহ কোনও জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যে পর্যন্ত তারা নিজেরা নিজেদের পরিবর্তন না করে।"

— কুরআন ১৩ : ১১ অংশ

ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, এ কথাগুলো কত সত্য এবং বাস্তবসম্মত। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, লক্ষ্মী যে ধন-দাত্রী, সাধারণ মুসলমানদের অনেকের মধ্যে এ বিশ্বাস সংক্রামিত হয়েছে আর বিশেষ মুসলমানদেরও অনেকে লক্ষ্মীর প্রতি অনুরাগবশত নিজেদের ছেলে-মেয়েদের লক্ষ্মী বলে ডাকেন, লক্ষ্মী বলে আদর করেন এবং লক্ষ্মীর মত হতে বলেন।

উল্লেখ্য, লক্ষ্মী নিছক কল্পনাপ্রসূত। তাছাড়া তিনি শিব-দুর্গার কন্যা এবং বিষ্ণুর স্ত্রী বলে পরিচিতা, আর শব্দটিও স্ত্রীলিঙ্গ বাচক। এমতাবস্থায় সুধী-সজ্জন মুসলমানেরা তাঁদের বেটা ছেলেদের কি করে লক্ষ্মী বলে ডাকেন তা বোধগম্য নয়। আর এটাও বোধগম্য নয় যে, দেবী-প্রীতি যত প্রচণ্ডই হোক, তার জন্যে লিঙ্গ-জ্ঞান হারাতে হবে কেন?

ফোঁটার ইতিহাস

প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রজাপাত্য, গান্ধর্ব, রাক্ষস, অসুর এবং পৈশাচ— এই আট প্রকারের বিয়ে প্রচলিত ছিল-এর মধ্যে বলপূর্বক বা অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে যে বিয়ে করা হতো তাকে বলা হতো রাক্ষস-বিয়ে।

নির্দিষ্ট কোনও চিহ্ন না থাকায় অনেক সময়ে এভাবে বিবাহিতা নারীদের বলপূর্বক নিয়ে যাওয়া হতো। ফলে শুধু ঐসব নারীদের জীবনই ব্যর্থ বিড়ম্বিত হতো না, তাদের স্বামীদের সংসারেও দারুণ অশান্তি সৃষ্টি হতো।

সে কারণেই বিবাহিতা নারীদের চিহ্নিত করার জন্য তাদের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দেয়ার প্রথা প্রচলিত হয়। যেহেতু বর্তমানে এধরনের বিয়ে প্রচলিত নেই, অতএব ফোঁটা দেয়ার প্রয়োজনীয়তাও শেষ হয়ে গিয়েছে।

উল্লেখ্য, আজকাল যেসব রাক্ষস বলপূর্বক নারীদের ধরে নিয়ে যায় তারা ফোঁটার খাতির করে না। বিবাহিতা জেনেও রেহাই দেয় না। অতএব ফোঁটা দিয়ে তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়।

এখন ফোঁটা দেয়ার অর্থই যে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের বর্বরতাকে পরিস্ফুট করে তোলা, সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না। আর এ কাজ যে আমাদের পক্ষে মোটেই গৌরবজনক নয় সুতরাং বাঞ্ছনীয়ও নয় সেকথাও সহজেই বোধগম্য।

তবে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, পূর্ব-পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা বা মমত্ববোধের জন্যে বিবাহিতা হিন্দু নারীরা আজও এ প্রথা ধরে রেখেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো : মুসলমানসমাজে এ ধরনের কিছু না ঘটা সত্ত্বেও বিবাহিতা-অবিবাহিতা নির্বিশেষে মুসলমান-মেয়েদের কেউ কেউ ফোঁটা দেয়ার কাজ শুরু করলেন কোন হিসেবে?

হ-য-ব-র-ল

এমন অনেক কিছুই রয়েছে যা আমার বোধগম্য নয়। হয়তো চিন্তার দৈন্য এবং বুদ্ধির অভাবই তার কারণ। এই ধরুন, সরকার বেশ কিছুকাল পূর্বেই বাংলাভাষা সর্বস্তরে চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু বাংলাভাষার জন্যে যাঁরা জীবন দিলেন তাঁদের জীবন দেয়ার দিনটিকে আজও 'একুশে ফেব্রুয়ারি' বলা হয়। জীবনদাতাদের বলা হয় 'শহীদ'। আর তাঁদের স্মৃতিস্তম্ভকে 'শহীদ মিনার' এবং সেই মিনারের চত্বরকে 'শহীদবেদী' বলে আমরা অভিহিত করি। নির্দিষ্ট দিনে সেখানে সমবেত হয়ে 'শহীদবেদীতে' শ্রদ্ধার্ঘ্য, নিবেদন ও 'পুষ্পাঞ্জলি' প্রদান করি।

বলাবাহুল্য, 'ফেব্রুয়ারি, শব্দটি ইংরেজি ভাষার একটি শব্দ। 'শহীদ' ও 'মিনার' শব্দদ্বয়ের ভাষা হলো আরবি। আর মূর্তিপূজার অপরিহার্য অঙ্গ বিশেষ এই বেদী, শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং পুষ্পাঞ্জলি শব্দত্রয় গ্রহণ করা হয়েছে সংস্কৃতভাষা থেকে।

বিষয়টি ভাবতে গেলে আমাকে কেমন যেন একটা হ-য-ব-র-ল অবস্থায় পড়তে হয়। কেন যেন মনে হয় যে, আমরা ইসলামী টুপি মাথায় দিয়ে, ক্রুশ মার্কাটাই ও রুদ্রাক্ষের মালা গলায় বেঁধে এবং দেহে নামাবলীর ছাপ দেয়া চাদর জড়িয়ে পথ চলছি। আর অন্যান্য দেশের মানুষেরা অবাক বিস্ময়ে আমাদের এই কিম্ভূতকিমাকার অবস্থার দিকে চেয়ে রয়েছে এবং প্রশ্ন করছে, আপনারা কোনটা? এটা, ওটা, সেটা অথবা সবটাই?

কেন যেন মনে হয় যে, 'শহীদ' এবং 'শহীদ মিনার' শব্দদ্বয় ধরে রেখে যখন আমাদের বাঙালিত্ব যায়নি, এমতাবস্থায় ওসবের সাথে সামঞ্জস্যশীল দোয়া-দরুদ পাঠ, কুরআনখানি, মোনাজাত প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারেও হয়তো আমাদের বাঙালিত্ব হারাতে হতো না।

০ মাঝে মধ্যে 'বিবাহমজলিসে' গিয়েও আমাকে সেই একই হ-য-ব-র-ল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় 'পায়জামা', 'পাগড়ী', 'কোর্তা' ও 'শিরওয়ানি' পরিহিত 'দুলহামিয়া' দেখে বেশ ভালই লাগে। 'কাজীসাহেব' যখন দেন-মোহরের কথা বুঝিয়ে বলে 'এজেন' ও 'ইজার কবুল' করার জন্যে 'দুলহান' ও 'দুলহার' কাছে 'উকিল' পাঠান তখনও মন্দ লাগে না।

এভাবে 'আকদ' সম্পাদিত হয়ে যখন 'খুৎবা' পাঠ ও 'দুআ' করা হয় তখনও আমার সেই হ-য-ব-র-ল অবস্থাটার সৃষ্টি হয় না। তারপর যখন ওলিমা বা 'খানার মজলিসে' বসে 'কোর্মা', 'পোলাও', 'কোপ্তা', 'কালিয়া', 'কাবাব', 'জর্দা' বা 'ফিরনি' খাই তখনও বেশ ভালই লাগে।

কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে ফিরে চেয়ে যখন সুসজ্জিত তোরণের বুকের ওপর বড় বড় অক্ষরে লিখিত 'স্বাগতম' শব্দটি চোখে পড়ে তখনই কেন যেন মনে হয় যে ভেতরে ম্লেচ্ছভাষার শব্দগুলোকে শুদ্ধ করে নেয়ার জন্যেই বাইরের এই 'স্বাগতম' রূপী গোবর-চোনার আয়োজন করে রাখা হয়েছে।

০ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেউ আচার্য বা উপাচার্য হতে পারে, শাস্ত্রের কোথাও তেমন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না; ব্যবহারিক দিক দিয়েও হাজার হাজার বছরের মধ্যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাউকে আচার্য-উপাচার্য বলে অভিহিত হতে দেখা যায়নি। অথচ বাংলাদেশী মুসলমানদের শিরমণি গোছের মানুষদের যখন আচার্য-উপাচার্য বলে অভিহিত করা হয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যখন 'মঙ্গল-ঘট', 'বরণ', 'অজন্তা' স্টাইলে 'বাসন্তিশাড়ি' পরিধান ও 'আলপনা' আঁকার প্রতিযোগিতা প্রভৃতি কাজগুলো চোখে পড়ে তখন মনটাকে বলি, যেহেতু ওঁরা পশ্চাৎপন্থীদের হীন-চক্ষে দেখে, তাদের সমালোচনা করে এবং তাদের অসভ্য ও যুগের অনুপযোগী বলে মন্তব্য করে, অতএব এদের ওসব কাজ নিশ্চয়ই হীন, পশ্চাৎমুখী বা যুগের অনুপযোগী নয়; তোরই দেখার ভুল অথবা আমারই বার্ধক্যের বিভ্রান্তি!

০ দেবতা, গুরু, জামাতা, সম্মানীয় ব্যক্তি প্রভৃতির বোধশক্তি রয়েছে, মান-অভিমান, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির প্রশ্নও রয়েছে। অতএব তাদের বরণ করার একটা তাৎপর্য আমি খুঁজে পাই। কিন্তু যখনই দেখতে পাই যে, সংস্কৃতির নামে প্রাণ ও বোধশক্তিহীন বর্ষা, বর্ষ, বসন্ত প্রভৃতি বরণ করা হচ্ছে, তখনই কেন যেন আমার

মনে হতে থাকে, এতদ্বারা প্রকারান্তরে প্রকৃতির পূজা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বলাবাহুল্য, তখন সেই হ-য-ব-র-ল অবস্থাটার সম্মুখীন আমাকে হতে হয়।

আমি ভেবে আশ্চর্যান্বিত না হয়ে পারি না যে, পবিত্র কুরআনে প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক পদার্থ-নিচয়কে আয়ত্ত্বাধীন ও কল্যাণ-প্রসূত করে তোলার সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সেই কুরআনের ধারক এবং বাহকগণ যে সময় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পদার্থের পূজা শুরু করেছেন অন্যরা ঠিক সে সময়েই প্রকৃতিকে আয়ত্ত্বাধীন করে পৃথিবীতে বসে প্রায় ত্রিশ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত মঙ্গল-গ্রহের নাড়ি নক্ষত্রের খবর নিচ্ছে।

তখন মনটাকে বলি, ওরে মন! তুই প্রকৃতি পূজার কি বুঝিস? ওঁরা হলেন বহু যুগের বংশানুক্রমিক মুসলমান, আর তুই হলি নতুন মুসলমান! অতএব চুপচাপ দেখে যা। টু-শব্দটিও করবি না। কেননা, তাতে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে।

○ বিজ্ঞব্যক্তিদের মতে সংস্কৃতি হলো, সভ্যতার নির্যাস। আর একথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে।

'ইতিহাস কথা কয়' নামক পুস্তকখানাতে আমি সংস্কৃতি শব্দের মোটামুটি তাৎপর্য তুলে ধরতে গিয়ে বলেছি যে, সংস্কার শব্দের দ্বারা বোঝায় কোনও কিছুর দোষ-ত্রুটি বা অকেজো-অনুপযুক্ত অংশ বাদ দিয়ে উপযোগী ও পরিশুদ্ধ করে তোলা। আর যখন তা করা হয় তখন তাকে বলা হয় সংস্কারকৃত বা সংস্কৃত। এমনিভাবে মনের সংস্কার সাধন করা হলে সেই মন হয় সংস্কৃত আর সংস্কৃত মনের অভিব্যক্তিকে বলা হয় সংস্কৃতি।

মানুষ যে একটি প্রগতিশীল জীব সে সম্পর্কে আজ আর দ্বিমতের কোনও অবকাশই নেই। গুহা-জীবন থেকে যাত্রা শুরু করে আজ মহাশূন্যে পদ-চারণা সেই প্রগতিশীলতারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করছে। মানুষ একদিন উলঙ্গ থেকেছে এবং কাঁচা মাংস খেয়েছে। আজ তা নিয়ে গর্ব করার কিছু তো নেই-ই বরং পূর্ব-পুরুষদের মমতায় কেউ যদি এখন সাধ করে উলঙ্গ হয়ে বিচরণ করতে এবং কাঁচা মাংস খেকে শুরু করেন তবে মানুষ তাকে পাগল ছাড়া আর কিছুই যে বলবে না সেকথা বুঝতে অনেক বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

এমতাবস্থায় যখনই সংস্কৃতির নামে পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন শ্যামানৃত্য, তিন হাজার বছরের প্রাচীন ফোঁটা আর আধুনিকতার নামে সেই বর্বরীয় নগ্নতার পুনরাবৃত্তি চোখে পড়ে, তখন তার মাঝে সভ্যতার নির্যাস বা সংস্কৃত মনের অভিব্যক্তি আমি খুঁজে পাই না। ফলে হ-য-ব-র-ল অবস্থায় পড়ে হাবুডুবু খাই

আর ভাবি, ইসলাম পবিত্র কুরআনের ধারক এবং বাহকদের বিশ্ববাসীর জন্যে আদর্শ স্থানীয় বা অনুকরণীয় হতে বলেছে এবং সেজন্যে আল্লাহর চরিত্রের অনুকরণ ও আল্লাহর রংয়ে নিজদের রঞ্জিত করতে বলেছে আর নমুনাস্বরূপ বিশ্বনবী (স)-কে তাদের সম্মুখে উপস্থাপিতও করেছে, এসব কি তারই ফল?

০ যখন দেখতে পাই যে, অন্যান্য সভ্য ও সংস্কৃতিবান বলে পরিচিত মানুষেরা মন-মানস ও কর্মতৎপরতার দিক দিয়ে হাজার বছরের পথ এগিয়ে গিয়েছে। অথচ আমরা সভ্যতা-সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে পাঁচ হাজার বছর পশ্চাতে ফেলে আসা কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস নতুন কর আঁকড়ে ধরছি এবং তা নিয়ে গর্বও বোধ করছি, তখন একটা হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হয়, যার কোনও কুল-কিনারাই আমি করতে পারি না।

০ কেশববাবুর ছেলে সুবোধ, শ্যামল এবং মেয়ে কবরীকে যখন পূজার বেদীতে গিয়ে 'শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন' ও 'পুষ্পাঞ্জলি প্রদান' করতে দেখি এবং যখন দেখি যে কাঞ্চন মিয়ার ছেলে মাখন, পলাশ এবং মেয়ে শেফালিও শহীদ-বেদীতে গিয়ে সেই একই কাজ অর্থাৎ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের কাজই করে চলেছে, তখন কেন যেন এই উভয় দলের ছেলেমেয়েদের নাম, কাজ এবং মানসিকতার মধ্যে কোনও পার্থক্য আমি খুঁজে পাই না।

আল্লাহ্‌প্রদর্শিত পথে আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হয়ে বিশ্ববাসীর কাছে সেই আদর্শকে তুলে ধরা এবং বিশ্বব্যাপী তাওহীদের প্রচার ও উল্লেখযোগ্য অংশকে এমনিভাবে চরিত্রহীন ও তাওহীদের মূলে কুঠারাঘাতকারী হতে দেখে আমাকে শুধু বিস্ময়ে হতবাকই হতে হয় না, সেই হ-য-ব-র-ল অবস্থায় পড়ে হাবুডুবুও খেতে হয়।

০ হিন্দুসম্প্রদায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, কোনও শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্তী ষষ্ঠ দিবসের গোধূলিলগ্নে স্বয়ং বিধাতাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে এবং তিনি উক্ত শিশুর কপালে তার ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেন। আর এ বিধিলিপি বা কপালের লিখনানুযায়ী তার জীবন পরিচালিত হয়, অন্য কথায় মানুষের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, বিপদাপদ, সাফল্য-অসাফল্য প্রভৃতি সবকিছুই এই কপালের লিখনানুযায়ী অবশ্যম্ভাবীরূপে ঘটতে থাকে বলে হিন্দুসম্প্রদায় সেই প্রাচীনকাল থেকেই এ বিশ্বাস পোষণ করে আসছে।

বিষয়টি নিয়ে যখন চিন্তা-ভাবনা করেছি তখন স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জেগেছে, কপালের লিখনানুযায়ী যদি সবকিছু হয় তবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে ষষ্ঠ দিবস অর্থাৎ বিধাতাপুরুষ কর্তৃক কপালে কিছু লিখিত হওয়ার পূর্বে যেসব নবজাতক রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অথবা যেসব শিশু মৃত কিংবা

বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ করে তাদের এই ভাগ্য কোন ভাগ্যবিধাতা লিপিবদ্ধ করেন? আর করেনইবা কোন সময়?

তাছাড়া কপালের লিখনানুযায়ীই যদি যন্ত্র-চালিত পুতুলের মত মানুষকে সবকিছু করে যেতে হয় তবে পাপানুষ্ঠানের জন্যেইবা সে দায়ী হবে কেন? আর পুণ্যের অধিকারীইবা সে হতে পারে কোন সময়ে?

তবে যেহেতু এটা একান্তরূপেই হিন্দুদের নিজস্ব ব্যাপার, অতএব এ নিয়ে মাথা ঘামানোর খুব একটা প্রয়োজন বোধ করিনি। কিন্তু 'হায় আমার পোড়া কপাল' বলে কোনও মুসলমানকে যখন নিজের কপালে করাঘাত করতে দেখি অথচ তার কপালে পোড়াচিহ্ন অথবা সেখানে কিছু লিখিত থাকার প্রমাণ খুঁজে পাই না, যখন অন্যায় করে শাস্তিভোগের বেলায় কোনও মুসলমানকে শাস্তিটার জন্যে কপালকে দোষী করতে দেখি অথচ এ দোষী করার কোনও যুক্তি খুঁজে পাই না অথবা যখন দেখি যে অন্যায়ভাবে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে সেকথা জেনেও কোনও মুসলমান সেটাকে আঙ্গুলের সৌভাগ্য বা তার কপালের লিখনেরই ফল বলে মন্তব্য করছে তখন কেন যেন মাথাটা আপনাআপনি ঘামতে থাকে এবং আমাকে নতুন করে সেই হ-য-ব-র-ল অবস্থায়ই পড়তে হয়।

০ মাতৃভাষার প্রতি যত শ্রদ্ধাই থাক এবং বাংলাভাষাকে সর্বস্তরে চালু করার যত উদ্যোগই গ্রহণ করা হোক, কেন যেন আমার মনে হয় যে, যেহেতু বাংলা-ভাষায় আল্লাহ, কালেমা, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, এতেকাফ, রুকু, সিজদা, ঈমান, ইসলাম, দোয়াত, কলম, হাকিম, হুকুম, আদালত, ফৌজদারি প্রভৃতি শব্দের হুবহু কোনও প্রতিশব্দ নেই; অতএব অন্তত দেশের শতকরা ৮৫ জন অধিবাসীর স্বার্থে এ শব্দগুলো বর্জন করা সম্ভব নয়।

তাছাড়া একথাও কেন যেন আমার মনে হয় যে, বাংলাভাষাকে খাড়া রাখার জন্যে ম্লেচ্ছভাষার প্রায় যে চার হাজার শব্দ আমদানি করতে হয়েছিল, জোড়াতালি দিয়ে বা সংস্কৃতভাষার শব্দ ধার করে এনে এতগুলো শব্দের পরিবর্তন কোনওক্রমেই সম্ভব হতে পারে না।

তবুও কেউ যদি জোর করে তা করেন, তবে শুধু দেশের শতকরা ৮৫ জন অধিবাসীর জীবনযাত্রাকেই ব্যাহত করা হবে না, বাংলাভাষাকেও খাড়া রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। তদুপরি সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য দ্বারা বাংলাভাষার মৌলিকতাও ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন করা হবে।

জানি, আমার মনে হওয়া আর না হওয়ার মূল্যই নেই। তথাপি কেন যেন মনে হয় যে, যেহেতু আল্লাহ, ঈমান, ইসলাম, অজু, রোযা, হজ্ব, যাকাত প্রভৃতি

শব্দ এদেশের অধিবাসী শতকরা ৮৫ জন মুসলমানের অস্তিত্বের সাথে অবিচ্ছেদ্য হয়ে পড়েছে, অতএব যত কিছুই করা হোক, ম্লেচ্ছভাষার এ শব্দগুলোকে বাদ দেয়া কোনওক্রমেই সম্ভব হবে না আর তা যদি না হয় তবে বাংলাভাষার শুদ্ধি অভিযানকে পুরোপুরিভাবে সফল করাও সম্ভব হয়ে উঠবে না।

এখন কথা হলো, এ শব্দগুলো রাখার ফলে যদি বাংলাভাষার জাত না যায় তবে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা বা সবগুলো শব্দ অক্ষুণ্ন-অবিকৃত রাখা হলেও তার জাত যাবে না।

তাছাড়া পৃথিবীর কোনও দেশই সবকিছুতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বলে সকল দেশকেই পর-নির্ভরশীল এবং পরস্পরনির্ভরশীল থাকতে হয়, খুব সম্ভব এটা প্রাকৃতিক বিধানও। অন্য দেশের ভাল ভাল জিনিস এনে নিজ দেশ সমৃদ্ধ করার নীতিও সকল দেশেই অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশীরাও যে এদিক দিয়ে মোটেই পশ্চাৎপদ নয় তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন প্রভৃতি অনেক কিছু থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিদেশ থেকে এতকিছু আমদানি করেও যদি বাংলাদেশীদের জাত না গিয়ে থাকে, তবে যে শব্দগুলো শুধু বাংলাভাষা সমৃদ্ধই করেনি বহুকাল ধরে তার খুঁটি হিসেবেও বিরাজমান রয়েছে, সেগুলো বজায় রাখা হলেও বাংলাভাষা বা বাংলাদেশীদের জাত যাবে না, তবু যখন দেখি যে অনেকে 'গরীবি হটাও'-এর অনুকরণে এই শব্দগুলো হটানোর ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন তখনও আবার আমাকে নতুন করে সেই হ-য-ব-র-ল অবস্থায় পড়তে হয়।

০ গল্পে শুনেছিলাম : কোনও এক প্রতাপশালী ব্যক্তি মানুষের ধৈর্য পরীক্ষার জন্যে তাদের হাতে তেঁতুল তুলে দিয়ে নিজে একখানা ধারালো ছুরি নিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে থাকতো এবং কর্কশ স্বরে বলতো, "বেশ ভাল করে তেঁতুল নাড়তে থাক কিন্তু সাবধান! জিহ্বায় যেন পানি না আসে। মনে রেখো, জিহ্বায় পানি দেখা গেলেই আমি এই ছুরি দিয়ে সে জিহ্বা কেটে ফেলবো!"

পথে চলতে চলতে যখন সংস্কৃতির পাদপীঠরূপী সিনেমা হলগুলোর শীর্ষের বিরাজমান যৌন উত্তেজনাকর এবং শালীনতাবিরোধী ছবি ও কার্টুন দেখতে পাই, অলিতে গলিতে মদের দোকান আর এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকা নাইট ক্লাবগুলো যখন চোখে পড়ে, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মেলা-প্রদর্শনীর জুয়ার আড্ডাসমূহে যখন মানুষকে সর্বস্বান্ত হতে দেখি, ফুটপাতে ছড়িয়ে থাকা রহস্য সিরিজের পুস্তকপুস্তিকা এবং বিশেষ স্টাইলে তোলা ছবি সম্বলিত সিনেমা পত্রিকাগুলো নিয়ে কিশোর-তরুণদের যখন সোৎসাহে পাতা উল্টাতে দেখি,

সর্বোপরি নিজেদের বাড়ি থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত মানুষ গড়ার এই কারখানাগুলোর প্রকৃত অবস্থা যখন মনের পাতায় ভেসে ওঠে তখন এই গল্পটা আমার মনে পড়ে যায়।

আর একদিকে সর্বপ্রযত্নে পাপ-প্রলোভনের এই উত্তেজনাকর পরিবেশ গড়ে তোলা এবং অন্যদিকে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের চরিত্রবান হয়ে গড়ে ওঠার উপদেশ বর্ষণ, অন্যথায় খতম করার হুমকি প্রদানের সাথে আমি যেন এই গল্পটার হুবহু একটা মিল খুঁজে পাই।

আবার কখনও মনে হয় যে, এসবের উদ্যোক্তারা হয়তো দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে কিশোর-তরুণদের ধৈর্য পরীক্ষার জন্যেই কষ্ট করে এতসব আয়োজন করেছেন এবং করে চলেছেন।

উল্লেখ্য, আদম (আ) ভুলকে ভুল বলে বুঝতে পারার সাথে সাথে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাঁর বংশধরগণ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীবে পরিণত হয়েছেন। আমার ভয় হয়, আমরা যেভাবে ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে চলেছি তাতে শেষপর্যন্ত আমাদেরও অভিশপ্ত এবং ইবলিসের দলভুক্ত হতে না হয়।

পরিশেষে আমি দেশবাসী বিশেষ করে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে চাই যে, আপনারা একটু সজাগ-সক্রিয় হয়ে উঠুন এবং আমরা কোন পথে চলেছি তা বুঝতে চেষ্টা করুন। অন্যথায় প্রচণ্ড ধরনের ভুল করা হবে আর অবস্থাও আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে এবং সে ভুলের প্রায়শ্চিত্তও করতে হবে প্রচণ্ড ধরনের মাশুল দিয়েই।

ভুলের মাশুল

ভুলের মাশুল কিভাবে, কি পরিমাণে, কত দ্রুততার সাথে এবং কেমন হিসেব অনুযায়ী যোগাতে হয় বাংলাদেশী মানুষদের অর্থাৎ আমাদের সে অভিজ্ঞতা শুধু বাস্তব এবং প্রত্যক্ষই নয়, অতি সাম্প্রতিকও। তাছাড়া, যেহেতু সে মাশুল আজও যুগিয়ে চলতে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও বেশকিছু দিন যুগিয়ে চলতে হবে বলে বুঝতে পারা যাচ্ছে। অতএব মাশুল যোগানো সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন হয় না।

তবে একথা বলার প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে যে, ভুলের পুনরাবৃত্তি রোধ করতে হলে অন্যায় হঠকারিতা ছেড়ে দিয়ে ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করতে হবে, অনুতপ্ত হতে হবে এবং নির্ভুল পথ বেছে নিয়ে নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে যেতে হবে।

তবে চড়া দামে ভুলের মাশুল যুগিয়েও সাবধান-সতর্ক হয় না, এমনকি এক ভুলের মাশুল যোগানো শেষ না হতেই আবার নতুন করে ভুল করে, তেমন মানুষেরও অভাব নেই। তাঁদের মনের পরিবর্তন ঘটাতে পারে এই আশা নিয়ে অতীতে ঘটে যাওয়া এ ধরনের মাত্র দু' একটি ঘটনাকে এখানে তুলে ধরা যাচ্ছে :

সুদূর অতীতের কথা ছেড়ে দিয়ে এ দেশের মুসলমান-রাজত্বের শোচনীয় অধঃপতনের কারণসমূহ পর্যালোচনা করলে তাঁদের অনুষ্ঠিত যে ভুলটি সর্বাধিক প্রকট হয়ে দেখা দেয়, তা হলো— তাঁরা নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দিয়েছেন, অথচ সুদীর্ঘ প্রায় সাতশত বছরের রাজত্বকালে ইসলামের প্রচার প্রতিষ্ঠা বা মুসলমানদের একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে তোলার কোনও পদক্ষেপই তাঁরা গ্রহণ করেননি। ওপরন্তু তাঁদের প্রায় সকলেই নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারা ইসলামের মূলে প্রচণ্ড কুঠারাঘাতও করেছেন।

বলাবাহুল্য, এই ভুলের মাশুলস্বরূপ মুসলমানদের শুধু রাজ্য-রাজত্বই হারাতে হয়নি, চরমভাবে লাঞ্ছিত-অপমানিত এবং দুঃখ-দৈন্যের নির্মম শিকারেও পরিণত হতে হয়েছিল।

এমনিভাবে প্রায় দু'শ বছরের লাঞ্ছনা-অপমান এবং দুঃখ-দৈন্যের নিষ্পেষণে পুনরায় তাদের সম্বিৎ ফিরে আসে। এখানে একটি ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলার দুর্জয় শপথ গৃহীত হয়। দুঃখের বিষয় পাকিস্তান নামক সেই ইসলামী রাষ্ট্রের জন্ম-লগ্ন থেকেই আবার নূতন করে অতীত ভুলের পুনরাবৃত্তি শুরু হয়ে যায়। শুধু তাই নয়— সাথে সাথে চলতে থাকে নতুন নতুন ভুলের অনুষ্ঠান। কত চড়া দামে সেই ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে সেকথা দেশবাসীর বেশ ভাল এবং মর্মান্তিকভাবেই জানা রয়েছে।

কিন্তু আসলে মর্ম বলতে তাদের কিছুই নেই। আর নেই বলেই সেই প্রাণান্তকর মর্মজ্বালা নিয়েও তারা নূতন করে ভুলের মাশুল দেয়ার কাজ-কারবার পূর্ণোদ্যমে এবং মহা-উৎসাহের সাথে চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই সব কাজ-কারবার কি ধরনের এবং তা চালিয়ে যাওয়ার উৎসাহ-উদ্যমের পরিণাম কত বেশি ও কত প্রচণ্ড, সেকথা খুলে বলার কোনও প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না।

অতঃপর শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হতে চাই যে, মানুষ মাত্রেরই ভুল হয় অতএব সেই মানুষের রচিত বিধান নির্ভুল হতে পারে না। আর পারে না বলেই ভুল করা এবং মাশুল দেয়ার কাজ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

'সত্য সমাগত' শীর্ষক নিবন্ধে পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি থেকে আমরা জেনেছি আল-কুরআই নির্ভুল পদ-চারণার একমাত্র পথ-নির্দেশক নতুন করে সে

বোধ তার মাঝে জাগ্রত হোক। সর্বান্ত:করণে এই প্রার্থনা করে এখানেই প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

ইসলাম যুগে যুগে

'সত্য সমাগত' শীর্ষক নিবন্ধে পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি থেকে আমরা জেনেছি, আল্লাহ বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে একটি মাত্র এবং একমাত্র ধর্মেরই উদ্ভব ঘটিয়েছেন এবং তার নাম দিয়েছেন ইসলাম বা 'শান্তির ধর্ম'। অবশ্য ইসলাম শব্দের অন্য একটি অর্থও রয়েছে; আর তা হলো 'আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।' উল্লেখ্য, সাধারণত ইন্দ্রিয় এবং রিপুর তাড়নায় মানুষ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে। আর পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণই হলো ইন্দ্রিয় এবং রিপুসমূহ বশীভূত ও কল্যাণপ্রসূত করার একমাত্র পথ।

অতএব একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে অনাবিল ও চিরস্থায়ী শান্তি লাভের পথ-নির্দেশ যে ধর্মে রয়েছে তারই নাম ইসলাম।

এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহ যদি একটি মাত্র ধর্মের উদ্ভব ঘটিয়ে থাকেন, তবে পৃথিবীতে এতগুলো ধর্ম এলো কোথা থেকে? উল্লেখ্য, 'সত্য সমাগত' শীর্ষক নিবন্ধে পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি থেকে এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়েছি। মোটামুটিভাবে তার মর্মার্থ হলো, অতীতের মানুষেরাই ইসলামকে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করেছে এবং নিজেরাও বিভিন্ন দল বা জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

এখানে বলা আবশ্যক যে, আকবর প্রবর্তিত দীনে এলাহীর মত মিথ্যা এবং স্বকল্পিত কতিপয় ধর্মের বিদ্যমানতাও পৃথিবীতে ধর্মের সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। সে যাহোক, অতীতের মানুষেরা কিভাবে ইসলামকে ভিন্ন ভিন্ন এবং ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ না থাকায় অতি সংক্ষেপে বলা যাচ্ছে যে, পরবর্তী সময়ে বংশবৃদ্ধি, খাদ্য-সমস্যা প্রভৃতি নানা কারণে আদি-মানুষেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বলাবাহুল্য, ভিন্ন ভিন্ন দেশের পরিবেশ, প্রয়োজন, স্থানীয় সমস্যা প্রভৃতিও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তাছাড়া পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ একই সময়ে এবং একইভাবে উন্নত-অগ্রসরও হয়ে উঠছিল না।

এমতাবস্থায় সকল দেশের মানবসম্প্রদায়গুলোর জন্যে একই ধরনের ধর্মীয় বিধি-বিধান যে সমভাবে উপযোগী, সমভাবে বোধগম্য এবং সমভাবে গ্রহণীয়

হওয়া সম্ভব ছিল না সেকথা সহজেই অনুমেয়। ফলে সুদূরের সেই অতীত থেকে স্থান, কাল এবং পাত্রের উপযোগী ধর্মীয় বিধি-বিধানই যে প্রবর্তিত হয়ে এসেছে সেকথা অনায়াসেই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

অন্য কথায়, ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ধারায় দিনে দিনে মানুষের মন-মানস উন্নত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তাদের জীবনযাত্রার পরিসর এবং জটিলতাও বেড়ে চলেছে। ফলে অতীতের বিধি-বিধানের অনেক আদেশ-নিষেধই প্রবর্তন করতে হয়েছে এবং এমনিভাবে মানুষের মন-মানস পূর্ণ-পরিণত হয়ে ওঠার পরেই বিশ্বের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী (স)-এর মাধ্যমে দীন বা ধর্মকেও পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে।

এ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে, অতীতে মানুষের মন-মানস অপূর্ণ-অপরিণত ছিল বিধায় তাদের কাছে প্রেরিত ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহও অপূর্ণাঙ্গ অর্থাৎ তদানীন্তন মন-মানস এবং পরিবেশ ও প্রয়োজনের উপযোগী ছিল। আর ভিন্ন ভিন্ন মানবসম্প্রদায়গুলো তাদের কাছে প্রেরিত এই সব অপূর্ণ এবং তদানীন্তন কাল ও প্রয়োজনের উপযোগী ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহকেই পূর্ণাঙ্গ, অপরিবর্তনীয় এবং নিজস্ব বলে কুক্ষিগত করে নিয়েছে। ফলে নিজেরা ভিন্ন ভিন্ন দল বা জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। বলাবাহুল্য, এটাই হলো পৃথিবীতে এতগুলো ধর্ম সৃষ্টি হওয়ার কারণ।

লক্ষণীয় যে, আজও ভিন্ন ভিন্ন মানবসম্প্রদায়গুলো সেই সব অপূর্ণাঙ্গ এবং অনুপযোগী হয়ে পড়া ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহ আঁকড়ে থাকার ফলে বর্তমান যুগ ও জীবনের সাথে সেগুলোকে খাপ খাওয়ানো সম্ভব হয়ে উঠছে না। অগত্যা তারা নিজেদের জীবন থেকে ধর্মকে বিদায় দিয়ে উপাসনালয়ের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করেছেন এবং এই ত্রুটি ঢাকার জন্যে একনিষ্ঠভাবে ধর্ম-নিরপেক্ষতার সুসমাচার প্রচারে ব্রতী হয়েছেন।

সে যাহোক, এই আলোচনা থেকে বুঝতে পারা সহজ যে, ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই সেই আদি মানব থেকে শুরু করে সকল যুগের, সকল দেশের এবং সকল মানব-সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক ধর্মরূপে বিদ্যমান রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, একদিকে ইসলামকে পরিপূর্ণতা দেয়া হয়েছে, নবী-রাসূলদের আগমনও বন্ধ করা হয়েছে। আর অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-সভ্যতায়, আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে এক কথায় মানবজীবনের সকল উন্নতি-অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে। এমতাবস্থায় ভবিষ্যতে ইসলামেরও তো যুগের অনুপযোগী হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে? নবী-রাসূল যদি না আসেন এবং

সংস্কার বা নতুন বিধি-বিধান যদি প্রবর্তিত না হয় তবে একদিন মুসলমানদেরও তো ধর্ম-নিরপেক্ষতার রক্ষাকবচই ধারণ করতে হবে?

এই প্রশ্নের উত্তর হলো, ইসলামকে পূর্ণাঙ্গতা বা পরিপূর্ণতা দেয়ার অর্থই তাকে সকল যুগের, সকল দেশের এবং সকল মানুষের উপযোগী করে তোলা।

এখানে একটি বিষয়ে কিছু না বলা হলে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থেকে যাবে। অতএব বলতে হচ্ছে যে, যুগের পরিবর্তনে ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহের অধিকাংশই অকেজো বা যুগের অনুপযোগী হয়ে পড়ার কথা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ধর্ম যদি সত্য হয় এবং সত্য যদি সনাতন ও চিরন্তন হয় তবে তা কি করে অকেজো বা যুগের অনুপযোগী হতে পারে?

এ সম্পর্কে ইসলাম বলে, ধর্মের দু'টি অংশ রয়েছে। একটির নাম দীন; অন্যটির নাম 'শরা'। দীন হলো ধর্মের মূল, আর শরা হলো বিধি-বিধান ও শাখা-প্রশাখা।

দীন[১] চিরদিনই এক, অভিন্ন এবং অপরিবর্তনীয় রয়েছে এবং থাকবে। মানবের আদি পিতা থেকে শুরু করে শেষনবী (স)-এর পূর্বপর্যন্ত সারা বিশ্বের নবী রাসূলগণ সকলে এ রকমই দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। কিন্তু তাদের শরা (দীন পালনের নিয়মপদ্ধতি, খাদ্যাখাদ্য, সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতি) ছিল ভিন্ন ভিন্ন। বিশ্বের শেষ এবং শ্রেষ্ঠনবী (স)-এর মাধ্যমে দীন এবং শরা বা শরিয়ত এ উভয়কেই পরিপূর্ণতা দেয়া হয়েছে। সুতরাং সেই থেকে দীনের মত শরাও অপরিবর্তনীয় রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও অপরিবর্তনীয়ই থাকবে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, উন্নতি-অগ্রগতি, আবিষ্কার, উদ্ভাবন প্রভৃতির কারণে ভবিষ্যতে যে পরিবর্তনাদি সাধিত হবে এবং যে সমস্যাদি দেখা দেবে, ইসলাম সে সম্পর্কে অজ্ঞ বা উদাসীন নয় বলেই যথাযোগ্য ব্যবস্থাও ইসলাম করে রেখেছে। আর তা হলো যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম-সম্প্রদায় ব্যক্তিগত বা সম্মিলিতভাবে ইসলামের আলোকে সেই সব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করবেন।

অবশ্যই এর পরও কথা থেকে যায় যে, ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক নিয়মে ভবিষ্যতে শুধু মানুষের মন-মানসের পরিবর্তন এবং নতুন নতুন সমস্যারই উদ্ভব ঘটবে না, নানা কারণে ধর্মীয় অঙ্গনে নানা ধরনের আবিলতা এবং আগাছা-

---

১. লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত আর কোনও ইলাহ নেই।

পরগাছারও সৃষ্টি হবে। এমতাবস্থায় যুগের আলেমদের পক্ষে তার সমাধান সম্ভব হবে কি?

ইসলাম এ প্রশ্নেরও উত্তর দিয়ে রেখেছে। আর তা হলো, এই সব আবিলতা ও আগাছা-পরগাছা প্রভৃতি বৃদ্ধি পেয়ে ভীষণভাবে ক্ষতিকারক হয়ে ওঠার সময়কালকে মোটামুটি এক হাজার বছর ধরা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, প্রতিহাজার বছরে একজন করে 'মোজাদ্দিদ'-এর আবির্ভাব ঘটতে থাকবে এবং তাঁরাই ধর্ম বা ইসলামকে এসব থেকে মুক্ত, ভাস্বর ও প্রাণবন্ত করে তুলবেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন মোজাদ্দিদ শব্দের অর্থই হলো—নবায়নকারী।

এ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে, দীন ইসলাম আদি মানব থেকে শুরু করে সকল দেশের, সকল মানুষের এবং সকল যুগের স্বাভাবিক ধর্মরূপে বিরাজমান রয়েছে এবং থাকবে।

অতএব নানা কারণে ক্ষুণ্ন-ক্ষতিগ্রস্ত এবং যুগের অনুপযোগী হয়ে পড়া ধর্মীয় বিধানকে নিজেদের জীবনে খাপখাওয়ানো সম্ভব নয় বলে যারা তাকে উপাসনালয়ের মাঝে বন্দী করেছেন এবং নিজেরা ধর্ম-নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছেন বা করতে বাধ্য হয়েছেন, আর যারা ভুল করে বা বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যে ধর্ম-নিরপেক্ষ হয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বিনীত অনুরোধ, ধর্ম-নিরপেক্ষতার পরিণতি যে শুভ নয়, বিশ্বের ক্রমবর্ধমান অশান্তিই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ বহন করছে। অতঃপর ধর্ম-নিরপেক্ষতা ছেড়ে সকল যুগের, সকল দেশের ও সকল মানুষের ধর্ম ইসলামকে পক্ষে নিন এবং আসুন সবাই মিলে সত্যিকারের ধার্মিক হয়ে গড়ে উঠি। তা হলেই দেখা যাবে, গোটা বিশ্বটাই শান্তিতে ভরপুর হয়ে উঠেছে। আ-মীন!